উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা

দ্বিতীয় সেমেস্টার

আধুনিক বাংলা কাব্য

কোর পত্র – ২০২

পর্যায় – ক

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:
The Registrar,
University of North Bengal,
Raja Rammohunpur,
P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,
West Bengal, Pin-734013,
India.
Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008
Fax: (0353) 2776313, 2699001
Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in
Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় ক

একক ১ - আধুনিক বাংলা কাব্য - প্রথম মহাযুদ্ধত্তর মানষিক চিন্তনের বিকাশে আধুনিক বাংলা কাব্য ও আধুনিক বাংলা কাব্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

একক ২ - মেঘনাদবধ কাব্য -মাইকেল মধুসূদন দত্ত - মধুসূদনের জীবন কথা, মেঘনাদবধ কাব্য, মহাকাব্য ও মেঘনাদবধ, চরিত্র আলোচনা

একক ৩ - কবি যতীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা গুলির আলোচনা - যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত- (১৮৮৭-১৯৫৪)।

একক ৪ - যতীন্দ্রনাথ ও ভারতী পত্রিকা - বাংলা পত্রিকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ভারতী পত্রিকা, রবীন্দ্রসমকালীন কবি যতীন্দ্রনাথের কবিতায় তৎকালীন সমাজ চিত্র

একক ৫ - জীবনানন্দ দাশ - কাব্য যাত্রা

একক ৬ - জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা

একক ৭ - কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতা ও সুরিয়্যালিজম, আধুনিকতা ও রোমান্টিসিজম

পর্যায় খ

একক ৮ - আধুনিক কবি - প্রেমেন্দ্র মিত্র,সুধীন্দ্রনাথ দত্ত,বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে ও অমিয় চক্রবর্তী

একক ৯ - প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা - প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় বাস্তবিক মনোভাবের প্রকাশ, সাগর থেকে ফেরা, জোনাকি মন,ও ফেরারী ফৌজ কবিতার নামকরনের সার্থকতা ও কবিতার সারমর্ম।

একক ১০ - সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা - সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় তৎকালীন সমাজ চিত্র, শাশ্বতী, সৃষ্টির রহস্য, সংবর্ত, প্রতীক্ষা- কবিতার নামকরণের সার্থকতা ও তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আধুনিকতার ভিত্তিতে তাঁর কবিতার সারমর্ম।

একক ১১ - বুদ্ধদেব বসুর কবিতা - বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় ও কবিতা পত্রিকায় কাব্য সৃষ্টির সাধনা, দয়মন্তী, রূপান্তর, মাছধরা, শিল্পীর উত্তর এবং অনান্য কবিতায় প্রেম ও আধুনিকতার প্রকাশে বুদ্ধদেব বসুর কৃতিত্ব

একক ১২ - আধুনিক কবি বিষ্ণু দে - মনস্তাতিক প্রেক্ষাপটে বিষ্ণু দে, বিষ্ণু দে এর কবিতায় ত্রিশ শতকের আধুনিক বিল্পব ঘোড়সাওয়ার, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত, ও অন্যান্য কবিতার সারমর্ম।

একক ১৩ - অমিয় চক্রবর্তী ও আধুনিক কবিতা - শিল্পীত কাব্যিক প্রকাশে অমিয় চক্রবর্তী, সঙ্গতি, বৃষ্টি, মাটি কবিতার সারাংশ ও কবিতায় প্রতীকবাদ এবং ছন্দের ব্যবহার, প্রতীকবাদ, ছন্দ।

একক ১৪ - জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, ও অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য।

PG 202 - আধুনিক বাংলা কাব্য

পর্যায় ক

একক ১। আধুনিক বাংলা কাব্য - উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ।

একক ২। - মেঘনাদবধ কাব্য -মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

একক ৩। - কবি যতীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা গুলি আলোচনা।

একক ৪। যতীন্দ্রনাথ ও ভারতী পত্রিকা।

একক ৫। জীবনানন্দ দাশ- কাব্য যাত্রা।

একক ৬। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা

একক ৭। কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতা ও সুরিয়ালিজম, আধুনিকতা ও রোমাণ্টিসিজম।

একক ১-আধুনিক বাংলা কাব্য - উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

বিন্যাস ক্রম

১.১ প্রথম মহাযুদ্ধত্তর মানষিক চিন্তনের বিকাশে – আধুনিক বাংলা কাব্য ও আধুনিক বাংলা কাব্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ - ভূমিকা।

১.২ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১.৩ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১.৪ বৃত্রসংহার কাব্য

১.৫ নবীনচন্দ্র সেন

১.৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১.৭কবিতার স্বরূপ

১.৮ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১.৯ অনুশীলনী প্রশ্ন

১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ ভূমিকা

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে পুরাতন ধারার শ্রেষ্ঠ কবি ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু এবং নবজাগরণ ধারার শ্রেষ্ঠ সাধক মাইকেল মধুসূদনের আগমন হয়। জীবিত কালে লঘুচপল রঙ্গরসের পদ্য লিখে গুপ্ত কবি অসাধারন জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তার আপাততুচ্ছ ছড়া গুলির পিছনে সমসাময়িক বাংলাদেশের, স্বাদেশিক অনুভুতির প্রথম জাগরণ এবং বাস্তবিক জীবনের প্রতি আসক্তি আছে বলে সে যুগের তরুন সম্প্রদায় , যারা ভিন্ন পথের যাত্রী ছিলেন তাঁরাও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন, কেউ কেউ তাঁকে কৈশোর-যৌবনে গুরু বলে বরণ করেছিলেন। অবশ্য এই ধরনের রঙ্গকৌতুকের কবিতায় সাময়িক তৃপ্তি হলেও ইংরেজী শিক্ষা দীক্ষার ক্রমপ্রচারের ফলে আধুনিক রুচির পাঠক বিশাল গভীর জীবনকে কাব্য কবিতায় প্রতিফলিত দেখতে চাইলেন। ইতিমধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রনালী শহরতলী ছাড়িয়ে দুর-দুরান্তের গ্রাম অঞ্চলে ছড়িয়ে পরতে শুরু করেছে, কলেজ পড়ুয়া ছাত্রের ভিড় বাড়ছে, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, তাতে বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহের আয়োজন চলছে, এই ধরনের বিশাল মানবতা বোধের পটভূমিকায় ঈশ্বর গুপ্তের ভাঁড়ামি আর ভালো লাগল না। এখন নবজাত প্রজন্মকে নবক্ষুধা পীড়িত করছে। সেই নবক্ষুধা আত্মার অভীপ্সা, আত্মসম্প্রসারনের আকূতি। ইংরেজী ভাষা সাহিত্যের মাধ্যমের ফলে শিক্ষিত বাঙালি যে বিরাট মহাদেশের ভৌগলিক, ঐতিহাসিক, ও সাংস্কৃতিক পরিচয় পেয়েছে, সেই জীবন আদর্শ ও কাব্য প্রত্যয় বাঙালি পাঠক ও কবিকে নতুন দিগন্তে পাখা মেলতে ব্যাকুল করে তুলল। রঙ্গলাল,হেমচন্দ্র, মধুসূদন, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবি কখনও ইতিহাসের বীররস কখনও প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি আহরণ করে কেউ লিখলেন ঐতিহাসিক আখ্যান কাব্য, কেউ লিখলেন পুরোদস্তর মহাকাব্য। বস্তুত উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে উল্লিখিত কবিদের দ্বারাই আধুনিক জীবনের উদ্বোধন হয়। এতদিন যে জীবন রস নানা বিধিনিষেধের পঙ্ককুঞ্জে শিলীভূত হয়েছিল, এই সমস্ত কবির রচনায় প্রবহ মান হয়ে পঙ্ক শয্যা ত্যাগ করল ও সাগরগামী হল। এক কথায় উনিশ শতকের বাঙালি – রেনেসাঁসের নান্দি পাঠ করলেন রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, ও নবীনচন্দ্র।

১.২. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলা কাব্যে তাঁর পদার্পণের ইতিহাস অনেক কৌতূহলজনক। সে যুগের ফ্যাশন অনুসারে কলেজের পড়ুয়ারা বাংলা সাহিত্যকে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করত।কিন্তু তিনি অভাভ্য উগ্র বাংলা বিদ্বেষী স্বদেশ প্রান হতে পারেননি। তিনি ভারতচন্দ্রের আদি রস ও ঈশ্বর গুপ্তের কৌতুক রস ছেড়ে আর গভীরতর বিষয় নিয়ে কাব্য রচনার পরিকল্পনা করছিলেন। স্বদেশপ্রেম ও ইতিহাস চেতনায় বীররস কে কেন্দ্র করে মানব চেতনাকে উদারতার ক্ষেত্রে মুক্তি দেওয়ার ইচ্ছা থেকেই রঙ্গলাল মধুসূদনের পূর্বেই মহাকাব্যের বীজ বপন করেছিলেন। অবশ্য তিনি মহাকাব্য লিখতে পারেননি, মহাকাব্য গুলি বীররস ও স্বদেশ প্রেমের সমাহার হলেও প্রকৃত মহাকাব্যের ধারে ঘেষতে পারেনি। সে গুলি হয়েছে পুরনো ছাচেঁ লেখা ঐতিহাসিক আখ্যান কাব্য। ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ (১৮৫৮), ‘কর্মদেবী’ (১৮৬২), ‘শূরসুন্দরী’ (১৮৬৮), এবং ‘কাঞ্চীকাবেরী’ (১৮৭৯) – এই কয়টি তাঁর আখ্যান কাব্য। ‘কুমারসম্ভব’ (১৮৭২) কিয়দংশ অনুবাদ করলেও সেই অনুবাদে তিনি কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। তিনি একটি প্রাচীন পাশ্চাত্য ব্যঙ্গ কাব্যের অনুবাদ করেন, এটি ‘ভেকমূষিকের যুদ্ধ’ নামে (১৮৫৮) প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য এই রচনাও কোন দিক দিয়ে উল্লেখ যোগ্য নয়। এছাড়াও সমসাময়িক পত্র – পত্রিকায় কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত কবিতা তাঁর পাওয়া যায়। কবি রঙ্গলাল অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকে ইংরেজী কাব্যের ছাঁচে স্কট বায়রনের আদর্শে স্বদেশ প্রেম ও ইতিহাস কে অবলম্বন করে যে কয়টি কবিতা লিখেছিলেন বলা বাহুল্য সেই কবিতা গুলির দ্বারাই মাইকেলের আগমনী সূচিত হয়েছিল। টডের Annals and Antiquities of Rajasthan- এ আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণ ও জহর ব্রতের আগুন জ্বালিয়ে পদ্মিনীর আত্মহুতি দানের যে বর্ণনা পাওয়া যায় কবির পদ্মিনী উপাখ্যান তারিই ওপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেছেন। এ কাহিনি পুরোপুরি ঐতিহাসিক তা মনে করার কোন কারন নেই। আধুনিক গবেষণায় আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণ প্রমানিত হলেও রানি পদ্মিনীর জহর ব্রতে আত্মত্যাগের কোন যোগাযোগ পাওয়া যায় নি। কিন্তু রাজস্থানে বহু কাল ধরেই রানি পদ্মিনীর জহর

ব্রতে আত্মত্যাগের কাহিনী চারনদের মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে। রঙ্গলাল প্রথম বলিষ্ঠ ভাবে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্বদেশপ্রেমের দ্বারা বীর, করুন রস অবলম্বন করে এই আখ্যান কাব্য রচনা করে ঈশ্বর গুপ্তের কৌতুক রস থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন পদ্মিনী উপাখ্যানের কাহিনী চরিত্র রচনারিতি কিছুই উল্লেখ যোগ্য নয়। বিশেষত কবি আধুনিক যুগের রচনাকার হয়েও বীররস এর – কাব্যে পয়ার, ত্রিপদ্ মালঝাঁপ, একাবলীর গতানুগতিক ছন্দ ব্যবহার করেছেন। ফলে এর বানী প্রানোচ্ছল নয়, এই কাব্য তাই নব যুগের বার্তা বহন করতে পারেনি। কিন্তু ভাবের মধ্যে বীররস করুনরসের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটেছে। শুধু তার জন্যই পদ্মিনী উপাখ্যান স্মরণীয় হয়েছে। ক্ষত্রিয়দের প্রতি রাণা ভীমসিংহের উৎসাহ বানী সকলের কণ্ঠস্থ আছে-

স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্বশৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায়ে হে, কে পরিবে পায়?
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে, নরকের পায়।
দিনকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে, স্বর্গসুখ তায়।

এ ভাষা অত্যন্ত লঘু ধরনের কিন্ত গূঢ়ার্থ যুদ্ধ ভূমি কেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই বাংলির স্বাধীনতা উজ্জীবন লগ্নে এ গান সমর সঙ্গীতের কাজ করেছিল। ‘কর্মদেবী’ ও ‘শূরসুন্দরী’ রাজপুত ইতিহাস থেকে এবং ‘কাঞ্চীকাবেরী’ ওড়িয়া ভক্তির উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। এতেও কবি কোন উল্লেখযোগ্য কবিশক্তির পরিচয় দিতে পারেননি। অথচ তিনি ইংরেজিতে সুপন্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত কাব্যেও তাঁর অধিকার প্রশংসনীয়। কিন্তু আধুনিক মনোভাবের অধিকারী হয়েও রঙ্গলাল সে আবেগকে আধুনিক যুগ উপযোগী মনোভাব দিতে পারেননি। তিনি আধুনিকতা বলতে বিষয় বিবর্তন বুঝেছিলেন, কাব্য মূর্তির আমূল পরিবর্তন বুঝতেও পারেননি সূচনাও করেননি। মনে হয় পাশ্চাত্য সাহিত্য তাঁর মনের বাইরেই আঘাত করেছিল সমগ্র সত্তা আলোড়িত করতে পারনি। মাইকেলের সাথে এক পাড়াতে থেকেও তাঁর মনোভাব পুরাতনের গুটি কেটে আকাশে ডানা মেলে উড়তে পারেনি। মহাকাব্য দূরে থাক বীর রসাত্মক কাব্য রচনাতেও তিনি খুব একটা সাফল্য লাভ করেননি।

যাই হোক রঙ্গলাল কাব্য সৃষ্টির দিক থেকে খুব উচ্চ স্থানীয় না হলেও তিনি ঈশ্বর গুপ্ত ও মধুসূদনের মাঝখানে সংযোজক হিসাবে বর্তমান ছিলেন। সম্পূর্নরূপে নবজীবনের জয় বার্তা ঘোষণা করতে না পারলেও তিনি তাঁর প্রাথমিক সূচনা করেছিলেন। শুধু এই জন্যই তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

১.৩ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ (১৮৩৮ – ১৯০৩)

কবি, আইনজীবী। ১৮৩৮ সালের ১৭ এপ্রিল হুগলির গুলিটা গ্রামে মাতামহের বাড়িতে তাঁর জন্ম। পিতার আর্থিক দৈন্যের কারণে মাতামহের সহায়তায় তিনি কলকাতার খিদিরপুর বাঙ্গালা স্কুলে পড়ালেখা শুরু করেন। কিন্তু মাতামহের মৃত্যুর পর কিছুদিন তাঁর পড়াশোনা বন্ধ থাকে। পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর প্রচেষ্টায় তিনি ইংরেজি শেখেন এবং ১৮৫৩ সালে হিন্দু স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। এখান থেকে জুনিয়র ও সিনিয়র উভয় পরীক্ষায় তিনি বৃত্তি লাভ করেন। বৃত্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে অর্থাভাবে তাঁর লেখাপড়া পুনরায় বন্ধ হয়ে যায় এবং কিছুদিন তিনি চাকরি করতে বাধ্য হন। ১৮৫৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি বিএ পাস করেন। তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ব্যাচের গ্রাজুয়েটদের অন্যতম। ১৮৬১ সালে তিনি এলএল এবং ১৮৬৬ সালে বিএল ডিগ্রি লাভ করেন।গ্রাজুয়েট হওয়ার আগে মিলিটারি অডিটর-জেনারেল অফিসে কেরানি পদে চাকরির মধ্য দিয়ে হেমচন্দ্রের কর্মজীবন শুরু হয়। পরে তিনি কিছুদিন ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমির প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন এবং ১৮৬২ সালে মুন্সেফ হন। এ পদে কয়েকমাস চাকরি করার পর পুনরায় তিনি ওকালতিতে ফিরে আসেন এবং ১৮৯০ সালে সরকারি উকিল নিযুক্ত হন। কর্মজীবনে হেমচন্দ্র আইনজীবী হিসেবেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

হেমচন্দ্রের প্রধান পরিচয় একজন দেশপ্রেমিক কবি হিসেবে। হিন্দু জাতীয়তাবাদের আদর্শে তিনি তাঁর রচনায় দেশপ্রেমকে তুলে ধরেন। ১৮৭২ সালের জুলাই মাসে

মন্তব্য

এডুকেশন গেজেট-এ তাঁর 'ভারতসঙ্গীত' কবিতাটি প্রকাশিত হলে ব্রিটিশ সরকার তাঁর প্রতি রুষ্ট হন, এমনকি পত্রিকার সম্পাদক ভূদেব মুখোপাধ্যায়কেও এজন্য জবাবদিহি করতে হয়। এ কবিতায় তিনি স্পষ্ট ভাষায় পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভারতবাসীদের আহবান জানান। কবিতাটি দীর্ঘকাল বঙ্গের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদায় আসীন ছিল। তাঁর 'ভারতবিলাপ', 'কালচক্র', 'রিপন উৎসব', 'ভারতের নিদ্রাভঙ্গ' প্রভৃতি রচনায়ও স্বদেশপ্রেমের কথা ব্যক্ত হয়েছে।হেমচন্দ্রের রচনায় নারীমুক্তির বিষয়টিও ব্যক্ত হয়েছে। লেখালেখির মাধ্যমে তিনি তৎকালে বিধবাদের প্রতি সমাজের নির্দয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠোর আঘাত হেনেছিলেন। এ বিষয়ে রচিত তাঁর 'কুলীন মহিলা বিলাপ' কবিতাটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহরোধ আন্দোলনের সহায়ক হয়েছিল। তাঁর রচনায় বাংলাদেশ হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মিলিত বাসভূমিরূপে চিত্রিত হয়েছে। তিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে অখন্ড ভারতের স্বাধীন ও সংহতিপূর্ণ রূপ কামনা করেছিলেন।

হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ চিন্তাতরঙ্গিণী ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে বৃত্রসংহার (২ খন্ড, ১৮৭৫-৭৭) মহাকাব্য। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত এ কাব্যে মূলত সমসাময়িক সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জয় ঘোষিত হয়েছে। একসময় বাংলাদেশে কাব্যটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং কবি হিসেবে হেমচন্দ্রের যা খ্যাতি তা মূলত এ কাব্যের জন্যই। হেমচন্দ্রের অপর বিশিষ্ট কাব্য বীরবাহু কাব্য (১৮৬৪) দেশপ্রেম ও গোত্রপ্রীতির পরিচয় সম্বলিত একখানা আখ্যানধর্মী রচনা। তাঁর অপরাপর উল্লেখযোগ্য রচনা হলো: আশাকানন (১৮৭৬), ছায়াময়ী (১৮৮০), দশমহাবিদ্যা (১৮৮২), চিত্তবিকাশ (১৮৯৮) ইত্যাদি।হেমচন্দ্রের কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কবিতাবলী (২ খন্ড, ১৮৭০-৮০)। এটি তাঁর খন্ডকবিতার সংকলন। 'জীবনসঙ্গীত', 'গঙ্গার উৎপত্তি', 'পদ্মের মৃণাল', 'ভারতকাহিনী', 'অশোকতরু' প্রভৃতি খন্ডকবিতা তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি। এগুলির ভাব-ভাষা-ছন্দ শাশ্বত আবেদনময়। এসব খন্ডকবিতায় ইংরেজি কাব্যের ছায়া থাকলেও মাধুর্য এবং রসসৃষ্টির দিক থেকে তা বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে।

হেমচন্দ্র বেশ কিছু ইংরেজি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেন। সেসবের মধ্যে শেক্সপীয়রের টেম্পেস্ট (নলিনী বসন্ত, ১৮৭০) ও রোমিও-জুলিয়েট (১৮৯৫) উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তিনি বেশ কিছু ইংরেজি কবিতারও বঙ্গানুবাদ করেন।হেমচন্দ্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি যেমন গুরুগম্ভীর আখ্যায়িকা কাব্য রচনা করেছিলেন তেমনি আবার সহজ সুরের খন্ডকবিতা, ওজস্বিনী স্বদেশসঙ্গীত এবং লঘু সাময়িকী কবিতাও রচনা করেছিলেন। শিল্প ও সাহিত্যসহ জ্ঞানের অন্যান্য অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন গুণী ব্যক্তি হিসেবে সমকালে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

১.৪ বৃত্রসংহার কাব্য

'বৃত্রসংহার' এর কাহিনী পৌরাণিক হলেও বেদ থেকে, এমন কি প্রাকবৈদিক ইন্দইরানিয় সাহিত্যেও ইন্দ্র শত্রু বৃত্র ও ইন্দ্রের যুদ্ধ বিদ্রহের কাহিনী বর্ণিত আছে। কবি প্রধানত পৌরাণিক কাহিনী থেকে বৃত্রসংহারের কাহিনী স্ংগ্রহ করেছেন। এর তাৎপর্য জাতীয় মহাকাব্যের অনুকূল। মধুসূদনের মতো হেমচন্দ্র সিদ্ধরসের ব্যতিক্রম করে সংস্কারের রজ্জু ছেদন করেননি। বরং চিরাচরিত ন্যায় নীতি ও মনুষ্য ধর্ম মেনে চলেছেন। হেমচন্দ্র পাশ্চাত্য রীতিতে মহাকাব্য লিখলেও মনের দিক দিয়ে খাঁটি ভারতীয় রীতি মেনে চলতেন। তাই যারা মধুসূদনের প্রচণ্ড নতুনত্বে দিশেহারা হয়ে পরতেন তাঁরা হেমচন্দ্রের মধ্যে প্রাচীন ধারার নবীন অনুগমন দেখে আশ্বস্ত হতেন।

হেমচন্দ্র কবিতায় এক ধরনের নতুন ভাবধারা নিয়ে এসে কবিতার তীক্ষ্ণতা ও কবিতায় আবেগ ব্যকুলতার পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁর রচিত জীবন সঙ্গীত কবিতায় সেই পরিচয় পাওয়া যায়-

বলো না কাতর স্বরে, বৃথা জন্ম এ সংসারে

এ জীবন নিশার স্বপন ,

দারা পুত্র পরিবার, তুমি কার কে তোমার

মন্তব্য

বলে জীব করো না ক্রন্দন;

মানব-জনম সার, এমন পাবে না আর

বাহ্যদৃশ্যে ভুলো না রে মন;

কর যত্ন হবে জয়, জীবাত্মা অনিত্য নয়

ওহে জীব কর আকিঞ্চন ।

করো না সুখের আশ, পরো না দুখের ফাঁস,

জীবনের উদ্দেশ্য তা নয়,

সংসারে সংসারী সাজ, করো নিত্য নিজ কাজ,

ভবের উন্নতি যাতে হয় ।

দিন যায় ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়,

বেগে ধায় নাহি রহে স্থির,

সহায় সম্পদ বল, সকলি ঘুচায় কাল

আয়ু যেন শৈবালের নীর ।

সংসার-সমরাঙ্গনে যুদ্ধ কর দৃঢ় পণে,

ভয়ে ভীত হইও মানব;

কর যুদ্ধ বীর্যবান, যায় যাবে যাক প্রাণ

মহিমাই জগতে দূর্লভ ।

মনোহর মূর্তি হেরে, ওহে জীব অন্ধকারে,

ভবিষ্যতে করো না নির্ভর;

অতীত সুখের দিন, পুনঃ আর ডেকে এনে,

চিন্তা করে হইও না কাতর ।

মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন,

হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,

সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে

আমরাও হব বরণীয় ।

সমর-সাগর-তীরে, পদাঙ্ক অঙ্কিত করে

আমরাও হব হে অমর;

সেই চিহ্ন লক্ষ করে, অন্য কোনো জন পরে,

যশোদ্বারে আসিবে সত্বর ।

করো না মানবগণ, বৃথা ক্ষয় এ জীবন

সংসার সমরাঙ্গন মাঝে;

সঙ্কল্প করেছ যাহা, সাধন করহ তাহা,

রত হয়ে নিজ নিজ কাজে ।

দিন যায়, ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়,

বেগে ধায়, নাহি রহে স্থির,

সহায় সম্পদ বল, সকলি ঘুচায় কাল,

আয়ু যেন শৈবালের নীর ।

জাতি-দেশ-বর্ণ ভেদ ধর্ম ভেদ নাই ।

শিশুর হাসির কাছে, সবি প'ড়ে থাকে পাছে,

যেখানে যখন দেখি তখনি জুড়াই।

এ ধরনের রচনার তীক্ষ্ণতা ও উজ্বলতা এখনও প্রশংসা দাবি করতে পারে। মহাকবির বিশালতা ও গাম্ভীর্য গীতি কবির আবেগ উচ্ছলতা তীক্ষ্ণতার সমন্বয়ে গঠিত তাঁর প্রতিভা উনিশ শতকের পটভূমিকায় নিশ্চয় শ্রধ্যার যোগ্য। মধুসূদন কে না পেলে তাঁকে স্বচ্ছন্দে উনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবির যৌবরাজ্যে অভিষেক করতে পারতাম।

১.৫-নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭ – ১৯০৯)

১৮৪৭ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের নোয়াপাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম। তিনি চট্টগ্রাম স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৮৬৩), কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফএ (১৮৬৫) এবং জেনারেল এ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন থেকে বিএ (১৮৬৮) পাস করেন। ওই বছরই তিনি কলকাতার হেয়ার স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ লাভ করেন এবং ১৯০৪ সালে অবসরে যান।ছাত্রজীবন থেকেই নবীনচন্দ্র কবিতা রচনা শুরু করেন। প্যারীচরণ সরকার সম্পাদিত এডুকেশন গেজেটে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতো। তাঁর প্রথম কাব্যসংকলন অবকাশরঞ্জিনী প্রকাশিত হয় ১৮৭১ সালে। ১৮৭৫ সালে তাঁর পলাশীর যুদ্ধ মহাকাব্য প্রকাশিত হলে তিনি ব্রিটিশ সরকারের রোষানলে পড়েন। রৈবতক (১৮৮৭), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩) ও প্রভাস (১৮৯৬) কাব্যত্রয়ী নবীনচন্দ্রের কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। এগুলির নায়ক কৃষ্ণ এবং এতে যথাক্রমে কৃষ্ণের আদি, মধ্য ও অন্তলীলা বর্ণিত হয়েছে। নবীনচন্দ্রের এই তিনটি কাব্যও মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। কাহিনীর বিশালতা এবং বহুমুখী বৈচিত্র্যের কারণে গ্রন্থত্রয়ের কাব্যবন্ধন অনেকটা শিথিল ও দুর্বল।

নবীনচন্দ্রের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: আমার জীবন, খৃস্ট, ক্লিওপেট্রা, ভানুমতী, প্রবাসের পত্র ইত্যাদি। তিনি ভগবদ্গীতা ও চন্ডীর কাব্যানুবাদ করেন। তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবন' গ্রন্থখানি উপন্যাসের মতো সুখপাঠ্য এবং সমকালীন

সমাজ, রাজনীতি ও প্রশাসন সম্পর্কিত একটি প্রামাণ্য দলিল।মাইকেল মধুসূদন দত্তের অনুসারী মহাকবি হিসেবে অধিক পরিচিত হলেও নবীনচন্দ্র অনেক উল্লেখযোগ্য গীতিকবিতা ও আখ্যানকাব্যও রচনা করেছেন।

উনবিংশ শতকে নব যুগের প্রভাবে বাংলায় কাব্য রচনার হিড়িক পরে গিয়েছিল, মধুসূদন অনুবর্তী ও নবীনচন্দ্র কাব্য রচনার কিছু কিছু স্থলে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, কিন্তু আর যারা কাব্য রূপে উচ্চ বৃক্ষ শাখায় ফল আহরণ করতে গিয়েছিলেন তাঁদের বামন কল্পনা কিছুমাত্র নাগাল ধরতে পারেনি। মধুসূদনের পরেই আধুনিক কবি হিসাবে যিনি সর্ব বিশ্বে পরিচিত তিনি হলেন বিশ্বকবি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১.৬-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

‘কল্পনা’(১৯০০) কাব্যের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ। ঊনবিংশ আর বিংশ শতাব্দীর কাব্য ‘কল্পনা’। যে কাব্যে বিগত শতাব্দীর রেশ প্রাচীন ভারত এবং কালিদাসের কালের রোমন্থনে উপস্থাপিত, ‘স্বপ্ন’ যার প্রতীক। সেই সময়ে রবীন্দ্র মানস শুধু প্রেম ও সৌন্দর্য সাধনায় তৃপ্ত থাকেনি, ধাবিত হয়েছে বৃহৎ আদর্শ ও মনুষ্যত্বের দিকে। ‘কল্পনা’ কাব্যে কবির মনন, ত্যাগ, বীর্য, সত্য, নিষ্ঠা, শাশ্বত ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রেম -সৌন্দর্য কল্পনা প্রাচীন ভারতীয় পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করেছেন। তবু ‘মার্জনা’ কবিতার নারী বর্তমান বিশ্বের প্রেয়সী। প্রিয়তমকে ভালোবেসে বলছে-

‘প্রিয়তম, আমি তোমারে যে ভালোবেসেছি,

... .

রানীর মতন বসবো রতন আসনে,

বাঁধিব তোমারে নিবিড় প্রণয় শাসনে;

দেবীর মতন পুরাব তোমার বাসনা।’

‘খেয়া’ (১৯০৬-(তে যে আধ্যাত্ম বোধের সূচনা সেই বোধের চরম উৎকর্ষ সার্থকভাবে রূপায়িত ‘গীতাঞ্জলি’ (১৯১০)তে। ‘চৈতালী’ (১৯১২) কাব্যে আবার তাকে বাস্তব

মন্তব্য

পৃথিবীর হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের চিত্র বর্ণনায় দেখা গেল-। 'দিদি' কবিতার দিদি। 'বড় ব্যস্ত সারা দিন' ঘরকন্যার কাজে। তার কর্মব্যস্ততায় সে আর দিদি থাকেনি। কবির কাছে মনে হয়েছে, ''জননীর প্রতিনিধি/কর্মভারে অবনত অতি ছোট 'দিদি'।''

'পরিচয়' কবিতাতেও দিদি যেন বিশ্ব জননী-

'এক কক্ষে ভাই লয়ে, অন্য কক্ষে ছাগ,
দুজনেরে বাঁটি দিল সমান সোহাগ।
পশু শিশু, নর শিশু দিদি মাঝে পড়ে
দোঁহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয় ডোরে।।'

নারী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উক্তি ধরা পড়েছে 'চৈতালী' কাব্যের 'মানসী কবিতায়। কবি লিখেছেন-

'শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী!
পুরুষ গড়েছে তোমা সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে। বসি কবিগণ
সোনার উপমা সূত্রে বুনিছে বসন।...
সে কারণে কবির মনে হয়েছে-
'পড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা,
অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা।'

'খেয়া', 'চৈতালী' বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে প্রকাশিত। এ সময়ে তাঁর স্বজন বিয়োগের ফলে উল্লেখযোগ্য কাব্য নেই। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রবীন্দ্রনাথ যা রচনা করেছেন তা তাঁর ব্যক্তিগত কয়েকটি কারণে পূর্ববর্তী রচনা থেকে স্বতন্ত্র। স্ত্রী-কন্যা-নাতনির মৃত্যুতে তাঁর মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়ভাবে ধরা পড়েছে। 'স্মরণ' কাব্য কবির সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর স্মরণে লেখা। একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের গভীর দুঃখ-বেদনা এই কাব্যে একটি সর্বজনীন রসোপলব্ধির পর্যায়ে উন্নীত। কবি

প্রিয়াকে মৃত্যুর পর উপলব্ধি করার যে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এর অনেকগুলো কবিতায়।

'যুগল মিলন' কবিতায় কবি বলেছেন-

'মিলন সম্পূর্ণ আজি হল তোমা সনে,
এ বিচ্ছেদ-বেদনার নিবিড় বন্ধনে।'

'উৎসর্গ' (১৯১৪) কাব্যেও নারী কবির কাছে রহস্যময়ী। 'ছল' কবিতায় রহস্যময়ী এই নারীর ছলনায় কবির বক্তব্য-

'তোমারে পাছে সহজে বুঝি তাই কি
এত লীলার ছল
বাহিরে যবে হাসির ছটা ভিতরে থাকে
আঁখির জল।
বুঝি গো আমি, বুঝি গো তব ছলনা
যে কথা তুমি বলিতে চাও সে কথা তুমি বল না।'

কিন্তু নিজেকে আড়াল করা নারীর পক্ষে সব সময় সম্ভব হয় না। তাই তো 'চেনা' কবিতায় কবির প্রশ্ন-

'আপনার তুমি করিবে গোপন কী করি
হৃদয় তোমার আঁখির পাতায় থেকে থেকে পড়ে ঠিকরি!'

বলাকা(১৯১৬) কাব্যের মধ্য দিয়ে বিংশ শতাব্দীতে বাংলা কবিতায় নূতনত্ব আনলেন রবীন্দ্রনাথ। এ কাব্যে যৌবনের জয়গান ও গতিবেগের গুনগানই মূল কথা। 'বলাকা' থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনা রীতি নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন শেষ পর্যায়ের কাব্যে তা-ই চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। এ কাব্যে বিশেষ কীভাবে নিবিশেষ হয়ে যায় তা প্রকাশ পেয়েছে 'ছবি', 'শা-জাহান' কবিতায়। 'বলাকা' কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতা 'ছবি'। এতে দেখা যায় জীবনের কেন্দ্রস্থলে যে বস্তুটি স্থির সেটি তার কিশোর প্রেম, কবিত্বের অনুপ্রেরণার উৎস। ভাবনার অবলম্বন 'নাহি জানে কেহ নাহি জানে/তব সুর

বাজে মোর প্রাণে/কবির অন্তরে তুমি কবি/নও ছবি, নও শুধু ছবি।'

তার কিশোর জীবনের প্রেম মৃত্যুর আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। এখন সে শুধু ছবির স্থির রেখা বন্ধনে আবদ্ধ। জীবন প্রভাতে যাকে পেয়েছিলেন, মরণের অন্ধকারে যাকে আবার হারিয়েছেন তাকেই জীবনের পথ চলার অগোচরে বার বার উপলব্ধি করেছেন কবি।

'বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছে যে দোলা।

'শা-জাহান' কবিতায় তুলে ধরা হয়েছে এমন এক সত্যকে যা চিরন্তন। চলার পথে জীবনের সমস্ত কিছুই পেছনে ফেলে যেতে হয়, এমন কি প্রেমকেও। সম্রাট শাহজাহান তাজমহলকে 'কালের কপোল তলে' 'শুভ্র সমুজ্জ্বল' 'এক বিন্দু অশ্রুজল' রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। শাহজাহানের জীবন, জীবনের মুহূর্তে আবদ্ধ থাকেনি বরং জীবনের অন্তবেদনা বস্তুরূপে তাজমহলের মধ্যে আবদ্ধ হয়েছে এবং 'তুচ্ছ করি জীবন মৃত্যুর ওঠাপড়া/যুগে যুগান্তরে কহিতেছে এক স্বরে/চির বিরহির বাণী নিয়া-
ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।'

'বলাকা' কাব্যে কবির দৃষ্টি অনেক বাস্তবমুখী হয়েছে যার ফলে 'পলাতক'। (১৯১৮) কাব্যের মতো মানব জীবনের হাসি-কান্না এবং দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের জোয়ার-ভাটায় আন্দোলিত কাব্য রচনায় স্বাচ্ছন্দ্য হয়েছেন। 'পলাতকা'র কবিতাগুলি সহজ জীবনের মধ্যে যে হাহাকার তারই প্রতিচ্ছবি। কবিতা ও কাহিনী যে এক সঙ্গে গাঁথা যেতে পারে, কবি তার পরিচয় দিলেন এ কাব্যে। গল্পগুলোর প্রতিপাদ্য বিচ্ছেদ, বিদায় এবং মৃত্যু। এ প্রসঙ্গে 'মুক্তি' কবিতাটির কথাই ধরা যাক। এখানে মেয়েদেরকে সমাজের তথা রাষ্ট্রের বৃহৎ কর্মক্ষেত্র থেকে দূরে রেখে তাকে আবদ্ধ করা হয়েছে অন্তঃপুরে এবং চালানো হচ্ছে নানাবিধ অত্যাচার।

অন্তঃপুর বাসিনী একত্রিশ বছর বয়সী নারী যখন রোগে শোকে পরপারে যাত্রা করতে বসেছে তখন তার মনে হয়েছে সে তো সামান্য নয়, তার একটি জীবন ছিল। আসন্ন মৃত্যুকে শিয়রে নিয়ে সে উপলব্ধি করে এই বিশ্ব জগৎ বছরের ছয় ঋতু বাইশ বছর ধরে এসেছে আবার চলেও গেছে। যাবার বেলায় বার বার বলেছে,

'খোলরে দুয়ার খোল'। কিন্তু নিরানন্দ এই গৃহকোনের নাগপাশ ছিঁড়ে সে-বাণী প্রবেশ করতে পারেনি। রান্নাঘরের ধোঁয়া এবং অন্তঃপুরের অন্ধকার কারাগারে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে গেছে। নয় বছর বয়সে এ সংসারে এসেছিল, বাইশ বছর ধরে 'নামিয়ে চক্ষু মাথায় ঘোমটা' টেনে সবার আবদার মিটিয়েছে, সবাই তাকে বলেছে, লক্ষ্মী সতী ভালো মানুষ অতি। আজ তার যাবার সময় কেবলই মনে হচ্ছে - আমি কি শুধু সতী লক্ষ্মী? আর কিছু নই?

'জানলা দিয়ে চেয়ে আকাশ পানে
আনন্দে আজ ক্ষণে-ক্ষণে জেগে উঠছে প্রাণে
আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না বীণায় নিদ্রাবিহীন রাতি
আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা/শশী।
মিথ্যা হ'ত কাননে ফুল ফোটা॥'

সে শুধু জানত 'রাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাঁধা'। সে আজ এই চাকাতে বাঁধা জীবন থেকে মুক্তি নিচ্ছে। মরণের মধ্যে পেতে চাইছে মুক্তি এবং স্বাধীনতার স্বাদ -এ জীবনে যা সে কোনো দিনই পায়নি। 'স্বামী কর্তৃক অবহেলিত এই নারী চরম মুহূর্তে উপলব্ধি করিয়া গেল নারী জীবনের সার্থকতা মাতৃত্বে নয়, প্রেয়সীত্বে নয়, পত্নীত্বে নয় তাহার সার্থকতার ক্ষেত্র অস্তিত্বের মূলগত ক্ষেত্র নারীত্বে।'

...বিশ শতকের আধুনিকতা, বাংলার সুখ-দুঃখ, হাস্য-পরিহাস, আচার-সংস্কার, ভয়-লোভ-লজ্জা, তার শক্তি, তার ব্যর্থতা প্রায় সবই ধরা পড়েছে রবীন্দ্রনাথের এ সময়ে রচিত রচনাবলীতে। পুরুষের নির্বোধ দাম্ভিক আত্মকেন্দ্রিকতা তাও আছে, আছে বালিকা বধূর নিঃশব্দ বেদনা, আছে আত্মবশ আধুনিকতার দীপ্তমূর্তি।

নারী সম্পর্কে উনিশ শতকীয় দ্বিধাদ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও ছিল। শ্রী প্রিয়লাল দাস লিখেছেন - 'রবীন্দ্রনাথের রমণী প্রেমের সম্বন্ধে বলিবার যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, এই প্রেমের চিত্রে বাঙালি বাবু প্রেমের পবিত্র মন্দিরে দেবতা সাজিয়া বসিয়া আছেন, আর দারুণ বুভুক্ষায় পীড়িতা বাঙালিনী ক্ষুধাতুর হৃদয় লইয়া দ্বার হইতে

ফিরিয়া যাইতেছেন।

‘কেন রে চাস ফিরে ফিরে চলে আয়রে চলে আয়

এরা প্রাণের কথা বোঝে না যে/...হৃদয় কুসুম দলে যায়।’

বাঙালির মেয়েরা রবীন্দ্রনাথের গীতি কবিতায় কেবল হায় হায় করিয়া কাঁদিয়াই সারা-

‘না সজনি না, আমি জানি জানি সে আসিবে না।

এমন কাঁদিয়ে পোহাইবে যামিনী; বাসনা তবু পুরিবে না।’

অন্যত্র বলেছেন-

‘ওলো রেখে দে, সখি; রেখে দে,/মিছে কথা ভালবাসা!

সুখের বেদনা সোহাগ যাতনা/বুঝিতে পারি না ভাষা... /পরের সুখের হাসির

লাগিয়া/অশ্রু সাগরে ভাসা।

জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া/জীবনের সুখ নাশা।’

অনুতপ্ত রবীন্দ্রনাথ নিজের মতাদর্শ পরিবর্তনের অঙ্গীকারে লিখেছেন-

‘শতবার ধিক্ আজি আমারে সুন্দরী/তোমারে হেরিতে চাহি এত ক্ষুদ্র করি। তোমার

মহিমা জ্যোতি তব মূর্তি হতে/আমার অন্তরে পড়ি ছড়ায় জগতে।’

যাহোক, সব মিলিয়ে ‘কল্পনা’ থেকে ‘পলাতকা’ পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্য সাধনায় নারী ভাবনা একটি বিশেষ স্তরে উন্নীত হয়ে ক্রমাগত এগিয়ে গেছে।

কবির ভাষায় ‘পুরবী’ (১৯২৫) যেন ‘বিধবা সন্ধ্যার নীরব অশ্রু মোচন’। তাই ‘পূরবী’তে অস্তরাগ উদ্ভাসিত জীবন শেষে জীবনের স্মৃতিচারণ থাকলেও বাস্তব নারী চিত্র এখানে দুর্লভ। তবে ‘মহুয়া’ (১৯২৯) এর ব্যতিক্রম। এখানে নারী তার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন। ‘মহুয়া’ কাব্যের ‘সবলা’ কবিতায় নারী তার স্বাধিকারের প্রশ্নে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছে-

‘নারীরে আপন ভাগ্য জয় করিবার

কেন নাহি দিবে অধিকার?

হে বিধাতা-

যাব না বাসর ঘরে বাজায়ে কিঙ্কিনী

আমারে প্রেমের বীর্যে কর অশঙ্কিনী।'

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে গদ্য কবিতায় সার্থকতার পরিচয় দিলেন রবীন্দ্রনাথ।

'পরিশেষ' (১৯৩২ (কাব্যের 'বাঁশি' কবিতায় গদ্য ছন্দে যে নারীকে তুলে ধরলেন সে

নারী তার কলমের সোনার পরশে হয়ে উঠল অনন্যা, অসামান্য।

'এ গান যেখানে সত্য

অনন্ত গোধূলি লগ্নে/সেই খানে

বহি চলে ধলেশ্বরী,

তীরে তাল তমালের ঘন ছায়া-

আঙিনাতে

যে আছে অপেক্ষা করে, তার

পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।'

'পুনশ্চে'র (১৯৩২) সাধারণ মেয়ে শরৎ বাবুকে অনুরোধ করেছে তাকে নিয়ে একটি

গল্প লিখতে, সাধারণ মেয়ের গল্প, তাকে পাঠিয়ে দেয়া হোক সমঝদার এবং দরদীদের

দেশে। সেখানে তাকে নিয়ে আলোচনা হবে শুধু বিদূষী বলে নয়, নারী বলে। শেষ

পর্যন্ত সাধারণ মেয়ে নিজের ওপর আস্থা রাখতে পারে না। তার মনে হয় কৃপণ বিধাতা

তাকে সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টি করেননি। সামান্য মেয়ে সৃষ্টি করে বিধাতা শক্তির অপচয়

করেছেন। নারী হৃদয়ের এসব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নারীকে

পুরুষের পাশাপাশি এনে দাঁড় করিয়ে স্বাধিকারের স্বপক্ষে তার জোরালো অবস্থান

ঘোষণা করেছেন। পুরুষ নিজেই প্রতিজ্ঞার ভাষায় বলছে-

'আমরা দু'জনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরনীতে

মুগ্ধ ললিত অশ্রু গলিত গীতে॥...

কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়, তুমি আছ, আমি আছি।

পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি, ছিন্নপালের কাছি,

মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব তুমি আছ, আমি আছি।...
এই গৌরবে চলিব এভাবে যতদিন দোঁহে বাঁচি।
এ বাণী, প্রেয়সী, হোক মহীয়সী তুমি আছ, আমি আছি।'

পদ্য ও গদ্য রচনার বৈচিত্র্যে রবীন্দ্র সাহিত্য অতুলনীয়। তবুও একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। তাঁর প্রেরণার উৎস অনেককাল আগ থেকে অনেকেই খুঁজেছেন কিন্তু তাঁর কাব্য রচনার পরমার্থ ও স্তর ভেদ নিয়ে বিচার ও বিশ্লেষণের কিছু অবকাশ রয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রগ্রন্থ পরিচয়' প্রকাশ করে এ বিষয়ে নতুন করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এবং তিনি তাঁর পরিশিষ্টে কবির শুরুর প্রথম মুদ্রিত কবিতা হিসেবে 'অভিলাষ' এর নাম উল্লেখ করেছেন। এটি ১৮৭৪ সালের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় যখন এটি ছাপা হয় তখন কবির বয়স ১৩ বছর ৬ মাস। কিন্তু কবিতাটি তার অন্তত এক বছর আগে লেখা। কারণ লেখকের নাম না দিয়ে শুধু দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচিত এইটুকু কবিতার সাথে জুড়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কবিতাটি ছাপিয়ে দেন। এছাড়া ১৭৯৭ শকে 'প্রকৃতির খেদ' শীর্ষক আর একটা কবিতাও বালকের রচিত বলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ওই পত্রিকায় প্রকাশ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথই যে রবীন্দ্র প্রতিভার আসল জহুরী ছিলেন সে বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়। কবি নিজেও বারবার সে কথা স্বীকার করেছেন। রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সেই তরুণ বয়সেই যে দাদার সহকর্মী ছিলেন সেটা জানা যায়। ব্রজেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জুলাই ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত তাঁর 'পূরু বিক্রম' নাটকে রবীন্দ্রনাথের একটা গান কিছুটা অদলবদল করে জুড়ে দেন। একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্র মন/এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন/আসুক সহস্র বাঁধা বাধুক প্রলয়/আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়.../। ১৮৭৫ সালের ৩০ নভেম্বর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকে রবীন্দ্রনাথের 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ-দ্বিগুণ' গানটি বসানো হয়। রবীন্দ্রনাথের এমন অনেক বেনামী রচনা রয়ে গেছে। ঠিকতম অনুসন্ধান করলে হয়তো বেরিয়ে আসবে। 'অভিলাষ' কবিতার মত আর একটি বেনামী কবিতা ড .সুকুমার সেন 'বাংলা সাহিত্যের কথা' তৃতীয় সংস্করণ ১৩৪৯,

১২৮০'র মাঘ সংখ্যার 'বঙ্গদর্শন' থেকে উদ্ধার করেছেন। প্রকাশের তারিখ অনুসারে এই 'ভারত ভূমি' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের সর্ব প্রথম প্রকাশিত রচনা বলে হয়ত গণ্য হতে পারে। কবিতাটি যে বছর বঙ্গদর্শনে মাঘ মাসে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪ ছাপা হয়। সেই ১২৮০ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্ন প্রয়াণে' প্রথম সর্গও বঙ্কিমচন্দ্র ছাপেন। এক্ষেত্রে অনুমান করা যায় যে, দ্বিজেন্দ্রনাথই বালক কবি রবীন্দ্রনাথের 'ভারত ভূমি' প্রকাশের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে দিয়েছিলেন। সে সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স ১২ বছর ছিল বলে তাঁর দাদা নিশ্চিত করে জানালেও বঙ্কিমের মন্তব্যে, চর্তুদশ বর্ষীয় বালকের রচনা কি করে ছাপালেন বোঝা যায় না। কয় মাস পরে অভিলাষ ছাপার সময় মেজ দাদা স্পষ্ট দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের উল্লেখ করে গেছেন। এক্ষেত্রে ভারত ভূমি কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের না হয়ে বঙ্কিমের পরিচিত ১৪ বছরের অন্য কোন বালক কবিরও হতে পারে। 'ভারত ভূমি' সম্বন্ধে ড .সুকুমার সেনের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, 'রবীন্দ্রনাথের কবিতা বঙ্কিমের দ্বারা সংশোধিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বাড়িয়া গিয়াছে। বঙ্কিম চন্দ্রের সংশোধনের জন্য আমরা দুঃখিত নই, কিন্তু তিনি যে কবিতাটির অংশত ছাপিয়েছিলেন সে জন্য ক্ষোভ হইতেছে। কবিতাটি অসন্দিগ্ধভাবে বালক রবীন্দ্রনাথের বলে প্রমাণ হলে এর মধ্যে পাব বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর সহানুভূতি ও অন্তর দৃষ্টির পরিচয়।'

রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যা সঙ্গীত প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালের ৫ জুলাই। রবীন্দ্রানাথের কবি প্রতিভার সম্পর্কে বঙ্কিম চন্দ্রের অভিব্যক্তিতে একবার তিনি রমেশকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'রমেশ তুমি সন্ধ্যা সঙ্গীত পড়িয়াছ?' রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যার বিয়ের অনুষ্ঠানে তাঁকে বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই প্রশ্নচ্ছলে রবীন্দ্রনাথের কাব্যলক্ষ্মীর স্থায়ী প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত করেন তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স বিশ-একুশ। তার আট নয় বছর আগেরকার রচনার মধ্যেও সে প্রতিভার সন্ধান পাওয়া বঙ্কিম ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ বঙ্কিম সে কালের কবিদের কড়া সমলোচকই ছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা ছাপা হওয়ায় তাৎপর্য আরোও নতুন করে বোঝা যায়। 'ভারত ভূমি' কাঁচা রচনা হলেও কাব্য সরস্বতী পাদপীঠে শিশু রবীন্দ্রনাথের কচি

হাতের প্রথম আল্পনা। সেই সঙ্গে কবির প্রথম দিকের রচনা 'অচলিত সংগ্রহে' প্রকাশিত তাঁর কাব্য রচনাগুলো এবং বিশেষ ভাবে মে ১৮৮৪-তে ছাপা তাঁর শৈশব সঙ্গীত ও ১৩০৩ সালের কাব্য গ্রন্থাবলীতে ছাপা 'কৈশোরক' পড়া উচিত। ১২৯১ সালে ছাপা হলেও শৈশব সঙ্গীতের অধিকাংশ কবিতা ১২৮৪-৮৭ সালে ভারতীতে প্রকাশিত হয় এবং সেগুলো কবির ১৩ থেকে ১৮ বছরের রচনা। রবীন্দ্রনাথকে ছেলেবেলায় বয়সের যে কিছু বড় দেখাত তার প্রমাণ তাঁর এগারো বছর বয়সে পিতার সঙ্গে প্রথম বোলপুর (১২৭৯) হয়ে অমৃতসর পর্যন্ত ট্রেন যাত্রার গল্পের মধ্যে আছে। সুতরাং ১২ বছরে রচিত 'ভারত ভূমি' কবিতাটি চতুর্দশ বর্ষীয় বালকের বলে যে বঙ্কিম গ্রহণ করেন তারও খানিকটা কারণ মেলে।

সে যুগের এসব রচনা অচলিত সংগ্রহে স্থান না পেলেও তাদের সন্ধান করা দরকার। কারণ কবির ৫০ বছরে রচিত জীবনস্মৃতির মধ্যে তিনি নিজে অস্পষ্ট, অথচ মূল্যবান আভাস দিয়ে গেছেন তাঁর শিক্ষারম্ভ অধ্যায়ে।

'তখনকর, খল প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি "জল পড়ে পাতা নড়ে"। আমার জীবনে এটিই আদি কবির প্রথম কবিতা'। ছন্দ ঋত্বিক রবীন্দ্রনাথের ওপর ছন্দ সরস্বতীর সেই প্রথম আশীর্বাদ। এখনকার কালে যদি পাঁচ বছরে শিক্ষারম্ভ হয়ে থাকে তাহলে ছন্দ বোধের এই প্রথম উন্মেষ দেখি ১৮৬৬-৬৭ সালে। তখন প্রাক-কংগ্রেস যুগের প্রথম জাতীয় আন্দোলন বিখ্যাত হিন্দু মেলার উদ্বোধন চলছে (১২ এপ্রিল ১৮৬৭)। কবির পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ ও দাদারা এ আন্দোলনে অগ্রণী। দেবেন্দ্রনাথের অর্থ সাহায্যে হিন্দু মেলার সহ-সম্পাদক নব গোপাল মিত্র 'ন্যাশনাল পেপার' ইংরেজি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি' সত্যেন্দ্রনাথের 'জয় ভারতের জয়' (১৮৬৮) গণেন্দ্রনাথের 'লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে' রঙ্গলালের 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে' ও হেমচন্দ্রের 'বিংশতি কোটি মানুষের বাম' (১২৭৭ এডুকেশন গেজেট ১৭ শ্রাবণের সখ্যায় মুদ্রিত)। 'ভারত সঙ্গীত' প্রভৃতি গান ও কবিতা রবীন্দ্রনাথের শৈশব রচনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তার সন্ধান কবি নিজে দিয়েছিলেন। একেবারে হারিয়ে যাওয়া

ছিন্নবিচ্ছিন্ন নীল হাতা বাঁধানো লেন্টস ডায়রি নিবন্ধ রচনা ও অধূনা লুপ্ত ‘পৃথ্বীরাজের পরাজয়’ কাহিনীর মধ্যে। এই বীর রসাত্মক কাব্যটি প্রথম বোলপুর ভ্রমণের ‘তৃণহীন কংকর শয্যায়’ লেখা হয়। কিন্তু কাব্যে হাতেখড়ি হয়েছিল তার ৭-৮ বছরে। অর্থাৎ ১৮৮৮-৮৯ সালে। যখন তাঁর ভাগিনেয় জ্যোতি প্রকাশ হ্যামলেটের উক্তি আবৃতি করতেন ও পয়ার ছন্দে চৌদ্দ অক্ষরে যোগাযোগের রীতি পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথকে বুঝিয়ে দিয়ে বাংলা সাহিত্যে এক নব যুগের উদ্বোধন করেন। মধুসূদন সে কালের সাহিত্য গগনে মধ্যাহ্ন সূর্য ও তিনি কবির মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু ও বিলাত প্রবাসের সহযাত্রী। সত্যেন্দ্রনাথের মারফতে আমরা জানি যে, দেবেন্দ্রনাথ মাইকেলের মস্ত সমঝদার ছিলেন ও তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজনারায়ণ বসু মাইকেলের সহপাঠী ও সমালোচক ছিলেন। তাই মাইকেলের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সে কারণে ভারতীতে নিজ নামে পদ্য ও গদ্য রচনা ছাপার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ‘মেঘনাদ বধ’ কাব্যকে আক্রমণ করেন। মাইকেলের প্রভাব ‘ভারত ভূমি’ কবিতায় স্পষ্ট এবং তারও আগে মেজদাদা শিশু কবির রচনা নবগোপাল মিত্রকে শুনিয়েছিলেন। তখন ভ্রমরকে অবজ্ঞাভরে তাড়িয়ে কবি দ্বিরেক প্রয়োগে গর্বিত। সুতরাং ভারত ভূমি কবিতার ‘পুরন্দর’ শব্দের সঙ্গে ক্ষপাকর মেলান রবীন্দ্রনাথেরও কীর্তি হতে পারে, অথবা বঙ্কিমের?

ভাগিনেয় যখন হেমলেট আবৃতিতে মত্ত তার কিছু কালের মধ্যে ম্যাকবেথ নাটকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হওয়া অসম্ভব নয়। কারণ তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ আজীবন সেক্সপিয়ার ভক্ত এবং প্রায় ৮০ বছর বয়সেও তাঁকে হ্যামলেট আবৃতি করতে শুনা গেছে। উত্তর ভারত ভ্রমণ শেষ করে রবীন্দ্রনাথ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। তিনি আনন্দ চন্দ্র বেদান্তবাগিশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে ‘কুমার সম্ভব’ ও ম্যাকবেথ পড়তেন। শুধু তাই নয়) ১৮৭৩-৭৪ (সালে ম্যাকবেথ বাংলা ছন্দে তর্জমা না করা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের গুরু তাকে ঘরে বন্দি করে রাখতেন। সেই অনুবাদের কিছু অংশ কবির সংস্কৃত অধ্যাপক রাম সর্বস্ব পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শোনান। তখন রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর কাছে ছিলেন। এই অনুবাদের খণ্ডিত অংশ মাত্র রক্ষা

পেয়েছে। ভারতী ১২৮৭ আশ্বিন থেকে তা সজনীকান্ত দাস উদ্ধার করেন। অভিলাষ কবিতার ২৪ থেকে ৩১ পদগুলোতে তার ছায়া দেখা যায়।

'ভারত ভূমি' কবিতার সঙ্গে যোগ হয়েছে এ কালের তাঁর স্বাক্ষরিত ও অধূনা সুপরিচিত অন্য দু'একটা রচনায় ১৮৭৫ ফেব্রুয়ারিতে পঠিত ও প্রকাশিত 'হিন্দু মেলার উপহার' ও ১৮৭৭ ডিসেম্বর হিন্দুমেলার দ্বিতীয় কবিতা 'লিটন দরবার' উপলক্ষে। এ সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ তার 'রবীন্দ্রগ্রন্থ পরিচয়ে' বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ও যতিনাথ ঘোষ জ্যোতিরিন্দ্রের 'স্বপ্নময়ী' নাটকে(১৮৮২) একটা কবিতার সঙ্গে এর ভাবগত মিল দেখিয়েছেন। এসব রচনার মধ্যে হেমচন্দ্র ও রঙ্গলালের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। হিন্দু মেলার প্রথম ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫ ও দ্বিতীয় ডিসেম্বর ১৮৭৬ কবিতার মাঝখানে আরও একটি মূল্যবান কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। 'প্রকৃতির খেদ' 'তত্ত্ব বোধিনী' পত্রিকায় আষাঢ় ১৮৭৫ জুন-জুলাই ছাপা হয় অভিলাষ কবিতাটি। কবিতাটি ছাপার আট মাস পরে 'অভিলাষ' ৩-৪ পদে, যেমন 'ভারত ভূমি'র ছাপ কতকটা বহন করছে। তেমনি, 'প্রকৃতির খেদ' অনেক জায়গায় রবীন্দ্রনাথের 'বনফুল' কাব্যোপন্যাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বই হিসাবে ১৮৮০'র নয় মার্চে প্রকাশিত হলেও বনফুলের কবিতাগুলো ১৮৮২-৮৩ সালে শ্রীকৃষ্ণদাস সম্পাদিত ১২৭৮ আরম্ভ 'জ্ঞানাঙ্কুর' ও 'প্রতিবিম্ব' পত্রে প্রকাশিত হয়। হিন্দু মেলার প্রথম স্বাক্ষরিত কবিতা প্রকাশেরর সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স তের বছর নয় মাস এবং 'প্রকৃতির খেদ' ছাপার সময় তাঁর বয়স চৌদ্দ বছর দুই মাস ছিল। এই কবিতাটির ভাব ও ভাষার সাহায্যে 'বনফুল' (১২৮২ (ও 'কবি কাহিনী' ১২৮৪ যেন এক নতুন রূপে দেখা যায়। এছাড়া ১২৮৪ শ্রাবণে 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কবির ছদ্ম নামে 'ভানু সিংহের পদাবলী' প্রথম কিস্তি সাতটি পদ ছাপা হয়। তার প্রায় পাঁচ বছর আগে) ১২৭৯-৮০ (সারদা চরণ ও অক্ষয় সরকার প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সেটি কবির লোভের সামগ্রী হয়েছিল সেকথা তিনি তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখে গেছেন। মৈথিলী ভাষায় বিদ্যাপতি পাঠ ও 'কৃত্রিম' ব্রজবুলিতে ভানু সিংহ রচনার জের অনেককাল রবীন্দ্রনাথ টেনেছেন তার প্রমাণ মেলে। বৈষ্ণব পদাবলীর ঝংকার তাঁর কাব্যে ও গানে কি নতুন রস দিয়েছে এবং মৈথিলী ব্রজবুলির

চর্চা থেকে শব্দতত্ত্বের নেশা তাঁকে কেমন করে পেয়ে বসেছিল তার আলোচনা আরো দরকার। তাঁর কাঁচা বয়সের কিছু পদ্য অনুবাদ লুকিয়ে আছে অনেক গদ্য প্রবন্ধের মধ্যে। ১৮৮৫ 'ভারতী' পত্রিকায় দান্তে 'ওবিয়েতিচ' প্রবন্ধে আলোচনায় কিছু কিছু পদ্য অনুবাদ পাওয়া যায়। ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিলাত যাত্রা করেন। তখন হয়ত তাঁর প্রথম ছাপা বই 'কবি কাহিনী'র ফাইল তাঁর হাতে ছিল। ওই সময়ে পাওয়া যায় তাঁর একটা গান 'জয় জয়ন্তী' যেটি স্বদেশীযুগে বহুদিন ধরে আদৃত হয়েছিল, 'তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ/তোমারই তরে মা সঁপিনু প্রাণ'। এগান স্মরণ করিয়ে দেয় বিদেশ যাত্রার সময় মধুসূদনের 'রেখ মা দাসেরে মনে'। অথচ ১২৮৪-তে ভারতীতে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'মেঘনাদ' সমালোচনা। এবং তারও দু'বছর আগে জ্ঞানাঙ্কুর) ১২৮২ (পত্রে ভুবন মোহিনী প্রতিভার বিশ্লেষণ। সুতরাং, পদ্যে ও গদ্যে রবীন্দ্র প্রতিভা ছেলেবেলায় যে আত্মপ্রকাশ করেছিল সেকথা মনে রেখে এসব কাঁচা লেখা গুলো ধৈর্য্যরে সাথে নতুন করে পড়া দরকার।

যে মুলোটা বাড়ে তার পাতা দেখলে যেমন বোঝা যায়, তেমনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে একজন বড় কবি হবেন তার প্রমাণ ছেলে বেলাতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বার বছর বয়সের একটা কিশোর তাঁর মধ্যে কবি হওয়ার যে বাসনা তা সত্যিই আমাদের মুগ্ধ করে। এর মূলে তাঁর পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা অপরিসীম। রবীন্দ্র পরিবার সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্গণে সে সময় সারা বাংলায় বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। সে প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত হয়েছিল নিঃসন্দেহে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গবেষণা এখনও শেষ হয়নি। কিন্তু আমাদের স্বভাব আমরা একটি প্রস্ফুটিত ফুলকে দেখে খুশি হই, তার সুবাস নিতে উদগ্রীব হই, কিন্তু বুঝতে চাইনা একটা পূর্ণ বিকশিত ফুল হতে হলে তাকে কত কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে আসতে হয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এটা সুস্পষ্ট। যদিও তাঁর ছেলেবেলার সাহিত্য সাধনার কথা এখনও অনেকের কাছে অজ্ঞাত প্রায়। সময় এসছে রবীন্দ্র প্রতিভা বিকাশের। দরকার আরো একটু চেষ্টা

মন্তব্য

আমরা জানি কবিতা হচ্ছে সাহিত্যের একটি শাখা। সম্ভবতঃ প্রাচীনতম শাখা। গ্রীক পণ্ডিতেরা এ-বিষয়ে কথা বলেছেন। এ্যারিষ্টটল 'পোয়েটিক্স' নামে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

১.৭-কবিতার স্বরূপ

কবিতা কী, তার চেহারা-চরিত্র কীরূপ ইত্যাদি নিয়ে বিস্তর বুদ্ধিবৃত্তিক উৎপাদন হয়েছে। তা সত্ত্বেও অনেকেই বলেন, 'কবিতা বুঝি না'। বুঝতে না পারার কারণ হচ্ছে কবিতা প্রধানতঃ আবেগ-নির্ভর ও যুক্তির ভারশূন্য। কবিতার মধ্যে শব্দের আভিধানিক অর্থের বাইরেও অনুল্লেখিত অর্থ থাকতে পারে। তাই একই কবিতার অর্থ নানা জনের কাছে নানা রকম হতে পারে।

কবিতার একটা সংজ্ঞা দরকার। কিন্তু সংজ্ঞার প্রসঙ্গ স্বয়ং আরেক বিতর্ক। প্রায় প্রতিটি বিষয়ের সংজ্ঞাই বহু ও বিবিধ। তাই কোন্‌টি ছেড়ে কোন্‌টি রাখবো, সেটি নির্ধারণ করাও সহজ নয়। নিজেই একটি সংজ্ঞা তৈরি করার কাজ আমার কাছে সহজতর মনে হয়েছে। আমি তাই করলামঃ

কবিতা হচ্ছে শ্রুতিনান্দনিক শব্দের সমন্বয়ে তালে ও প্রায়শঃ ছন্দে বিন্যস্ত আবেগঘন বিশেষ অর্থপ্রকাশক কথন বা লেখন।

এই সংজ্ঞায় বলা হচ্ছে (১) কবিতা শ্রুতি-সৌন্দর্যসম্পন্ন শব্দে তৈরি, (২) কবিতার মধ্যে রিদম বা তাল থাকে, (৩) কবিতার মধ্যে প্রায়শঃ ছন্দ থাকে কিন্তু থাকবেই হবে এমন বাধ্যতা নেই, (৪) কবিতার মধ্যে গভীর আবেগ থাকে (৫) কবিতা শাব্দিক অর্থ অতিক্রম করে একটি বিশেষ অর্থ নির্দেশ করতে পারে।

কবির ভাবনার জানালায় যা দেখা মেলে তা চিত্রকল্প। রূপক, উপমার পাশাপাশি চিত্রকল্পও পাঠক বা সমালোচকের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়া জরুরী। কেননা, চিত্রকল্পের মাধ্যমে কবির নিজস্ব ঢং প্রকাশ পায়। কবিতার শরীরে অনাকাঙ্খিতভাবে চিত্রকল্প ঢুকে পড়লে কবিতার গঠনশৈলী বিকৃত হয়। কবিতা হয়ে ওঠে জটিল। তখন কবিতাকে

আধুনিক বা উত্তর-আধুনিকতার দোহাই দিয়ে কবিতাকে তুলে ধরা হয়। প্রকৃতপক্ষে, কবিতাটি কেন অর্থবহ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হলো না তা আড়াল করা হয়। আধুনিকতার চাদর জড়িয়ে কবিতার দুর্বলতা আড়াল করা মানেই ঐ কবির আগামীর পথ রুদ্ধ করে দেওয়া। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, অতি অপরিচিত কবির কবিতাটি বেশ মানোত্তীর্ণ, কিন্তু পরিচিত কবি বা সমালোচকের কাছে সেটি কবিতাই হয়ে ওঠেনি বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। বলে রাখা জরুরি যে, প্রত্যেকটি কবিতা তার নিজস্ব আলোয় আলো ছড়িয়ে থাকে। কোনো কবির দৃষ্টিভঙ্গি বা বোধের কাছাকাছি পৌঁছানো বেশ কঠিন। সুতরাং, কোনো কবিতাকে 'কবিতা' হয়নি বা আধুনিক-অনাধুনিকতার দোহাই দিয়ে কবিতাকে নিচু করা আদৌ উচিত নয় বলে মনে করি। কেননা, এ বিষয়ে বিস্তর গঠনমূলক গবেষণা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক প্রসারের প্রয়োজন।

আধুনিকতা বা উত্তর-আধুনিকতা শব্দ দুটিই মানুষের সৃষ্টি, আমরাই আমাদের প্রয়োজনে এই শব্দদ্বয়কে সাহিত্যের পিঠে চড়িয়েছি। মূলত বিংশ শতাব্দীর দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাখ্যামূলক ভিত্তিতে বোঝানোর জন্যই এমন সৃষ্টি হয়েছে বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। সাথে সাথে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা তথা কবিতাকেও এই সরলরৈখিক উপপাদ্যের প্রমাণচিত্রে অহরহ অগ্নিপরীক্ষা দিতে হচ্ছে। ফলে কবিতার শরীর কাটা-ছেঁড়া করে কবিতার নিজস্ব ঢং বা গতি হারাচ্ছে। সেই সাথে ছন্দচর্চার অভাবেও হারাচ্ছে কবিতার নিজস্ব ছন্দ। জোর করে হলেও, কবিতার নিজস্ব ছন্দকে মাটি চাপা দিয়ে তার ওপর অন্য ছন্দ বা ঢং প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমরা ব্যস্ত। উল্লেখ্য যে, শিকড়কে বিসর্জন দিয়ে গাছের মগডালে ফল আশা করা বোকামি। সুতরাং, অতি-আধুনিকতার নামে কবিতাকে দিনে দিনে অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য করছি কি না তা আরও ভেবে দেখা জরুরী। অ্যান্ড্রিয়াস হুইসেন উত্তর-আধুনিকতাবিষয়ক একটি আলোচনায় উল্লেখ করেছেন, 'উত্তর-আধুনিকতার অস্পষ্ট অবয়বহীন ধারণা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এই শব্দটির অপরিবর্তনশীল ব্যবহারে শব্দটির অস্পষ্ট অর্থ আমাদের কাছে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।' একইভাবে, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার 'সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি' গ্রন্থে 'আধুনিকতা ও উত্তর-আধুনিকতা' বিষয়ে বলেছেন, 'সমালোচকরা

উত্তর-আধুনিকতার ব্যাখ্যায় কেউই একমত নন। এই উত্তর-আধুনিকতা একধরনের নব্যরীতিবাদ বা তার থেকেও নতুন কিছু।'

আধুনিক কবিতার নামে কবিতাকে অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন বা গন্তব্যহীন করা উচিৎ নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, আমাদের সমকালীন কবিদের হাত থেকে যেসব কবিতা বেরিয়ে আসছে; সেসব কবিতায় আরও বেশি দর্শন, বোধ ও গঠণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি উঠে আসা জরুরী। সাথে প্রাঞ্জলতা এবং সহজবোধ্যতাও প্রাধান্য পাওয়া উচিৎ। কারণ কবিতা হলো কবির মনন ও মেধার সংমিশ্রণ। এই সংমিশ্রণের কোনো কাল নেই। জীবনবোধ ও নাগরিক-দাবীর কথা কবিতায় উঠে আসে অবলীলায়, নির্ভয়ে। কবিতা কোনো ব্যক্তি বা দেশের একমাত্র সম্পদ নয়, বরং তা বিশ্বসকলের। কবিতার মাধ্যমে বন্ধন তৈরি হয় মানুষ ও মানবতার। কবিতায় আধুনিকতা তুলে ধরতে হলে কবিকে আত্মসচেতন হতে হবে। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান 'আধুনিক বাংলা কবিতা : প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত' গ্রন্থে 'আধুনিক কবিতা : প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত' বিষয়ে কবিকে বলেছেন, 'বর্তমানে দাঁড়িয়ে তিনি রচনা করেন অতীত ও ভবিষ্যতের সেতুবন্ধ। তিনি প্রগতির স্বপক্ষে, মানুষের স্বপক্ষে। তিনি মূলতঃ স্বাদেশিক কিন্তু ফলতঃ বিশ্বনাগরিক। জগৎ ও জীবন প্রসঙ্গে কবি কথা বলেছেন সব কালেই। আধুনিক কবি সেই সঙ্গে সচেতন হয়ে উঠেছেন নিজের সম্পর্কেও। বস্তুতঃ আধুনিক কবির এক প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনি আত্মসচেতন।' সুতরাং, কবিতায় আধুনিকতা স্থান পেল কি পেল না তা পাঠক কিংবা সমালোচকেরা নির্ধারণ করবেন, কবির এ বিষয়ে মাথা ব্যথা করা জরুরী নয়। কবির কাজ হলো কবিতার নন্দনতত্ত্বকে গুরুত্ব দেওয়া। তাহলে কবিতায় দুর্বোধ্যতা বা জটিলতা প্রসঙ্গটি দূরে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে, কবিতার নন্দনতত্ত্ব বা নান্দনিকতা কবির স্বকীয় বোধের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। এই সংযোজনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিখনের প্রয়োজন নেই বললেই চলে। প্রয়োজন, কবিতার প্রেমে কামাতুর হওয়া, ধ্যানমগ্ন হওয়া। কবিতার জন্য অপেক্ষা করা। একটি কবিতার জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করা। সময়ের জন্য অপেক্ষা করা। কবিতাকে পেশা নয় নেশা হিসেবে গ্রহণ করা। কবিতার নেশাকে নবায়নযোগ্য করে তোলা। কেউ কাউকে হাতে ধরে কবিতা শিখিয়ে

দিতে পারে না। কবিতার হাতেখড়ি বলে কিছু নেই। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এ বিষয়ে আরও উল্লেখ করেন যে, 'কবিতা আধুনিক পৃথিবীতে কারো পেশা নয়। উপরন্তু পেশামাত্রই প্রশিক্ষণযোগ্য। প্রশিক্ষণ দিয়ে অন্ততঃ সাধারণ মানের চিত্রকর, ভাস্কর, স্থপতি, গায়ক, যন্ত্রী, অভিনেতা ও নৃত্যশিল্পী যে তৈরি করা যায় তা বেশ বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রমাণ করেছেন আর্ট কলেজ, স্থাপত্য ফ্যাকাল্টি, নাট্য একাডেমী ও নাচ গানের হরেক রকমের স্কুল। কিন্তু কবির জন্য তেমন কোন প্রশিক্ষণের আয়োজন কোন সুফল আনেনি।...বস্তুতঃ কবিতা প্রশিক্ষণযোগ্য পেশা নয়।'

আধুনিক কবিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো -রূপকের ব্যবহার। পরিমিত রূপক শব্দ আধুনিক কবিতার শরীরকে ঋদ্ধ ও মজবুত করে। শব্দচয়নকে নান্দনিক করে তোলে। তবে তার সার্থক ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। রূপক ব্যবহারে যত্নবান ও সতর্ক না হলে কবিতার শরীর মেদবহুল এবং অনর্থক হয়ে পড়ে। সমকালীন কিছু কবিতায় লক্ষ্য রাখলে দেখা যায়, আধুনিকতা বা উত্তর-আধুনিকতার নামে অপ্রয়োজনীয় এবং সার্থকহীন রূপকের ব্যবহার বিরামহীনভাবে ব্যবহার হচ্ছে। এর ফলে কবিতা তার নিজস্ব বলয় থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে অন্য গোচরে, যা কবিতার পাঠকের জন্য হুমকিস্বরূপ। কবিতাকে এমন জটিল বা শব্দবিভ্রাট করে পাঠকের সামনে হাজির করলে কবিতার পাঠকপ্রিয়তা ক্রমেই হারাবে। উদ্ভট-জটিলতায় সংক্রমিত হবে কবিতার শিরা-উপশিরা। কবিতাকে নিজের গতিতে হাঁটতে দিতে হবে। রূপক শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে শব্দের ইঙ্গিত ঠিক রেখে কবিতাকে হাঁটাতে হবে। কবির ইঙ্গিতকে একটি দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপান্তর করে কবিতার ভেতর পাঠক ডুব দেবে। খুঁজে পাবে আক্ষরিক অর্থের আড়ালে অপার সৌন্দর্য এবং বোধের পুকুর। যেখানে পাঠক ডুব দিয়ে তুলে আনবে কবিতার রূপ ও রস। কিন্তু রূপক শব্দের আড়ালে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন শব্দের মনগড়া অর্থ কবিতায় স্বীকৃত নয়। বরং তা কবির প্রতি পাঠকের একটি অস্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়। সমকালীন কবিতায় কবিদের এই বিষয়টি খেয়াল রাখা বেশ জরুরী। নইলে আধুনিক কবিতাটি হয়ে উঠবে জটিল থেকে জটিলতর। অপ্রাসঙ্গিক রূপক ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি' গ্রন্থে উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

'রূপক-কাব্য' বিষয়ে বলেছেন, 'রূপক কবিতা কাহিনীমূলক। এই জাতীয় কবিতায় সমান্তরালভাবে আক্ষরিক অর্থ ছাড়া অন্য এক গভীর অর্থের ইঙ্গিত থাকে। অর্থটি আপাতপ্রতীয়মান নয়, কবির ইঙ্গিত অনুসরণ করে তাকে খুঁজে নিতে হয়।' একই বিষয়ে তিনি আরও উল্লেখ করেন, 'যে কোনো রূপক থেকেই একটি মনগড়া অর্থ তৈরি করা যায়। কিন্তু সেই অর্থ যদি কবির স্বীকৃতিতে সমর্থিত না হয় বা সেই অর্থের সমর্থন-সূচক কোনো ইঙ্গিত যদি রচনার মধ্যে সমান্তরালভাবে না থাকে তাহলে মনগড়া অর্থটিকে পরিত্যাগ করাই ভালো। স্বেচ্ছামতো রূপক আবিষ্কারের চেষ্টা মূল অর্থকে বিকৃত করতে পারে।' সুতরাং, উল্লিখিত বিষয় পর্যালাচনা করলে বোঝা যায় যে, কবিতা অর্থবহ করে তুলতে না পারলে কবিতার পাঠকপ্রিয়তা হারাতেই পারে। এক্ষেত্রে এখানে একটি আন্দাজভিত্তিক জনশ্রুতি তুলে ধরা যেতে পারে। যদিও এই আন্দাজভিত্তিক জনশ্রুতির যৌক্তিকতার বিষয়ে আরও আপেক্ষিক গবেষণা প্রয়োজন। বলা হয়, একজন তরুণ বা নবীন কবিÑ অন্য তরুণ-নবীন-প্রবীণ সকল কবির কবিতায় আগ্রহ রাখে বেশ। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে, একজন প্রবীণ কবি স্বভাবতই একজন নবীন বা তরুণ কবির কবিতায় সহজে আগ্রহী হতে পারে না। কারণ, ঐ তরুণ বা নবীন কবির কবিতায় যথেষ্ট দুর্বোধ্যতা কিংবা জটিলতা বিদ্যমান। কতিপয় এমন কবির কারণে সব তরুণ বা নবীনকে একই মাপকাঠিতে আনা উচিৎ হবে না। কেননা, তরুণ বা নবীন কবিদের হাত থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং আসছে বেশ নান্দনিক কবিতা, কালোত্তীর্ণ কবিতা; যা প্রশংসার দাবী রাখে। এক্ষেত্রে প্রবীনদের কবিতাও কম দাবী রাখে না।

প্রিন্ট কিংবা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সমকালীন কবিতায় খেয়াল করলে দেখা যায় যে, কেউ কেউ কবিতার নিজস্ব ঢং রপ্ত করে তা পাঠকের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিচ্ছে। কিছু উদ্ভট শব্দচয়ন বা পঙক্তি একত্রিত করে কবিতা নির্মাণ করছে। কবিতা পাঠক বুঝুক বা না-ই বুঝুক কবি সেসব দেদারসে লিখে যাচ্ছে। আসলে, কবি নিজেকে জ্ঞানী মনে করবে আর পাঠককে কবিতা বোঝে না ভেবে মূর্খ মনে করবে, এমনটা সত্য নয়। শিক্ষককে যেমন ছাত্রদের পড়া বুঝিয়ে দিতে হয়, তেমনি কবিপ্রধান কাজ পাঠকসুলভ কবিতা

রচনা করা। যাতে কবির-কবিতা পড়ে পাঠক পাঠোদ্ধার করতে পারে কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। এক্ষেত্রে, সমালোচক ক্লাইভ বেল শিল্পের রূপকলাকে 'তাৎপর্যব্যঞ্জক' হিসেবে রূপায়িত করেছেন। তাই বলে, কবিতায় কবির যে স্বাধীন সত্ত্বা থাকবে না তা কিন্তু নয়। কবিতায় কবির স্বাধীনতা আকাশ কিংবা সমুদ্রের মত বিশাল। এই স্বাধীনতার সুযোগে কবি তার কবিতায় যা ইচ্ছে তাই লিখে পাঠকের জন্য উপহার দিতে পারে না। পাঠকের চোখের দিকে তাকিয়ে কবিতহাঁটতে দিতে হবে। কবিতাকে জনচেতনার সামনে দাঁড়াতে দিতে হবে। তবেই পাঠক নিজে নিজে কবিতাকে খুঁজে নেবে। 'বাংলা সাহিত্য : কয়েকটি প্রসঙ্গ' গ্রন্থে মাহবুবুল হক ইংরেজ লেখক ই.এম . ফস্টারের একটি অভিমত উল্লেখ করেছেন, 'অন্তত তিনটি কারণে লেখকের স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন :প্রথমত, স্বাধীনতা ছাড়া লেখক কোনো কিছুর সৃষ্টির প্রেরণা পান না; দ্বিতীয়ত, লেখক যা ভাবেন তা প্রকাশ করার স্বাধীনতা না থাকলে লেখকের সৃষ্টি সার্থক হয় না; তৃতীয়ত, জনসাধারণের চেতনা ও মানস বিকাশের জন্যও এগুলি দরকার।'

বর্তমানে, ফ্রি হোম সার্ভিস ডেলিভারির মত কবিতাকে জোর করে পাঠকের দেরাজে ঢুকিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা, সমকলীন সাহিত্যবাজারে একটি আলোচিত বিষয়। সাথে আধুনিক কবিতার নামে সংগতিহীন ডামাডোলতো আছেই। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আদলে সৃষ্টি হচ্ছে ডজন ডজন কবি। ইচ্ছেমতো শব্দ সাজিয়ে কবিতা তৈরির অপচেষ্টা দিন দিন বাড়ছে। দেশের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পাঠকের চেয়ে লেখক-কবির সংখ্যা ঢের বেশি। কবিতা কাগজ-কালির বদলে ভার্চুয়্যাল দেয়ালে ঠাঁই পাচ্ছে। ফলে দিনে দিনে আমরা পড়তে ভুলে যাচ্ছি, আগ্রহী হচ্ছি লেখনিতে। কারণ, আমরা অনুকরণ বা অনুসরণ করে অন্য কবি বা লেখকের মত লিখতে আগ্রহী। অথচ, মানোত্তীর্ণ কোনো কবির কবিতা পড়ার চর্চা বা আগ্রহ দিনে হ্রাস পাচ্ছে, এসব অতি-আধুনিকতার সুফল। একটি বিষয় বলে রাখা জরুরী যে, কবিতায় অনুকরণবাদ বা অনুসরণবাদ কবিতাকে জটিল করে তোলে, অস্পস্ট করে তোলে। কেননা সেই কবিতায় সংশ্লিষ্ট কবির নিজস্বতা বলে কিছু থাকে না। চাঁদের আলোর মত সবটুকুই

ধার করা। আর আরোপিত কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। কবিতার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি খেয়াল রাখা কবির বুদ্ধিদীপ্ত কাজ বলে মনে করা হয়।

আর একটি বিষয় হলো, আধুনিক কবিতায় শব্দের সংযোজনা এমনভাবে রক্ষা করতে হবে যা কবিতার তাৎপর্যকে ইঙ্গিত দিতে পারে। শব্দের সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে কবির কল্পনার আশ্রয় নিতে হতে পারে। কিন্তু কবির কল্পনা যেন পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সরলরৈখিক সংযোগ স্থাপন করে, সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরী। অহেতুক জটিল অধ্যায়ের অবতারণা থেকে নিজেকে দূরে রাখা শ্রেয়। কবির সাথে পাঠকের মানসিক দূরত্ব তৈরি হলে কবিতাকে পাঠক গ্রহণ না-ও করতে পারে। 'সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি' গ্রন্থে উজ্জ্বলকুমার মজুমদার 'কল্পনাশক্তি' বিষয়ে বলেছেন, 'কবিতার মধ্যে এই রকম বিচিত্র ও কখনো কখনো বিপরীত ভাবের মিলন যে ঘটে তা কবির কল্পনাশক্তির বলেই ঘটে থাকে। কাজেই কল্পনা কথাটির অর্থ সৃষ্টি-ক্ষমতা। এই কল্পনাশক্তির বলেই অপ্রত্যক্ষ বস্তু প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত হয়, যা মানসিক ব্যাপার তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য হয়ে ওঠে।' সুতরাং, কবিতা পাঠকের অনুকূলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়া জরুরী। বাস্তবতার নিরিখে বাস্তবচিত্রের পাশাপাশি কল্পনাকে কবিতায় স্থান দিতে হলে ভাবপ্রকাশে, এবং শব্দচয়নে আধুনিক ও চৌকস হতে হবে। ভাবপ্রকাশে কবির ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। পাঠক কবিতাকে আধুনিকতার মানদন্ডে নিরীক্ষণপূর্বক কবিতার প্রতি আলাদা কাব্যিক-প্রীতি তৈরি করে। কবিতায় কখনও কবির আত্মতুষ্টি থাকতে নেই। থাকতে নেই মানসিক প্রশান্তি। তাহলে কবির মৃত্যু হয়। কবিতার ক্ষেত্রে কবিকে আরও বেশি ক্ষুধার্ত, তুষ্টিহীন, প্রশান্তিহীন হতে হবে। নইলে নতুনত্বের সৃষ্টি হবে কি করে? কবিতার খিদে ফুরিয়ে গেলে কবিতায় নান্দনিকতা আসে না। খিদেকে জাগিয়ে রাখতে হবে। তবে এ কথাও সত্য যে, কবিতায় আপেক্ষিক মানসিক প্রশান্তির প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ নিজে কবিতা থেকে প্রশান্তি না পেলে, পাঠকও পাবে না। কবিতার রূপ ও তার উপাদেয় উপাদান কবিতার ভিতরেই লুকিয়ে থাকে। কেবল দেহগত বা রূপগত সৌন্দর্যই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন ভেতরকার সৌন্দর্যকে বাইরে প্রস্ফূটিত করা,

তবেই পাঠক কবিতার রূপ-রসে সিক্ত হবে। কবিতার ঘ্রাণে বিমোহিত হবে, আন্দোলিত হবে।

আধুনিকতা নিয়ে খুরশীদ আলম তার 'আধুনিকতা ও সাম্প্রতিকতার সমন্বয়' (দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০.০৮.২০১৮) প্রবন্ধে বলতে চেয়েছেন, 'আধুনিকতার সংজ্ঞা নির্মাণ করা একটি দুঃসাহসিক কাজ। মনে রাখা প্রয়োজন আধুনিকতাকে সংজ্ঞায় নির্ণীত করার প্রয়োজনে পূর্বের কবিদের রচনাবলী বাতিল করা যায় না, তেমনভাবে কোনো মতবাদের অভিধায় একে চিহ্নিত করা ভুল প্রচেষ্টা বলে গণ্য হবে।' আধুনিকতার আরও গভীরে হাঁটতে হাঁটতে উজ্জ্বল সিংহ তার 'প্রসঙ্গ আধুনিকতা, আধুনিক কাব্য' কালিকলম প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, 'যুক্তিবাদকেই যে আধুনিকতাবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলা যায়, ও সেটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন ম্যাক্স ভেবের, কারণ উনিশ শতকের শেষের দিক থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকেই আধুনিকতাবাদ হিসেবে মনে করা হতো। আর আধুনিকতার সাধারণ লক্ষণ হলো নতুন-নতুন ভাবনা-চিন্তা, দর্শন, শৈলী, মনোভঙ্গি, দৃষ্টিকোণ ইত্যাদি বিষয়ে তীব্র আগ্রহ, কৌতূহল এবং তার যথাযথ উপস্থাপনা।' উল্লেখ্য যে, একদল তরুন-কবির আত্ম-সচেতন বিদ্রোহের ফলে কবিতায় আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটে থাকে।

১.৮-সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১- রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এর জন্ম ও মৃত্যু সাল কত?

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এর জন্ম ১৮২৭ এবং মৃত্যু ১৮৮৭ সালে।

২- হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এর জন্ম ও মৃত্যু সাল কত?

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এর জন্ম ১৮০৮ এবং মৃত্যু ১৯০০ সালে।

৩- নবীনচন্দ্র সেন এর জন্ম ও মৃত্যু সাল কত?

নবীনচন্দ্র সেন এর জন্ম ১৮৪৭ এবং মৃত্যু ১৯০৯ সালে।

৪-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর জন্ম ও মৃত্যু সাল কত?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর জন্ম ১৮৬১ ও মৃত্যু ১৯৪১ সালে।

৫- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর 'চৈতালী' কাব্য কত সালে লেখা হয়?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর 'চৈতালী' কাব্য ১৯২২ সালে লেখা হয়।

১.৯-অনুশীলনী প্রশ্ন

১-আধুনিক কবি দের কবিতার বৈশিষ্ট ও আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট লেখ।

২-গদ্য কবিতা কাকে বলে?

১.১০-গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- দেবেশ কুমার আচার্য্য।

একক ২-মেঘনাদবধ কাব্য -মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বিন্যাস ক্রম

২.১ ভূমিকা- মধুসূদনের জীবনকথা -কবি, নাট্যকার, বাংলা কাব্যের সনেট ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক।

২.৩ মহাকাব্য ও মেঘনাদবধ

২.৪ চরিত্র আলোচনা-

২.৪.১ নারী চরিত্র

২.৪.২ পুরুষ চরিত্র

২.৫ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

২.৬ অনুশীলনী প্রশ্ন

২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ ভূমিকা

১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি যশোর জেলার কপোতাক্ষ নদের তীরবর্তী সাগরদাঁড়ি গ্রামে, জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন কলকাতার একজন প্রতিষ্ঠিত উকিল এবং সাগরদাঁড়ি অঞ্চলের জমিদার। মায়ের নাম জাহ্নবী দেবী। শৈশবে মায়ের তত্ত্বাবধানে তার শিক্ষারম্ভ হয়। এরপর তিনি সাগরদাঁড়ির পাঠশালায় প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এরপর সাত বছর বয়সে তিনি কলকাতা যান এবং সেখানকার খিদিরপুর স্কুলে দুবছর লেখাপড়া করেন। ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে এই স্কুল ত্যাগ করে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজে তিনি বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা শেখেন।

১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলেজের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ইংরেজি 'নাট্য-বিষয়ক প্রস্তাব' আবৃত্তি করে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার জন্য, তিনি বরাবর বৃত্তি পেতেন। এ সময় নারীশিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করে তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের সময়েই মধুসূদন কাব্যচর্চা শুরু করেন। তখন তাঁর কবিতা জ্ঞানান্বেষণ, Bengal Spectator, Literary Gleamer, Calcutta Library Gazette, Literary Blossom, Comet প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। এই সময় থেকেই তিনি স্বপ্ন বিলেত গিয়ে লেখাপড়া করার স্বপ্ন দেখতেন। এছাড়া তাঁর ধারণা ছিল বিলেতে যেতে পারলেই বড় কবি হওয়া যাবে। সন্তানের এই মনোভাব লক্ষ্য করে, তাঁর পিতা তাঁর বিবাহ ঠিক করেন। কিন্তু তিনি ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি তিনি খ্রিষ্টান ধর্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর নামের শুরুতে 'মাইকেল' শব্দটি যুক্ত করেন। এই ঘটনায় তাঁর পিতা তাঁকে ত্যাগ করেন। সে সময়ে হিন্দু কলেজে খ্রিষ্টানদের অধ্যয়ন নিষিদ্ধ থাকায়, মধুসূদনকে এই কলেজ ত্যাগ করতে হয়। ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বিশপ্স কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত তিনি এখানে অধ্যয়ন করেন। এখানে তিনি ইংরেজি ছাড়াও গ্রিক, ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষা শেখার সুযোগ পান।

ধর্মান্তরের কারণে, পিতার কাছ থেকে তাঁর আর্থিক সাহায্য পাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এই কারণে ভাগ্যান্বেষণে তিনি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ চলে যান। মাদ্রাজে এসে তিনি প্রথমে মাদ্রাজ মেইল অরফ্যান এ্যাসাইলাম স্কুলে) ১৮৪৮-১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দ (এবং পরে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হাইস্কুলে শিক্ষকতা) ১৮৫২-১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দ (করেন। এ ছাড়া এখানে তিনি তিনি সাংবাদিক ও কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

তিনি Eurasion (পরে Eastern Guardian), Madras Circulator and General Chronicle ও Hindu Chronicle পত্রিকা সম্পাদনা করেন এবং ১৮৪৮ থেকে ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত Madras Spectator-এর সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। মাদ্রাজে অবস্থানকালেই Timothy Penpoem ছদ্মনামে তাঁর প্রথম

কাব্যগ্রন্থ The Captive Ladie (১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দ (এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ Visions of the Past প্রকাশিত হয়। এখানে থাকাকালে প্রথমে রেবেকা পরে হেনরিয়েটার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। মাদ্রাজে থাকাবস্থায় তিনি হিব্রু, ফরাসি, জার্মান, ইটালিয়ান, তামিল ও তেলেগু ভাষা শিক্ষা করেন। এরমধ্যে মধুসূদনের পিতামাতা উভয়ের মৃত্যু হয়। এরপর তিনি তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হেনরিয়েটাকে নিয়ে ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি কলকাতা আসেন। সেখানে তিনি প্রথমে পুলিশ কোর্টের কেরানি এবং পরে দোভাষীর কাজ করেন। এ সময় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের রত্নাবলী) ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দ (নাটক ইংরেজিতে অনুবাদ করতে গিয়ে, তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যে উপযুক্ত নাটকের অভাব অনুভব করেন। এই সময় তিনি বাংলায় নাটক রচনার সংকল্প করেন। এই সূত্রে তিনি কলকাতার পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়া থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত হন। তিনি মহাভারতের দেবযানী-যযাতি কাহিনী অবলম্বনে ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে পাশ্চাত্য রীতিতে রচনা করেন 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। এটিই ছিল প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক নাটক। এই অর্থে মধুসূদনকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাট্যকার বলা হয়।

১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দুটি প্রহসন রচনা করেন। এই দুটি প্রহসন হলো 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'। এই বছরেই তিনি গ্রিক পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে রচনা করেন 'পদ্মাবতী' নাটক। এ নাটকেই তিনি পরীক্ষামূলকভাবে ইংরেজি কাব্যের অনুকরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার বরেন। এই বছরেই তিনি একই ছন্দে রচনা করেন 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'। এই বৎসরে জ্ঞাতিশত্রুদের বিরুদ্ধে মামলা করে পিতৃসম্পত্তি উদ্ধার করেন।১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে রামায়ণের কাহিনি অবলম্বনে তিনি রচনা করেন 'মেঘনাদ বধ কাব্য'। এই বৎসরেই আরও দুটি রচনা 'কৃষ্ণকুমারী' ও 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য।১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে নারী প্রগতিবাদী নাটক বীরাঙ্গনা রচনা করেন। এই বছরে তিনি কিছুদিন হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এই বৎসরের ৯ই জুন ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে বিলেত যান এবং গ্রেজ-ইন-এ যোগদান করেন। ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি প্যারিস হয়ে ভার্সাই নগরীতে যান এবং সেখানে প্রায় দুবছর অবস্থান

করেন। এখানে ভার্সাইতে অবস্থানকালে তিনি ইতালীয় কবি পেত্রার্কের অনুকরণে বাংলায় সনেট লিখতে শুরু করেন। তাঁর এই সনেটগুলি ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে 'চতুর্দ্দশপদী' কবিতাবলী নামে প্রকাশিত হয়।

ফ্রান্সে থাকাকালীন সময়ে অর্থকষ্টে পড়লে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন। ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর তিনি ব্যারিষ্টারি পাশ করেন।১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পুনরায় ইংল্যান্ড যান এবং ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে গ্রেজ-ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাস করেন। ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ৫ই জানুয়ারি দেশে ফিরে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগ দেন। কিন্তু ওকালতিতে সুবিধে করতে না পেরে ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে মাসিক এক হাজার টাকা বেতনে হাইকোর্টের অনুবাদ বিভাগে যোগদান করেন। কিন্তু দুবছর পর এ চাকরি ছেড়ে তিনি পুনরায় আইন ব্যবসা শুরু করেন। এবারে তিনি সফল হন, কিন্তু অমিতব্যয়িতার কারণে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর ঋণগ্রস্ত হয়ে বিপদে পড়লে, মধুসূদন তাঁর সম্পত্তি কুড়ি হাজার টাকায় বিক্রয় করে বিদ্যাসাগরকে বিপদমুক্ত করেন।১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে হোমারের ইলিয়াড অবলম্বনে তিনি রচনা করেন হেক্টরবধ।১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে মধুসূদন কিছুদিন পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংহ দেও-এর আইন-উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর শেষ রচনা মায়াকানন রচনা করেন।

তাঁর শেষজীবন অত্যন্ত দুঃখ-দারিদ্রের মধ্যে কেটেছে। ঋণের দায়, অর্থাভাব, অসুস্থতা, চিকিৎসাহীনতা ইত্যাদি কারণে তাঁর জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। শেষজীবনে তিনি উত্তরপাড়ার জমিদারদের লাইব্রেরি ঘরে বসবাস করতেন।

১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে জুন তাঁর স্ত্রী হেনরিয়েটা মৃত্যুবরণ করেন।

১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে জুন মধুসূদন মৃত্যুবরণ করেন।

মধুসূদন দত্তের রচনাবলি বাংলা রচনা

- শর্মিষ্ঠা নাটক ,১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দ
- একেই কি বলে সভ্যতা, ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ

- বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ', ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ
- পদ্মাবতী নাটক, ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ
- তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ
- মেঘনাদবধ কাব্য, ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ
- ব্রজঙ্গনা কাব্য,১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ
- কৃষ্ণকুমারী নাটক, ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ
- বীরাঙ্গনা কাব্য ,১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দ
- চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী,১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দ
- হেক্টর বধ ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দ
- মায়াকানন ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দ, মৃত্যুর পরে প্রকাশিত

ইংরেজি রচনা

- The Captive Ladie (1854)
- The Anglo-saxon and the Hindu (1854)
- Ratanavali, Translation (1858)
- Sermista , Translation (1859)
- Nil Durpan, Translation (1861)

প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলা সাহিত্যের পুরোধা মধুসূদনের সৃজনী প্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষর ও পথিকৃতের গৌরব সুস্পষ্ট। মধুসূদনের প্রহসন দুখানি ও নাটক গুলির মধ্যে যে ধারার উৎসমুখ খুলে দেওয়া হয়েছে তা বিচিত্র স্রোতে বাংলা নাট্য সাহিত্য কে সমৃদ্ধি করে। ‘কৃষ্ণকুমারী’ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক ট্রাজেডি। কাব্য ক্ষেত্রে তিনি

তিলোত্তমা এবং মহা কাব্যের কলি। এরই পরিস্ফুট রূপ মেঘনাদবধ কাব্য। বাংলা মহাকাব্যের প্রথম ও প্রধান সৃষ্টি। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে নতুন ভাবসংগ্রহ ও রূপপরিকল্পনা দুটিতেই মধুসূদনের মৌলিকতা সুপষ্ট। জীবনচেতনা ,ব্যক্তিস্বাতন্ত্র , স্বদেশপ্রেম ,জাতীয়তাবোধ ,মানবনীতির প্রকাশ -এই ভাবাদর্শ গুলি বাংলা সাহিত্যে নব প্রেরনা এনে দিয়েছিল।

২.২ মেঘনাদবধ কাব্য

মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনীর ঘটনা কাল তিন দিন) সূক্ষ হিসাবে আড়াই দিন (দুই রাত্রি মাত্র। এই সংকীর্ণ কালের মধ্যেও কবি কাহিনীর বৈচিত্র কে ঘটনাবলীর সাহায্যে প্রকাশ করেছেন। লঙ্কা ,সাগর নিম্নে বারুনির গৃহ ,প্রোমদ উদ্দ্যান ,অমরাবতী ,কিলাস , যোগাসন পর্বত ,মায়ার নিকেতন ,চন্ডীর দেউল ,নরক প্রভৃতি নানা স্থানের বর্ণনাবৈচিত্রের বিস্ময়কর পটভূমিকায় কাহিনী অশ্লথ গতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে। ১৮৬১ সালে দুই খণ্ডে বই আকারে প্রকাশিত হয়। কাব্যটি মোট নয়টি সর্গে বিভক্ত। মেঘনাদবধ কাব্য হিন্দু মহাকাব্য রামায়ণ অবলম্বনে রচিত, যদিও এর মধ্যে নানা বিদেশী মহাকাব্যের ছাপও সুস্পষ্ট।

বিষয়বস্তু ও কাঠামো-

গ্রিক রীতিতে হিন্দু পূরাণের কাহিনী অবলম্বন করে এই কাব্যটি রচিত। এর মূল উপজীব্য রামায়ণ। মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্য সর্বাংশে আর্য রামায়নকে অনুসরণ করে রচনা করেন নি। প্রতিটি চরিত্রের উপর বাল্মীকির থেকে ইয়ংবেঙ্গলের প্রভাব অনেক বেশী। ‘মেঘনাদ বধ’ কাব্যের লঙ্কা কাণ্ডের স্থান লঙ্কা দ্বীপের পরিবর্তে হল হিন্দু কলেজ, ভাষাতেও আধুনিকতার প্রছাপ।

প্রথম সর্গ আরম্ভ হয়েছে রাবনের অন্যতম বীর পুত্র বীরবাহুর মৃতু ঘটনার বর্ণনা দিয়ে। শেষ হয়েছে মেঘনাদের সৈনাপত্যবরনে। সর্গের নাম এই হেতু হয়েছে‘‘ অভিষেক’’। সর্গের কালসীমা মধ্যাহ্ন থেকে দিবাসন পর্যন্ত। পুত্র শোকে কাতর রাবণ বীরবাহু জননী চিত্রাঙ্গদার কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে যুদ্ধ সজ্জা পড়লেন। বীরপদে লঙ্কা কেঁপে উঠল। কম্পনের

ফলে সমুদ্র তলে বারুণীর প্রাসাদ কেঁপে উঠল। বারুণীর আদেশে মুরলা-সখী লঙ্কার রাজলক্ষীর সাথে দেখা করতে গেল। লক্ষী-মুরলা কথপকথনে জানা গেল মেঘনাদ জীবিত ,বীরবাহুর মৃত্যুর খবর সে জানেনা। লক্ষী ছদ্মবেশে গিয়ে মেঘনাদকে এই খবর দিল। মেঘনাদ লঙ্কায় এসে পিতার কাছে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। রাবণ মেঘনাদকে সেনাপতি পদে অভিষেক করলেন।

দ্বিতীয় সর্গের নাম'' অস্ত্রলাভ''। মূল বিষয় -শিবের অনুকূল্যে রামচন্দ্রের মেঘনাদ বধের উপায় জানা ও অস্ত্রসম্ভার প্রাপ্তি। ঘটনা কাল প্রথম ঘটনার ঠিক পরবর্তী রজনীর প্রথমার্ধ। লক্ষী এসে স্বর্গে খবর দিলেন মেঘনাদ সেনাপতি হয়েছেন। ইন্দ্র শচীকে নিয়ে কৈলাসে গেলেন। শিব অনুপস্থিত। পার্বতী জানালেন দুর্গম যোগাসন পর্বতে শিব ধ্যান মগ্ন। ইন্দ্র ও ইন্দ্রানীর আবেদনে দেবী রাবনের বিরুদ্ধে যেতে রাজি হলেন না। এমন সময় রামচন্দ্রের মিনতি কৈলাসে ভেসে এল। তখন দেবী রতির সাহায্যে মোহিনী মূর্তি ধারন করলেন এবং যোগাসন পর্বতে গিয়ে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করলেন। শিব রামচন্দ্রকে মেঘনাদ বধের উপায় বলে দিলেন। তদনুসারে ইন্দ্র মায়ার নিকেতনে এসে রুদ্রতেজে সৃষ্ট অস্ত্রাদি নিয়ে গেলেন। এবং গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ কে দিয়ে তা রামচন্দ্রের শিবিরে পাঠিয়ে দিলেন।

তৃতীয় সর্গের নাম'' সমাগম''। মূল বিষয় প্রমদ-উদ্যান থেকে প্রমিলার লঙ্কা প্রবেশ। ঘটনাকাল প্রথম রাত্রির প্রথমার্ধ। মেঘনাদ প্রমিলাকে কথা দিয়ে গিয়েছিল সে অবিলম্বে রামচন্দ্র ও লক্ষণকে বধ করে তাঁর কাছে ফিরে আসবে। কিন্তু তাঁর বিলম্ব দেখে প্রমীলা ব্যাকুল হল এবং সবলে লঙ্কায় স্বামীর সহিত দেখা করার জন্য রণবেশে অগ্রসর হল। সখীগণ সহ প্রমীলা লঙ্কায় গিয়ে মেঘনাদের সাথে মিলিত হল। ভীত রামচন্দ্র তখন বিভীষণকে পাঠালেন বূহ্য পরীক্ষা করতে ,দেবী পার্বতী প্রমিলার তেজ হরণ করলেন।

চতুর্থ সর্গের নাম ''অশোক বন''। মূল ঘটনা সীতার মুখে তাঁর সুখ দুঃখের কাহিনী এবং যুদ্ধের কারন অ পরিণতি শ্রবন। ঘটনাকাল সেই প্রথম রাত্রির প্রথমাংশ। ইন্দ্রজিৎ সেনাপতি হয়েছে শুনে চেড়ীরা বিজয় উৎসবে মেতে গিয়েছে। সেই অবসরে সরমা

এসেছে সীতার কাছে। সীতা তাঁকে বললেন কি ভাবে রাবণ তাঁকে চুরি করেছে। জটায়ু নিহত হয়েছেন, এবং তিনি স্বপ্নে দেখেছেন রামচন্দ্র বানর সমেত স্ব দলবলে এসে তাঁকে লঙ্কা থেকে উদ্ধার করেছেন।

পঞ্চম সর্গের নাম ''উদ্যোগ''। লক্ষন কতৃক লঙ্কার উত্তর দুয়ারে দেবী চণ্ডীর আরাধনা।এবং দেবীর আদেশে ইন্দ্রজিৎ কে বধ করার জন্য যাত্রা। অন্যদিকে মেঘনাথের যজ্ঞাগারে আগমন। ঘটনাকাল সেই প্রথম রাত্রির শেষভাগ। সর্গে উদ্বিগ্ন ইন্দ্র কে আশ্বস্ত করে মায়াদেবী লক্ষনের কাছে সুমিত্রার বেশে গিয়ে আদেশ দিলেন- লঙ্কার উত্তরে দেবী চন্ডীর মন্দিরে গিয়ে একাকী অর্চনা করতে। রাম এই দুঃসাহসিক কাজ করতে দিতে প্রথমে রাজি হলেন না পরে বিভীষনের পরামর্শে রাজি হলেন। লক্ষন একা চললেন। পথে মায়া-ঝড়, মায়া-সিংহ, মায়া-কামিনীরা তাঁকে ভীত করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। শেষে লক্ষন দেবীর অনুমতি নিয়ে শিবিরে ফিরলেন। ওদিকে মেঘনাদ শয্যা ত্যাগ করে প্রমীলা সহ জননী মন্দোদরী কে প্রণাম করতে গেলেন। মন্দোদরী পুত্রের কল্যাণ কামনায় সারারাত শিব পূজা করছিলেন। পুত্রকে যুদ্ধে যেতে বারন করলেন, মেঘনাদ তাঁকে সান্তনা দিলেন। মন্দোদরী প্রমীলাকে নিজের কাছে থাকতে বললেন। প্রমীলার কাছে বিদায় নিয়ে মেঘনাদ একাকী যজ্ঞাগারে চলে গেলেন।

ষষ্ঠ সর্গের নাম ''বধ'' । মূল বিষয় -মেঘনাদ বধ। প্রথম প্রহরের অন্ত্য প্রহরের ঘটনা।রাম কিন্তু লক্ষণকে মেঘনাদের যজ্ঞাগারে পাঠাতে রাজি হলেন না। তখন আকাশবাণী হল। রাম প্রিয় ভ্রাতা কে দেব অস্ত্রে সজ্জিত করে। এবং বিভীষণের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। মায়ার অনুরোধে লঙ্কার রাজলক্ষীর তেজ সংহরণ করলেন। অদৃশ্য ভাবে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করলেন লক্ষন। প্রথমে মেঘনাদ তাঁকে ইস্ট দেবতা বলে ভ্রম করলেন। পরে ভুল ভাঙলে লক্ষন যখন তাঁকে নিরস্ত্র অবস্থায় আঘাত করতে গেলেন তখন মেঘনাদ তাঁকে আক্রমণ করলেন এবং লক্ষন সংজ্ঞা হারালেন। এই সুযোগে মেঘনাদ অস্ত্রশালায় প্রবেশ করতে গিয়ে বিভীষণের দ্বারা বাধা পেলেন। অনুরোধ , মিনতি ,কোন কিছুতেই বিভীষণ দ্বার ছেড়ে দিলেন না। এই অবসরে লক্ষন মেঘনাদ কে বধ করলেন।

সপ্তম সর্গের নাম ''শক্তিনির্ভেদ''। মূল কাহিনী- রাবণের প্রতিশোধ গ্রহণ তথা পুত্রহন্তা লক্ষন কে শক্তিশেলে পাতন। ঘটনা কাল দ্বিতীয় দিবস। প্রভাতে শিব প্রেরিত বীরভদ্র জানালো মেঘনাদ বধের কথা এবং প্রতিশোধ নিতে উৎসাহ দিল। রাবণ সজ্জিত হলেন। ওদিকে দেবগণ সহ ইন্দ্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। ভীতা পৃথিবী শরণ নিলেন বিষ্ণুর। বিষ্ণু গড়ুড়কে দেব তেজ হনন করার আদেশ দিলেন। রাবণ ভীতা মন্দাদরিকে আশ্বস্ত করে যুদ্ধে ক্ষেত্রে এসে দেখলেন ইন্দ্রজিৎ বধে উল্লাসিত ইন্দ্র সসৈনে যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসেছেন।ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে রথ চালাবার আদেশ দিলেন রাবণ। পথে বাধা দিলেন দেব সেনাপতি কার্তিকেয়। পরে দেবী পার্বতীর আদেশে আহত কার্তিকেয় পথ ছেড়ে দিলেন। ইন্দ্রও মহারুদ্র তেজে বলীয়ান রাবণের হাতে পরাভূত হলেন। সুগ্রীব এবং হনুমানের হার হল। শেষে রাবণ লক্ষণকে দেখতে পেলেন। তুমুল যুদ্ধ হল। লক্ষনের বীরত্বে মুগ্ধ হলেন রাবণ। শেষে শক্তিশেলের আঘাতে লক্ষন ভুমিপাত হলেন। লক্ষনের দেহ রথে তুলতে চাইলেন রাবণ। পার্বতীর অনুরোধে শিব বীরভদ্রকে পাঠালেন রাবণকে একাজ নিষেধ করতে। রাবণ বিজয় গৌরবে লঙ্কায় প্রবেশ করলেন।

অষ্টম সর্গের নাম ''প্রেতপুরী''। মূল বিষয়- রামের প্রেতপুরীতে গমন এবং সেখানে দশরথের নিকট হতে লক্ষনের জীবন লাভের উপায় জানা। ঘটনা কাল দ্বিতীয় রাত্রি। ভ্রাতার মৃত্যুতে রাম অচেতন হয়ে পড়েছিলেন। জ্ঞানলাভ করে বিলাপ করতে লাগলেন। ওদিকে কৈলাসে পার্বতীর প্রার্থনায় শিব নিজের ত্রিশূল দিলেন মায়াকে। মায়া সেটি হাতে করে রামচন্দ্রকে নিয়ে প্রেতপুরীর উদ্দেশ্যে চললেন। বৈতরণী নদীর বিচিত্র সেতু পার হয়ে মৃত্যুলোকে প্রবেশ করলেন রাম। পথে মৃত্যুর দূত স্বরূপ জ্বর, অজীর্ণ, যক্ষা, বিসূচিকা, প্রভৃতি রোগকে দেখলেন রাম। আত্মহত্যা রূপি দূত কেও দেখলেন। রৌরব নরকে পাপীদের দুর্দশা দেখে রামের হৃদয় ব্যথিত হল। মৃত রাক্ষস মারীচের সঙ্গে সাক্ষাত হল রামের। কামতুর পুরুষ নারীদের যন্ত্রণা ও পাপের ফল দেখলেন। পশ্চিম দুয়ারে থাকেন মৃত রাজর্ষিগণ। পিতা পুত্রের দেখা হল। দশরথ বললেন হনুমান

রাতের মধ্যে সঞ্জীবনী নিয়ে এলে লক্ষন বাঁচবে। রামচন্দ্র অর্ধরাতে রনক্ষেত্রে ফিরে এলেন।

নবম পর্বের নাম ''সংস্ক্রিয়া''। মূল বক্তব্য- মেঘনাদের শ্মশানকৃত ও প্রমীলার সহমরণ। কাল তৃতীয় দিবস। রাবণ প্রভাতে জানলেন লক্ষন প্রান ফিরে পেয়েছেন। তখন পুত্রের শবদাহের জন্য অনুমতি চেয়ে মন্ত্রী সারনকে রামচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। রাম রাবণের প্রস্তাবে সাত দিন যুদ্ধ বন্ধ রাখতে রাজি হলেন। পশ্চিম দুয়ার দিয়ে শব যাত্রা বাহির হল। শেষ সম্মান দেওয়ার জন্য রাক্ষস সৈন্য দল চলল। রাম অঙ্গদ কে প্রতিনিধি করে পাঠালেন শব যাত্রায়। সমুদ্রতীরে চিতা প্রজ্বলিত হল, প্রমীলা সহমরণে গেলেন। শেষে রাবণ শোকার্ত মনে লঙ্কায় ফিরে এলেন- ''সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে''।

২.৩ মহাকাব্য ও মেঘনাদবধ

মহাকাব্য বা প্রাচীন আখ্যান কাব্যের উদ্ভব মুহূর্ত সূচিত হয়েছে রাজসভায় বীর এবং রাজচরিত্রের জয়গান গেয়ে। কিন্তু রাজসভার কোন বিশেষ বীর বা রাজার জয়গাঁথা একদিন কালস্রোতে ভাসতে ভাসতে একটি দেশের সমগ্র জাতির বহুকাল অনুসৃত ধর্ম - সমাজ -বিশ্বাস ,জীবন চর্চা ,কামনা অভীপ্সার বন্দরে এসে ভিড়ল। পৃথিবী স্বীকৃত চারটি মহাকাব্য আলোচনা করলে দেখা যায় ব্যপকতায় ,বিশালতায় এরা বিরাট কালসীমার অন্তর্গত একটি জাতির সমগ্র সত্তাকে বিবৃত করার চেষ্টা করেছে। লেখক এখানে কোনো একজন ব্যক্তি কিনা জানা নেই তবে বিষয় সামগ্রী তাঁর ব্যক্তি চিত্ত ভূমি থকে প্রকাশিত না হয়ে অনেক লোককথা লোকবিশ্বাস এবং অনেক কবির তিল তিল সাহিত্য ধারাই সমুদ্র প্রকাশ ,এ তত্ত্ব তর্ক এবং অপ্রশ্নে স্বীকার করা চলে। রামায়ন ,মহাভারত , ইলিয়ড ,ওডিসি ,পড়লে এ ধারনাই প্রবল হবে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের আধুনিক ধারার প্রবর্তক এবং বাংলায় প্রথম মহাকাব্য রচয়িতা। যিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম বাঙালি কবি ও বাংলা সাহিত্যে নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুপম

কারুকার্যে পৌরাণিক আখ্যান রামায়ণ অবলম্বনে রচিত মেঘনাদবধ কাব্য । এই মহাকাব্য রচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উপকরণের সংমিশ্রণে মধুসূদন দত্ত আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বস্তুত এটি গ্রিক আদর্শে রচিত প্রথম সার্থক বাংলা মহাকাব্য। মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনী শাখা মহাকবি বাল্মিকি রামায়ণ হতে সংগৃহীত করেছেন। পৌরাণিক আখ্যান বাল্মীকির রামায়ণে রাম সৎ ,সাহসী বীরযোদ্ধা, সত্যনিষ্ঠ এবং দয়াবান। রাবণ অত্যাচারী, পাপীতাপী । কিন্তু মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে রাম ভীরু, শঠ, প্রতারক এবং দুর্বল চরিত্রের লোক এবং রামায়ণের নায়ক দেবতা রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতাকে অপহরণকারী রাক্ষস রাবণকে উল্লেখ করেছেন মহাবীর, স্নেহময় পিতা, ভাই এবং প্রজাহিতৈষী রাজা হিসেবে। আর রাবণপুত্র মেঘনাদকে উল্লেখ করেছেন অসম সাহসী বীর হিসেবে। মধুসূদন রামায়ণ নির্দেশিত পথে না চলে রাক্ষস বংশের প্রতি সহানুভতি সপন্ন হয়েছেন। রামায়ণে বর্ণিত অধার্মিক, অত্যাচারী ও পাপী রাবণকে একজন দেশপ্রেমিক, বীর যোদ্ধা ও বিশাল শক্তির আধাররূপে চিত্রিত করে মধুসূদন ভারতবাসীর চিরাচরিত বিশ্বাসের মূলে আঘাত হেনে প্রকৃত সত্য সন্ধান ও দেশপ্রেমের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এ কাব্যে তিনি রাবন ও তার পুত্র মেঘনাদকে খলনায়ক হিসেবে দেখার রামায়নের চিরন্তন রীতি ভেঙ্গে দিয়ে মেঘনাদকে নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর মাধ্যমে তিনি নব মানবতাবোধের এক অসাধারণ আখ্যান রচনা করেন। রাবণের বিধবা ভগিনী রামকে পতিত্বে বরণ করার বাসনা প্রকাশ করলে তিনি প্রত্যাখ্যাত হন এবং লক্ষণ রাবণের বিধবা ভগিনীর অপমান করে তাঁর নাসিকা ছেঁদন করেন। বোনের এই দুর্গতি দেখে রাবণ অস্থির হয়ে ওঠেন এবং সীতাকে কৌশলে অপহরণ করে অশোকবনে বন্দী করে রাখেন। এরপর সীতাকে উদ্ধারের জন্য রাম - লক্ষণ লঙ্কার রাজা রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং যুদ্ধে জয়ী হয়ে সীতাকে উদ্ধার করেন।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গের নাম অভিষেক। এই সর্গের সূচনায় কবি বাগদেবী সরস্বতী ও দেবী কল্পনার আবাহন করেছেন। কাব্যের শুরু হয়েছে বীণাপাণির প্রতি বন্দনার মধ্য দিয়ে। যেখানে দেবীর প্রতি তাঁর দৃঢ় অঙ্গীকার – গাইব, মা বীররসে ভাসি /

মহাগীত; উরি, দাসে দেহ পদছায়া। তুমিই আইস,দেবী, তুমি মধুকরী/ কল্পনা ! বীররসে মহাগীত গাইবার যে ব্রত মধুসূদন গ্রহণ করেছিলেন, দেবীর চরণে যে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন, শেষপর্যন্ত তিনি তা রাখতে পারেননি। সীতাকে উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্র লঙ্কা আক্রমণ করলে রাবণ পুত্র বীরবাহু যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। দূতমুখে রাজপুত্র বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ শুনে রাবণ শোকার্ত,ত হলেন এবং দূতের মুখে পুত্রের বীরত্বের কাহিনী শুনে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা দেখতে রাবণ স্বয়ং প্রাসাদ শিখরে আরোহণ করলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি নিহত পুত্রের জন্য বিলাপ করতে লাগলেন। পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুতে রাবণের হাহাকার এভাবে প্রকাশ পেয়েছে- কুসুমদাম-সজ্জিত দীপাবলী-তেজে/ উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সমরে আছিল/ এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে/ শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি/ নিরব রবার বীণা, মূরজ মূরলী;/ তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?

রাবন চরিত্রের এই আকুলতা, নিজের ভেতরে নিজে সান্তনা খুঁজে ফেরার এই ছবির মধ্য দিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে পিতার হৃদয়ের যে বিলাপ ধ্বনি তৈরি করেছেন তা আজ দেড়শ বছর পেরিয়ে এসেও শাশ্বত, অমলিন। বীরবাহু মাতার হাহাকারে রাজসভা শোকবিহ্বল। লঙ্কা টলে উঠেছে, সাগর গর্জে উঠেছে। প্রিয় ভ্রাতা বীরবাহুর নিদারুণ অকাল প্রয়াণের দুঃখ সংবাদ শ্রবণের মধ্য দিয়ে প্রমোদ উদ্যান থেকে যুদ্ধংদেহী মেঘনাদ রাজসভায় ফিরে এসেছেন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত লঙ্কার করুণ অবস্থা শুনে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন । দেশ ও জাতির চরম বিপদের দিনে বীর মেঘনাদ আমোদ প্রমোদে মগ্ন থাকায় নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকেন বারংবার –

হা ধিক মোরে ! বৈরিদল বেড়ে

স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে?

তিনি তো বাসব বিজয়ী ,সামান্য নর রামলক্ষণকে কিসের ভয় !,প্রবল আত্ববিশ্বাসে তিনি স্ত্রী প্রমীলাকে আশ্বস্ত করে বলেন – ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া / কল্যাণী, তিনি তো শুধু আদর্শ স্বামী নন, তিনি আদর্শ পুত্রও বটে । পিতার চরম দুর্দিনে রামচন্দ্রকে সমূলে বিনাশ করবার জন্য প্রিয় পিতার কাছে যুদ্ধযাত্রার অনুমতি দিতে আহবান

করেন। লঙ্কায় প্রবেশ করে সংযতভাবে তিনি সেনাপতির দায়িত্ব নিয়ে যোগ্য সন্তানের মত পিতাকে চিন্তামুক্ত করেছেন। এই দায়িত্ব নেয়ার মধ্যেই নিজ শক্তিতে আস্থা, পিতার প্রতি,মাতৃভূমির প্রতি ,নিজ জাতির প্রতি মমত্ববোধ লক্ষনীয়। অসহায় পিতাকে সাহস জাগাতে বীর ইন্দ্রজিত উচ্চারণ করেন – থাকিতে দাস যদি যাও রণে/ তুমি, এ কলঙ্ক পিতঃ ঘুচিবে জগতে ....

রাবণের আতঙ্ক ও উত্তেজনার ভেতরেও এক ধরনের হতাশা, নৈরাশ্যবোধ কাজ করেছে। পুত্র মেঘনাদকে যুদ্ধে পাঠাতে শঙ্কিত রাবণের উচ্চারণ - রাক্ষস-কুল-শেখর তুমি বৎস; তুমি/ রাক্ষস-কুল-ভরসা। কে কবে শুনেছ, পুত্র ভাসে শিলা জলে,/ কে কবে শুনেছে, লোকে মরি পুনঃ বাঁচে।

আশঙ্কা, আতঙ্কের মধ্যেই রামচন্দ্রের দৈবশক্তির ষড়যন্ত্রকে বারবার মোকাবেলা করতে হয়েছে রাবণকে। নিজ শক্তিতে বলিয়ান রাজা রাবণ বিধির বিধানের প্রতি শঙ্কিত হয়েছেন বারম্বার । দৈবশক্তির চেয়ে ব্যক্তিশক্তি অনেক বড়, এই দৃষ্টিভঙ্গী মধুসূদনই বাংলা কাব্যে প্রথম প্রয়োগ করেন। রামের হাতে রাবণের পরাজয়ে প্রকৃতপক্ষে দৈবশক্তির বিজয় ঘটেছে। কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের নাম অস্ত্রলাভ। তৃতীয় সর্গের নাম সমাগম। চতুর্থ সর্গের নাম অশোকবন। পঞ্চম সর্গের উদ্যোগ। ষষ্ঠ সর্গের নাম বধো। সপ্তম সর্গের নাম শক্তি নির্ভেদ। অষ্টম সর্গের নাম প্রেতপুরী। নবম সর্গের নাম সংক্রিয়া। কবি রামায়ণকে তিনি তাঁর মানবতার আলোকে বিধৌত করে যে মহাকাব্য রচনা করেছেন এবং এ কাব্যে জীবনের যে জয়গান করেছেন তা বীররসের নয়,কারুণ্যের। তাঁর সৃজনশীল কাব্য সৃষ্টি আর ক্ষুরধার প্রতিভার অনবদ্য রসায়নে রচিত এ কাব্য মহাকাব্যের বীররস ধারণ করেও শেষপর্যন্ত এক করুণ ও বিয়োগান্তক বিষাদসিন্ধুতে পরিণত হয়েছে।

মেঘনাদবধ কাব্য শুরু হয়েছে হাহাকার দিয়ে এবং শেষ হয়েছে হাহাকার, দিগন্তবিস্তারী কান্নার মধ্য

দিয়ে। বিষাদেই শুরু, বিষাদেই শেষ। কাব্যের পরিণতিতে করুণ আর্তিতে ভরা শব্দাবলী এভাবে প্রকাশ পেয়েছে করি সিন্ধুনীরে রক্ষোদল এবে/ ফিরিলা লঙ্কার পানে,

আদ্র অশ্রুনীরে।/ বিসর্জ্জিত প্রতিমা যেন দশমী দিবসে!/ সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইষ্ট দেবীর পূজোয় মেঘনাদকে দৈবশক্তির বলে হত্যা করতে প্রস্তুত লক্ষণ। নিরস্ত্র মেঘনাদ যুদ্ধের প্রস্তাব দিলে ও তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তারা মেঘনাদকে হত্যা করবেই। মেঘনাদের ছুঁড়ে দেয়া পুজোর কসির আঘাতে ধরাশায়ী হয়েছে লক্ষণ। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে ও শত্রুর সম্মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বীর মেঘনাদ। মায়াদেবীর সহায়তায় লক্ষণ পুনঃজীবিত হয়েছে এবং সে হত্যা করেছে নিরস্ত্র মেঘনাদকে। মেঘনাদের মৃত্যুতে শত্রু শিবিরে জয়ধবনি উঠেছে, কান্নায় ভারী হয়েছে লঙ্কার আকাশ বাতাস। কবিতার চরণে বিলাপরত রাবণের উক্তি-

ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার, সম্মুখে
মহাযাত্রাকেমনে বুঝিব-বিধি কিন্তু !
তাঁর লীলা ? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে!
ছিল আশা, রক্ষঃকুল রাজসিংহাসনে-
জুড়াইব আঁখি,বৎস, দেখিয়া তোমারে

রাবণ তাঁর দুই পুত্র বীরবাহু ও মেঘনাদকে হারিয়েও প্রবল প্রতাপে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন যুদ্ধক্ষেত্রে।

কিন্তু বিধি হয়েছে বাম। বীরত্বের পরাজয় ঘটেছে বিশ্বাসঘাতকতার ফাঁদে, কাপুরুষোচিত শক্তির ফাঁদে। পরাধীন ভারতের কবি যে পৌরুষের পরাজয় প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর সময়ে, তারই প্রতিফলন ঘটেছে মেঘনাদবধ কাব্যে।

মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনীবিন্যাসের কৌশল, ভাষাভঙ্গি, চিত্রকল্পনা, পৌরুষ ও পেলবতার মিশ্রণজাত চরিত্রচিত্রণ। রামায়ণের রামচন্দ্র হিন্দু পরমারাধ্য দেবতা, তাঁকে হেয় করে রাবণকে গৌরব দেওয়ায় পাঠকের বিশ্বাসের চিরায়ত স্তরটিতে আঘাত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে নানারূপ বিতর্ক চলে আসছে। কবি বাল্মীকি যতটুকু রামায়ণের- নিয়েছেন, উপাদান রূপেই গ্রহণ করে বদল করে নিজের করে নিয়েছেন। ফলে একটি মৌলিক কাব্য রচিত হয়েছে, যা স্বাদে এবং জীবনজিজ্ঞাসায় একেবারেই মৌলিক।

মেঘনাদবধ কাব্যের সবকিছুই এত অভিনব যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো পন্ডিতও প্রথমে এর রস গ্রহণ করতে সমর্থ হননি। এমনকি দুই দশক পরে তরুণ রবীন্দ্রনাথও এর প্রশংসা করতে পারেননি, বরং উল্টো নিন্দাই করেছেন। মাইকেল চর্চায় ক্লিনটন বি সিলি একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের যে উৎকৃষ্ট অনুবাদ করেন, তাতে তিনি এই সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন এবং প্রকাশ করেছেন মাইকেলের সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে মূল্যবান অনেকগুলো প্রবন্ধ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর অমর সৃষ্টি মহাকাব্য "মেঘনাদবধ" কাব্যে মানবতাবাদের যে চেতনায় নিজেকে সমর্পণ করেছেন তা লঙ্কা অধিপতি রাবণ চরিত্রে প্রকাশ করেছেন পরম ঐকান্তিকতায়। শিল্পবোধের আলোকে ভয়ংকর রাক্ষস রাবণকে মানুষের কাছে ,সমাজের মুখোমুখি তিনি মানবিক দৃষ্টিতে দাঁড় করিয়েছেন। পুত্র হারানো যে কতোটা কষ্টের ও শোকের এবং একজন পিতার বিলাপ কতো বেশি এই কাব্যে তা মানবিকভাবে উঠে এসেছে। কবি মধুসূদনের সমগ্র কাব্যশিল্পে মেঘনাদবধ কাব্য অলংকারের সৌন্দর্যে, ভাষার মাধুর্যে, অজস্র শব্দ ব্যবহারে এবং ছন্দের অভিনবত্ব প্রয়োগের মাধ্যমে মহাকাব্যের বিশালতায় অমূল্য স্মারক নির্মাণ করেছে। কালপ্রবাহে কবির এ অনিন্দ্য সৃষ্টি কবিকে চিরঞ্জীব অমর অক্ষয় অপরাজেয় করে রেখেছে। তাঁর মহান সৃষ্টি মেঘনাদবধ মহাকাব্যটির মাধ্যমে তিনি অপরিমেয় প্রতিভার স্ফূরণে বাংলা সাহিত্যে এক স্বতন্ত্রভাব প্রকাশ করেছিলেন। লেখনীর প্রাজ্ঞতায় এবং সুনিপুণ কারুকার্যে তিনি বাংলা ভাষাকে দীপ্তিময় করেছিলেন। আধুনিকতার উজ্জ্বল উত্তরীয়ে বাংলা সাহিত্যের ক্যানভাস সাজিয়েছেন নান্দনিক কাব্যকলায়। আজো আমাদের মুগ্ধতায় ভরিয়ে দেয় তাঁর অনবদ্য সৃজনশৈলীতে সমৃদ্ধ রচনা সম্ভার। বাংলাসাহিত্যে—আধুনিক যুগে প্রবেশের আগে মূলত দেবদেবীর জয়গান নির্ভর ছিল। বিশেষত পুরো মধ্যযুগের সাহিত্য ছিল দেবদেবী নির্ভর।তাঁর পর মাইকেল নিয়ে আসেন নতুনত্ব। এই নতুনত্ব সব দিক থেকেই। কারণ এটিই আমাদের প্রথম মহাকাব্য। এখানে নতুন ছন্দের—অমিত্রাক্ষরের সার্থক ব্যবহার দেখানো হল। যদিও তিনি তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেছিলেন। কাব্য রচনার কৌশলের ক্ষেত্রে যেমন

মন্তব্য

মাইকেল মধুসূদন দত্ত এখানে স্বাতন্ত্র্য নির্মাণ করলেন, তেমনি ভাবের ক্ষেত্রেও নিয়ে এলেন স্বাতন্ত্র্য। তিনি এখানে পুরো বিদ্রোহীর ভূমিকাই পালন করেন। কারণ মূল রামায়নে রাম ও লক্ষণ দেবতা। আর রাবণ রাক্ষসরাজ। বাল্মীকির রামায়ণে রাবন কে দেখানো হয়েছে অত্যাচারী স্ত্রী হননকারী রূপে। রামায়ণে তাই স্বাভাবিকভাবেই রাবনের প্রতি মানুষের ঘৃণা ও বিরক্তি প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু রামায়ণ থেকে কাহিনী সংগ্রহ করলেও মাইকেল মধুসূদন দত্ত মূলের প্রতি সমর্পিত থাকেননি। তিনি তার 'মেঘনাদ বধ কাব্যে' রাবণ চরিত্রকেই বড় করে দেখিয়েছেন।

এখানে রাম-লক্ষণই বরং অপরাধী; কারণ তারা রাবণের রাজ্য আক্রমণ করেছে। রাবণ তার মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য সর্বস্ব ত্যাগী। প্রজাদের যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করছে। নিজের সন্তানদের যুদ্ধের ময়দানে পাঠাচ্ছেন। একে একে প্রিয় সন্তানদের যুদ্ধের মাঠে হারানোর বেদনায় অসহায় হয়ে উঠছে। এভাবে পুরো কাব্যে মুধুসূদন দত্ত রাবণের চরিত্রকে রাক্ষস থেকে মানুষে পরিণত করেছেন। তার অঙ্কিত রাবন হয়ে উঠছে প্রজাবৎসল এক স্নেহময় পিতা; দেশপ্রেমিক রাজা। যে নিজের মাতৃভূতি রক্ষার জন্য সর্বস্ব হারাতেও প্রস্তুত। সবকিছু ছাপিয়ে রাবণের কাছে বড় হয়ে উঠেছে জন্মভূমি রক্ষা। তাই প্রিয় পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুতে যখন রাবনের স্ত্রী শোকাহত, রাবন নিজেও পুত্র হারানোর বেদনায় শোকাকূল তখনো সে পুত্রের প্রাণ বিসর্জনকে প্রশংসা করে বলছে— 'জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে? যে ডরে, সে মূঢ়; শত ধিক তারে।' রাবনের এই উক্তি থেকেই বোঝা যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ রাক্ষস রাবনকে নতুন উচ্চতায় তুলে ধরেছিলেন। ঠিক একইভাবে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার কাব্যে রাবনের পিতৃহৃদয়ের হাহাকার -অসহায়তা তুলে ধরছেন। রাবনের মতো সন্তান প্রিয় পিতার চরিত্র মাইকেল মধুসূদন দত্তের আগে আর কেউ বাংলা সাহিত্যে তুলে ধরেননি। পুত্রের মৃত্যুতে পিতৃহৃদয়ের যে হাহাকার রাবনের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে তা চিরকালীন সাহিত্যের ইতিহাসেই বিরল।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিসর্জন নাটকে জয়সিংহের মৃত্যুতে পিতা রঘুপতির হাহাকার অথবা সোহরাব-রোস্তমে পুত্র সোহরাবের মৃত্যুতে পিতা রোস্তমের হাহাকার। তবে রঘুপতি অথবা রোস্তমের পিতৃ হৃদয়ের কান্নার সাথে রাবনের পিতৃহৃদয়ের কান্নার তুলনা চলে না। রাবন একজন চিরন্তন পিতৃমূর্তি। যিনি পুত্রশোকের ভেতরেও নিজের কর্তব্যকর্মে স্থির। যিনি নিহত পুত্রের জন্য শোক করছেন—আবার একইসঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এক পুত্রকে হারিয়েছেন কিন্তু আরেক পুত্রকে মাতৃভূমি রক্ষার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে উৎসাহ দিচ্ছেন।

রাবন চরিত্রের এই আকুলতা, নিজের ভেতরে নিজে সান্ত্বনা খুঁজে ফেরার এই ছবির মধ্য দিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে পিতার হৃদয়ের যে বিলাপ ধ্বনি তৈরি করেছেন তা আজ—দেড়শ বছর পেরিয়ে এসেও শাশ্বত, অমলিন। কারণ রাজসভায় বসে রাবন যখন দূতের মুখে পুত্র বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ শুনলেন তখন তিনি নিজে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না কেমন করে ফুলদল দিয়ে বিধাতা শিমুল গাছ কেটে ফেললেন। রাবনের আকুলতা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন তিনি বলেন:

হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়মণি!
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায় রে, কেমনে
সহি এ যাতনা আমি?

এই কাব্যজুড়ে পুত্র হারানোর শোকে রাবনের এই হাহাকার, বিলাপের জন্য সমালোচকরা মেঘনাদবধ কাব্যে বীররসের অনুপস্থিতির কথাও বলেছেন। কেউ কেউ এই মহাকাব্যকে করুণ রসের মহাকাব্য বলেও চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। তবে যেভাবে বিচার করি না কেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার মেঘনাদবধ কাব্যে রাবন চরিত্রের মধ্যে চিরকালীন পিতার যে ছবি এঁকেছেন অন্য আর আর কারণের মধ্যে এই একটি কারণে আরও বহুকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

মন্তব্য

মহাকাব্যের যে সব বৈশিষ্ট্য থাকে তার মধ্যে ঐতিহ্য চেতনা একটি প্রধান অনুষঙ্গ। আমরা অপার বিস্ময়ে লক্ষ্য করি মাইকেল তার এই মহাকাব্যে স্বদেশী এবং বিদেশি বিশেষ করে ইউরোপীয় ঐতিহ্যকে-মূর্ত করেছেন।ব্যক্তি মধুসূদনের জীবনযাপনে যে স্ববিরোধিতা সুস্পষ্ট। কাব্য সাধনাতেও তিনি তার থেকে বিচ্যুত নন। বহুকাল ধরে বাংলার কবিগণ কাব্যের প্রারম্ভে দেব-দেবীর বন্দনা করে আসছিলেন। মধুসূদন এই ধারা ভঙ্গ করলেন-কবিবন্দনার-মাধ্যমে।বাল্মীকিকেই কবি মধুসূদন আদর্শ বলে গ্রহণ করতে চেয়েছেন এবং মেঘনাদবধের কাহিনীটি নিয়েছেন বাল্মীকির রামায়ন থেকে। তবে কাহিনীকে তিনি সাজিয়েছেন নিজের মতো করে। শুধু কাহিনীর কাঠামোটি নিয়েছেন মূল রামায়ন থেকে। কাহিনীর তাৎপর্য নির্ণয়ে ইউরোপীয় প্রভাব প্রবল। এছাড়া কাব্যের গঠন কৌশলে, দেব-দেবী পরিকল্পনার পবিত্র নির্মাণে, ছন্দ প্রয়োগে, অলংকরণে মধুসূদন;ইউরোপীয়-প্রভাবে-প্রভাবিত-হয়েছেন।

মানবতার জয় ঘোষণায় কবি রাবন এবং মেঘনাদকে উজ্জ্বল করে এঁকেছেন। রাম-লক্ষনকে হেয়, তুচ্ছ করে উপস্থাপন করেছেন -অথচ ভারতীয় ঐতিহ্যে রাম দেবতা হিসেবে পূজিত, রাবন-রাক্ষস,বলে-ঘৃণিত।

মেঘনাদ বধ কাব্য পাঠ করলে মনে হয় হোমারের ‘ইলিয়াড’ কাব্যের দেব-দেবীই যেন এ কাব্যে বিচরণ করছেন-ভারতীয়-দেব-দেবী,নন।

বিশ্বনাথ মহাকাব্যের দেহ নির্মাণে অঙ্গসৌষ্ঠব গঠনে যে রচনা রীতির নির্দেশনা দিয়েছেন মধুসূদন তা অনুসরণ করেননি। তিনি পাশ্চাত্য মহাকাব্য, বিশেষ করে হোমারের ‘ইলিয়াড’কে আদর্শ হিসেবে,গ্রহণ-করেছেন।

মহাকাব্যের ছন্দ ব্যবহারে মধুসূদনের পথ প্রদর্শক মহাকবি মিল্টন। মিল্টনের ছন্দের অনুসরণে বাংলায় তিনি সম্পূর্ণ নতুন এক ছন্দ সৃষ্টি করেছেন -যা অমিত্রাক্ষর ছন্দ নামে সুপরিচিত এবং এ ছন্দেই তিনি মেঘনাদ-বধ,কাব্য-রচনা,করে-এক-বিরল-দৃষ্টান্তস্থাপন,করেছেন।

তাছাড়া উপমা, অলংকার প্রয়োগে মধুসূদন হোমারকে অনুসরণ করে মানুষের শৌর্য-বীর্য প্রকাশে হিংস্র পশু বাঘ, সিংহ, সাপ এবং প্রলয়ঙ্কারী শক্তির উপমায় সমুদ্র, অগ্নি,

প্রবল ঝঞ্জাময় বায়ু প্রভৃতি,ব্যবহার-করেছেন।

বিশ্ব সাহিত্যের অমর মহাকাব্যে 'ইলিয়াডে'র সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের অমর মহাকাব্য মেঘনাদ বধ কাব্যের অপূর্ব সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। এ ব্যাপারে মধুসূদনের সৃষ্টিনৈপুণ্য মুগ্ধ হবার মতো। দুটি মহাকাব্যের পটভূমি দুটি বিখ্যাত নগরী 'ইলিয়াড ট্রয় এবং মেঘনাদ বধ কাব্য লঙ্কাপুরীর পটভূমিতে রচিত। ট্রয় নগরী সমুদ্র তীরে অবস্থিত, ৯ বছর ধরে শত্রুর রণতরী একে ঘিরে রেখেছে -কাব্যের সমাপ্তিতেও সমুদ্র। ট্রয়ের রাজা প্রায়াম তার শ্রেষ্ঠ-পুত্র হেকটরকে সমুদ্রতীরের শ্মশানে ভস্মীভূত করে জীবনে কঠিন নিঃসঙ্গতা উপলব্ধি করেছে। ঠিক এরকমভাবেই মধুসূদন মেঘনাদ বধ কাব্য উপস্থাপন করেছেন। এ কাব্যের আরম্ভে সমুদ্র -সমাপ্তিতেও সমুদ্র। প্রথমেই লঙ্কাধিপতি রাবন অবলোকন করেছে যে, সমুদ্র শত্রুর দ্বারা শৃঙ্খলিত। আবার সমুদ্রতীরের শ্মশানে রাবন প্রিয় পুত্র মেঘনাদ এবং পুত্রবধূ প্রমীলাকে ভস্মীভূত করে সমুদ্রজলে ভাসিয়ে দিয়ে জীবনের,চরম-শূন্যতাকে,প্রত্যক্ষ-করেছে।

ইলিয়াডের মতোই মেঘনাদ বধ কাব্যের মূলে রয়েছে পরস্ত্রী অপহরণজনিত অপরাধ। গ্রিক পুরানে ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিস স্পার্টার অধিপতি মোনলাসের প্রতিতী, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী হেলেনের অপহরণের যে কিংবদন্তি প্রচলিত আছে ইলিয়াডের উৎস রূপ হোমার সেটিকেই বেছে নিয়েছেন।

আমরা লক্ষ্য করি দুটি কাব্যেই নগরীর ধ্বংসের আভাস দেয়া হয়েছে। কিন্তু ধ্বংসের চরম চিত্র বর্ণিত হয়নি। দুটি কাব্যে মুগ্ধ ও ধ্বংসের মাধ্যমে মানব জীবনের অপার মহিমা কীর্তিত হয়েছে। ইলিয়াডে হেকটরের সবদাহেই কাব্যের সমাপ্তি। মেঘনাদের অন্ত্যাষ্টিক্রিয়াতেই মেঘনাদ বধ কাব্যের পরিসমাপ্তি।

দুটি কাব্য পাশাপাশি রেখে পড়লে মনে হবে মধুসূদন যেন পাশ্চাত্যের কাহিনী এবং চরিত্রসমূহকে ভারতীয়করণ-করেছেন।

মধুসূদনের মানসের যে দোদুল্যমানতা, যার কথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে, তা এ কাব্যেও লক্ষ্য করা যায় -কেবলমাত্র ইউরোপীয় ঐতিহ্য নয়, পাশ্চাত্য ছাড়াও প্রাচ্যের ঐতিহ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন কবি মধুসূদন। কারণ হিন্দু পুরাণের প্রতি মধুসূদনের

দৌর্বল্য অপরিসীম। তাই বিশ্বের ভান্ডার হতে উপাদান আহরণ করলেও ভারতীয় পটভূমিতে এ কাব্যের উপস্থাপনা। ভারতীয় জীবন ও কাব্য অবলম্বনে মধুসূদন এ কাব্য রূপায়ন করেছেন। প্রায় আড়াই বাজার বছর ধরে ভারতীয় সাহিত্যের যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে রামায়ন, মহাভারত অন্যান্য পুরাণ তা অবলম্বন করেই তিনি এ কাব্যের রূপদান করেছেন। যদিও তার কল্পনা পাশ্চাত্য ভাবধারায়;আচ্ছন্ন।

লঙ্কাপুরীর রাজসভার বর্ণনায় মহাভারত ও অন্যান্য পুরান থেকে উপমা চয়ন করেছেন। যেমন করে নাগরাজ বাসুকি অসংখ্য উদ্ধত মনিময় ফনায় বিশাল পৃথিবীকে ধারণ করে আছে -তেমনি রাজসভার বিশাল স্বর্ণময় ছাদ ধারণ করে আছে রত্নখচিত স্তম্ভ শ্রেণি। কামদেবের মতো রূপবান রাবনের ছত্রধর। সভাগৃহের দ্বারে বিশাল দেহধারীগণ শূল হস্তে দাঁড়িয়ে আছে -যেমনভাবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মহাদেব পান্ডব দেব শিবির রক্ষার ভার গ্রহণ করে। বৃন্দাবন যেমন কৃষ্ণের বংশী ধ্বনি দ্বারা মুখরিত ছিল, রাবনের রাজসভাও নানা বাদ্যযন্ত্রের মধুর তানে পূর্ণ। সৌন্দর্য এবং সমৃদ্ধিতে রাবনের রাজসভা পান্ডবদের কারুকাজ খচিত সভাগৃহ-থেকেও,মনোহর।

বীরবাহুর মৃত্যুতে বিলাপরত রাবনের তুলনা করা হয়েছে হস্তিনাপুরী অধিরাজ ধৃতরাষ্ট্রের সাথে। কাশীরামে ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস অনুসরণেই মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যে প্রয়োগ করেছেন ‘লঙ্কার পঙ্কজ রবি’। মেঘনাদকে তুলনা করা হয়েছে পরশুরামের সঙ্গে -যে পরশুরাম যুদ্ধে উচ্চচূড়া বিশিষ্ট পর্বতের-ন্যায়-অটল। মেঘনাদের মৃত্যুর কারণ যজ্ঞাগারে অতর্কিত লক্ষণকে দেখে ভয় পাওয়া। রাম ও সীতা চরিত্র পরিকল্পনায় বাল্মিকী অপেক্ষা কবি কৃত্তিবাসকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। বাল্মিকীর সীতা এক তেজস্বিনী নারী -কিন্তু এই বীর্যবতী নারীই কৃত্তিবাসের হৃদয়ের ছোঁয়ায় হয়ে গেছে বাঙালি কুলবধূ। অশ্রুসজল এক নারী। সীতার এই দুঃখ-ও-বেদনাই;মধুসূদনের-সৃষ্টিতে,এক-অপরিসীম-মর্যাদা-লাভ-করেছে।বাঙালি-জীবনের,লৌকিক সংস্কারও মধুসূদনের দৃষ্টি এড়ায়নি। সিঁথিতে সিঁদুর হিন্দু সধবা নারীর চিহ্ন। সীতা সধবা অথচ সিঁথিতে সিঁধুর নেই -তাই সরমা যিনি ঘরের শত্রু বিভীষণের স্ত্রী তার মাধ্যমে সীতার সিঁথিতে সিঁদুর-পরিয়ে-দিয়েছেন। স্বামীর

বিপদাশঙ্কায় ‘প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল সঘনে।’ ‘বামেতর অর্থ ডান। ডান দিকের চক্ষু নাচলে বিপদ হয় -এই বিশ্বাস বাঙালি জীবনের অন্তর্গত, মধুসূদন একে কাব্যে রূপ দিয়েছেন।

ভারতীয় এবং ইউরোপীয় দুই ঐতিহ্যের সঙ্গেই মধুসূদন পরিচিত ছিলেন, সে কারণেই তার কাব্যে দুই ঐতিহ্যেই সমৃদ্ধ। তবু বাঙালি জীবনে যে অশ্রু কাতরতা, যে বেদনা বিহ্বলতা তা থেকে মধুসূদন মুক্ত হতে পারেননি। বলেছিলেন গাইব না, বীর রসে ভাসি মহাগীত -কিন্তু মেঘনাদ বধ কাব্যের সূচনাতে করুণ রস -সমাপ্তিতেও করুণ রস।’

কিন্তু তবু যেন একটি সংশয় থেকে যায়। মহাকাব্যের বস্তুলীনতা বা নিরপেক্ষতা মেঘনাদবধ কাব্যে দুর্লভ। মাঝে মাঝে গীতিকবিদের মত আত্মগত ভাবেই যেন তিনি মহাকাব্যের নানা মুহূর্তে চরিত্রের নানা ক্ষনে নিজেকে অবারিত করেছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের আড়ালে যেন কবি নিজ কথা বলেছেন। কবি প্রারম্ভে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ’’গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত ’’তা এক্ষেত্রে অনেকখানি যেন ঠিক হয়েছে।কেবল গীত নয় ,মেঘনাদবধ মহাগীতি। কবির মহৎ হৃদয়ের মহোত্তম প্রকাশ।

২.৪ চরিত্র আলোচনা

২.৪.১ নারী চরিত্র

প্রকৃতি, এই শব্দটি নাম বাচক বিশেষ্য। এই প্রকৃতি শব্দটি একাধিক অনুপূরক ও সম্পূরক শব্দের সংমিশ্রীত রূপ। প্রকৃতি শব্দটি মূলতঃস্ত্রীলিঙ্গবাচক। এই প্রকৃতি, আদিম মানব সমাজ থেকেই, পুরুষেরপ্রথম একান্ত নিজস্ব সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। পুরুষের কাছে কখনো সে ফসলের ক্ষেত, কখনো বা উপভোগের সামগ্রী।

এই নারী স্থান কাল পাত্র ভেদে নানান নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

সমাজে গার্হস্থ জীবনে প্রকৃতি, খুকি, কিশরী কুমারী, কন্যা, দুহিতা,যুবতীস্ত্রী ও জননী।

বিশ্ব সংসারে ,ভূমা, পৃথ্বি, জগদ্ধাত্রী, বসুমতি,প্রকৃতি ও অম্বা। আবার সাহিত্যের জগতে সুতপা, সুপ্রিয়া, সুকেশিনী, সরলা, সুমতি, রূপশ্রী, হিমাদ্রী, মৃণালিনী, প্রভৃতি নামে।

মন্তব্য

পক্ষান্তরে অধ্যাত্ম, ভাবনা, চিন্তা, চেতনা, উপাসনা, পূজা, পার্বন, উৎসবে – লক্ষ্মী, দূর্গা, কালী, নারায়ণী, জগদ্ধাত্রী, শিবানী, করাল বদনি, মুক্ত কেশী, সুরেশ্বরী, কামাখ্যা, ছিন্নমস্তা, ছিন্নমুন্ডা, চামুন্ডে, বগলা, ভৈরবী, কাত্তায়িনী এসব নামে।

আবার ভোগবিলাসের ক্ষেত্রে সেই হচ্ছে বিলাসিনী, শয্যাসঙ্গিনী, সহধর্মিনী, নিতম্বীনি, স্তনয়া, সোহগীনি-অন্নপূর্ণা এমন সব নামে চিহ্নিত হয়েছে। আবার তিরস্কারের ক্ষেত্রে- মুখরা, মাগি, বেশ্যা, নটি,বার-বাজারি, খানকি, ডাইনী, পেত্নী, পিশাচী, পোড়ামুখী এমন সব নামে। আসলে সকল শব্দার্থের মূলে যাকে নির্দেশ করে, তা হোল ঐস্ত্রীলিঙ্গোবাচক প্রকৃতি শ ব্দটির কথা।মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা কাব্য ও ভাষার নতুন মাইলফলক। তাঁর"মেঘনাব দধ" কাব্য (প্রকাশ ১৮৬১)। "মেঘনাবধ" কাব্যই বাংলা সাহিত্যের নব্যস্রোতধারার একমাত্র সার্থক আখ্যান কাব্য। এই কাব্যে একদিকেযেমন মহাকাব্যের গাম্ভীর্য প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে কাব্যদেহেমহাকাব্য বিরোধী গীতিকবিতার সুরমূর্চ্ছনা আজও বিদ্যমান।

মহাকবি মধুসূদন একেবারেই প্রভাব মুক্ত কবি একথা বলা যাবেনা,কারণ মেঘনাদবধে গ্রীক মহাকাব্যের প্রভাব আছে। একথা এই জন্যে,বলতে হচ্ছে যে, গ্রীকদের কাছে দেবতাও মা ধর্মের বিচারেই গ্রহণীয় ছিল।

আর গ্রীকরা এই সত্যের আলোকে মানুষকে বিচারকরেছে। মধুসূদনের গ্রীক দৃষ্টিভঙ্গির সরা সরি প্রকাশ ঘটেছে মেঘনাদবধের চরিত্র বা পাত্র-পাত্রী সৃষ্টির ক্ষেত্রে। যেমন- রাবণ, ইন্দ্রজিৎ, বিভীষণ, এসব চরিত্র যে কেবল নরমাংসভোগী রাক্ষস তনয়- একই সাথে রামলক্ষণ, এরাও দেবতার অন্তরগত নন, এদের সবার বড় পরিচয় হচ্ছে- এরাও মানুষ।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রকৃতি চরিত্রঃ প্রমীলা, সীতা, সরমা, চিত্রাঙ্গদা ও মন্দোদরী।

মধুসূদন তার মেঘনাদবধ কাব্যে প্রকৃতি চরিত্র নির্মানের ক্ষেত্রে বঙ্গরমনীর ভাব ও বৈশিষ্ট্য কে গ্রহণ করেছেন। বঙ্গবধূর সহজ সরল, সাবলীল আর কোমল মধুর জীবনবৃত্ত যেন তাঁর কাব্যিক মনকে

ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছিল, যার ফলে কেবল সীতা ও সরমাই নয়প্রমীলা থেকে শুরু করে লঙ্কার অন্যান্য পুরনারী ও একই আদর্শেপরিকল্পিত ও চিত্রিত হয়েছে কাব্যের দীর্ঘ বিরাট বি শাল ক্যানভাসে আর বঙ্গ রমনীর আদর্শেই এইসব প্রকৃতি চরিত্রকে অতুলনীয় রূপেসৃষ্টি করেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় যে, মেঘনাদবধ কাব্যে কবি হচ্ছেন কল্পনার চালক। স্বকল্পিত বাক-বিষয়বস্তুকে পরিপূর্ণ ভাবে রূপ দেওয়ার জন্যে

কবিকে সৃষ্টি করতে হয়েছে অমিত্রাক্ষর ছন্দের। আবার ভাবকল্পনারউপযোগী

ভাষাও তাঁকে গড়তে হয়েছে। ঠিক একইভাবে মানব চরিত্রেদের,গুণাবলী

হয়েছে সফল ও সার্থক। তিনি তাঁর মেঘনাবধকাব্যে যে মানব রসের সৌরভ ছড়িয়েছেন তা আজও বর্তমান।

সীতা –

কবি মোহিত লাল মজুমদার তাঁর "শ্রী মধুসূদন" গ্রন্থে ব্যাক্ত করেছেন"এই সুরের প্রতীমাকে (সীতা) অশোক কাননে বসাইয়া, নিজে সরমা;সাজিয়া, কবি ইহার

ললাটে সিদুঁর দিয়া পদধূলি লইয়াছেন।"

কারণসীতা চরিত্র নির্মাণে মধুসূদন বঙ্গ রমণীর ভাববৈশিষ্ট্যকে সম্পূর্ণ,সার্থক করে তুলেছে। কেননা কবি বাল্মীকির রামায়ণে চিত্রিত সীতা,মধুসূদনের হৃদমন্দিরে একান্ত শ্রদ্ধায় ধরা পড়েছেন। কবি সেইএকান্ত শ্রদ্ধায় নিজেকে নতজানু করেছেন। তাঁর লিখনীতে সীতা;বিচি ত্রীত হয়েছেন। সীতা

এই বাঙলার বাঙালির ঘরের লক্ষ্মী,করুণাময়ী। অন্যের দুঃখ বেদনায় তাঁর হৃদয় গলে যায়। কারণ তাঁর হরণ রাবণ আর সেই রাবণ পরিবারের পরিজনের দুঃখে তিনিওকাতরা। তার প্রমাণ, সরমা এসে যখন ইন্দ্রজিৎতের মৃত্যু সংবাদসীতাকে জানাল, সীতা

তখন প্রমীলার জন্যে করুণা প্রকাশ করে বলে-

"ভবতলে মূর্তিময়ী দয়া

সীতারূপে, পরদুঃখে কাতর সতত,

কহিলা-

মন্তব্য

"কুক্ষণে জনম মম সরমা রাক্ষসী

.....

.....

মরিলা বাসবজিৎ অভাগীর দোষে

মরিবে দানববালা অতুলা এভবে

সৌন্দর্য্য! বসন্তারম্ভে, হায়লো শুকাল

হেন ফুল!"

এই যে করুণা আর পরদুঃখকাতরা এ,দুটোর সম্মিলীত রূপই হচ্ছে,সীতা চরিত্রেরপ্রধান বৈ

শিষ্ট্য। সহিষ্ণুতা হচ্ছে সীতার স্বভাব

ধর্ম। কারণ সীতা তার পতির বিরহকে সকরুণভাবে সহ্যকরেছেন।

প্রমীলা -

রঙ্গরমণী একদিকে যেমন সহজ- সরলা-অবলা, কোমল স্নেহময়ী,

তেমনি সন্তান ও পরিবারের চরম দুঃসময়ে বিপদের মুহূর্তে দুষ্টেরসামনে ভয়াল ভীষণ মূর্তি

মান রূপে অবতীর্ণ হয়। সেই দিক থেকে কবি ,প্রমীলার চরিত্রে প্রকৃতির

স্বাধীন চিত্তবৃত্তিকে চিত্রায়িত ও রূপায়িতকরেছেন মধুসূদন। স্বভাব আর

সৌন্দর্য্যরে দিক থেকে প্রমীলা যতইকোমল হোক না কেন, প্রয়োজন বোধে সে বীরাঙ্গনা

মূর্তিতে প্রকাশ হওয়ার মত শক্তি ও সাহস রাখে তেমনটি তার সংলাপে ফুটে উঠেছে

"..... পর্বত গৃহছাড়ি

বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশ্যে

কার হেন সাধ্য সে যে রোধে তার গতি?

পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভূজবলে

দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি।"

এখানে প্রমীলার বীরাঙ্গনা মূর্তি প্রকাশ পেয়েছে। আবার প্রমীলা যখন বলে

"হায় নাথ.....

ভেবেছিনু যজ্ঞগৃহে যাব তব সাথে,

সাজাইব বীর সাজে তোময়! কি করি?

বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শ্বাশুড়ী।"

এই খানে এই উক্তির মাঝে যে করুণ রূপ ফুটে উঠেছে সেক্ষেত্রে,বঙ্গীয় প্রকৃতির স্বভাব বৈশিষ্ট্যের কথাবার-বার মনে করিয়ে দেয়।

চিত্রাঙ্গদা ও মন্দোদরি -

চিত্রাঙ্গদা ও মন্দোদরী দুটি চরিত্রই হচ্ছে মেঘনাদবধ কাব্যের বিশেষ,গুরুত্ববহ উল্লেখযোগ্য চরিত্র। সন্তানহারা চিত্রাঙ্গদা পুত্রশোকাহত-মর্মাহত।

সে তার পুত্র শোকের বেদনা তার স্বামী রাবণকেদায়ি করে যখন প্রকাশ করে, তখনই বোঝা যায় কেমন সেই বেদনারআভাস, যেমন তার কথায়-

"একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি

কৃপাময়; দীন আমি থুয়েছিনু তারে

রক্ষাহেতু তব কাছে রক্ষঃ কুলমণি,

তরুর কোটরে রাখে শবক যেমতি

পাখী! কহ কোথা রেখেছ তাহারে

লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?"

মাতৃত্ব ও পত্নীত্বের সংমিশ্রণে এমন এক মিশ্রণ যা মন্দোদরীর;চরিত্রকে করেছে ঐশ্বর্য্যমিত প্রদীপ্ত। পুত্র ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে তার;বেদনাহত হৃদয়ের শোক স্বামী রাবণের শোকের সাথে মিলে স্তম্ভিতহয়ে গেছে। সে কোনভাবেও কাউকে অভিযুক্ত করেনি। নিজেই,নিজের সমস্ত দুঃখ বেদনা নীরবে সহ্য করেছে কারণ সে যে- সর্বংসহা-প্রকৃতি-নারী।

পরিশেষে বলা যায় প্রথম পর্যায়ে আমরা প্রধান নারী চরিত্র হিসাবে পাই প্রমীলা ও সীতা। প্রমীলা তীব্র প্রতিবাদী আর সীতা বঙ্গ দেশীয় শাশ্বত নারী। কবির হাতে বাল্মিকীর সীতা বাঙালী রমনী হয়ে উঠেছেন। সীতা যে 'খনির তিমির গর্ভে সূর্যকান্ত মণি' অথবা 'অম্বুরাশি তলে বিম্বাধরা রমা'। তিনি অশোকবণে থাকুন আর যে স্থানেই থাকুন তিনি যে 'এয়ো', সিন্দুরহীন ললাট তার পক্ষে সাজে না, অনিন্দ্য সুন্দর ললাটে

প্রয়োজন একটি প্রশস্তোজ্জল সিন্দুর বিন্দু—সীতার এই পরিচয়ই এক মুহূর্তে পাঠকের অন্তরঙ্গতম হয়ে ওঠে।

প্রমীলা একটি পূর্ণাঙ্গ নারী চরিত্র। আদি, মধ্য ও অন্ত জীবনের এ তিনটি পর্যায় – প্রমীলা চরিত্রে প্রতিফলিত। প্রথম যুগের তরুণোচ্ছাস, মধ্য যুগের কর্তব্য কঠোরতা ও অন্ত যুগের করুণ বৈরাগ্য –

নবীন প্রমোচ্ছল প্রমোদ বিহার হতে একেবারে স্বামীর চিতায় আরোহণ পর্যন্ত একটি পরিপূর্ণ নারী জীবন, সতীত্বের আদর্শ পূজারিণী –সনাতন নারী চরিত্র প্রমীলার মধ্যে স্তরে স্তরে বিকশিত হয়েছে। প্রমীলার প্রথম সাক্ষাৎ পাই – পতি বিরহে কাতরা যুবতী হিসেবে। তার অবস্থা " অশ্রু আঁখি বিধু মুখী ভ্রমে ফুলবনে.....বিরহিনী, শূণ্যনীড়ে কপোতি... বিবলা।"

এই চিত্র রাধার অনুসরণে রচিত। এরপর তাকে পাওয়া যায় তার ভৈরবী মূর্তি। রমণীর এ মূর্তি আমরা ভারতীয় সাহিত্যে পাইনা কিন্তু বিদেশি সাহিত্যে এর অভাব নেই। এ অংশ চিত্রণে কবি বিদেশি কাব্যের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাকে উপাদাণ যুগিয়েছে ভার্জিলের ক্যাথিয়া, ট্যাসোর ক্লরিন্দা, হোমারের এথেনা এবং বায়রনের মেড অব সারা গোসা। ক্লরিন্দার সাথে প্রমীলার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সর্বশেষে নবম সর্গে প্রমীলার দৃশ্য "অবগাহি দেহ... প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরী প্রদেশে" — এই চিত্র একান্তভাবে ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে গৃহীত।

মেঘনাদ বধ কাব্যের গঠন ও রীতিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রভাবই পড়েছে। সর্গবদ্ধ মহাকাব্য রচনার প্রচেষ্টাকে প্রাচ্যরীতি বলা যায় ,এ বিষয়ে মধুসূদনের শ্রদ্ধা ছিলো না। তিনি নিজে বলেছেন, "I will not allow mydelf to be bownd by the diction of Mr.Viswanata of shahitya dorpon."

কিন্তু বিজ্ঞগনের মত অনুসারেই তিনি কাব্যে অষ্টাধিক সর্গ যোজনা করেন। প্রতি সর্গের শেষে সংস্কৃতে এর নাম করণ করেন। মেঘনাদবধ কাব্যে এর প্রভাব সুস্পষ্ট।

বিষয়বস্তুর বিরাটত্ব, চরিত্রের সমোন্নতি, ও ভাবের গাম্ভীর্য, বস্তুধর্মের প্রাচুর্য, বর্ণনার নাটকীয়তা এবং সমস্ত কিছুর বাহন স্বরূপ কাব্যকলার উৎকর্ষ প্রভৃতি লক্ষণের কথা

আমরা এরিস্টটলের সংজ্ঞা থেকে পেয়েছি। মেঘনাদবধ কাব্যেও এর উপস্থিতি অস্বীকার করা যায় না। বরং মেঘনাদবধ যদি মহাকাব্য হয় তবে শেষোক্ত অন্তরঙ্গ লক্ষণেই হয়েছে, বিশ্বনাথের সংজ্ঞানুসারে নয়।'

২.৪.২-পুরুষ চরিত্র

মধুসূদন দত্ত তাঁর অমর সৃষ্টি মহাকাব্য "মেঘনাদবধ" কাব্যে মানবতাবাদের যে চেতনায় নিজেকে সমর্পণ করেছেন তা রাবণ চরিত্রে প্রকাশ করেছেন পরম ঐকান্তিকতায়। শিল্পবোধের আলোকে ভয়ংকর রাক্ষস রাবণকে মানুষের কাছে, সমাজের মুখোমুখি তিনি মানবিক দৃষ্টিতে দাঁড় করিয়েছেন। পুত্র হারানো যে কতোটা কষ্টের ও শোকের এবং একজন পিতার বিলাপ কতো বেশি এই কাব্যে মানবিকভাবে উঠে এসেছে। কবি সমগ্র কাব্যশিল্পে মেঘনাদবধ কাব্য অলংকারের, ভাষার মাধুর্যে, অজস্র শব্দ ব্যবহারে এবং ছন্দের অভিনবত্ব প্রয়োগের মাধ্যমে মহাকাব্যের বিশালতায় অমূল্য স্মারক নির্মাণ করেছে।গ্রীক ট্র্যাজেডির ভক্ত পাঠক মাইকেল রাবণের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন দৈবাহত মানুষের তিলে তিলে পরাজয় !রামায়ণেও রাবণ সবংশে নিহত হন এবং তার পতনে পাঠক আনন্দবোধ করে। কারণ সে দেখে পাপী তার সমুচিত ফল ভোগ করছে। কিন্তু মাইকেলের রাবণকে এক কথায় পাপী বলার জো নেই। এ রাবণ কেবল রাজা নন, সুকৌশলী-শাসক। বাৎসল্যময় পিতা, স্নেহার্দ্র-ভ্রাতা, দৈব-বিনীত মর্তের মানুষ, নিষ্ঠাবান গৃহস্থ ও সর্বোপরি এক অসীম শক্তিশালী পুরুষ ! মধুসূদন রাবণকে কাঁদিয়েছেন, কিন্তু তা অনুতপ্ত পাপীর বিলাপ নয়, তা নিয়তি তাড়িত ভাগ্যাহত মানুষের ক্রন্দন। তার শক্তি ও পৌরুষের সীমা নাই, অনন্ত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তাকে দিন দিন হীনবল হতে হয়েছে, চোখের সামনে সাজানো বাগান শুকিয়ে যাচ্ছে। রাবণ বুঝতে পারছে ,এটা নিয়তির লীলা। এই অদৃশ্য বিধি বিধানকে সে গভীর দীর্ঘশ্বাসে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে। রাবণের এই ব্যর্থতাজণিত ক্ষোভ -তার এই নিদারুণ ট্র্যাজেডি; দৈব ও বহিঃশক্তির নিষ্ঠুর প্রতিকূলতায় ব্যক্তি পুরুষের শক্তির – অবমাননা মূলক চিরন্তন ট্র্যাজেডি, মধুসূদন সাক্ষাৎ ভাবে গ্রীক ট্র্যাজেডি থেকে, এ-

দেশে-আমদানি,করেছেন।

সাহিত্য সমালোক-পণ্ডিততের মতে, মধুসূদনের কাব্য রচনার আদর্শ হিসেবে তাঁর সামনে ছিলো হোমারের কবিকৃতি।

হোমারের আদর্শ অনুযায়ী 'মেঘনাদ' চরিত্রের সার্থক রূপায়ণের ব্রত নিয়েই তিনি কাব্য রচনায় উৎসাহিত হয়েছিলেন। আবার শুধু হোমারই নয়, 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে মিলটনেরও যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট'এ যেমন শয়তানের প্রতি প্রীতি ও আনুকল্য দেখা যায় তেমনি মেঘনাদে কবির সহানুভূতি রাক্ষসদের প্রতি। এ ছাড়াও 'মেঘনাদ বধ'কাব্যে ভার্জিল, দান্তে ও ট্যাসোর প্রভাবও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। কাহিনী বিন্যাসে চরিত্র সংস্থান বিষয় বিচার করলে দেখা যায় যে হোমারের 'ইলিয়াডের' কাহিনী চারদিনের, মেঘনাদবধ কাব্যের তিন দিন দুই রাত্রির। ইলিয়াডের mount Ida মেঘনাদে যোগাসন পর্বত হয়েছে। লক্ষণের চণ্ডিকা দেউলে গমনপথের বাধাগুলো ট্যাসোর 'জেরুযালেম বিজয়ের' প্রভাবে প্রভাবিত এবং প্রমিলা চরিত্রে একই সঙ্গে ভার্জিল, দান্তে ও বায়রনের-প্রভাব রয়েছে। তখন প্রাচ্যদেশীয় আবহ সম্পর্কে আর কোনো সংশয় থাকেনা।

চরিত্রায়ণে মাইকেল মৌলিকতার উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহন করেছেন। দুয়েকটি চরিত্র কবি নিজেই সৃষ্টি করেছেন। যেমন চিত্রাঙ্গদা ও প্রমিলা। এদের নাম কৃত্তিবাসী-রামায়ণে থাকলেও পূর্ণাঙ্গ চরিত্র সৃজনের কৃতিত্ব সম্পূর্ণ মাইকেলের। কয়েকটি চরিত্রে বিশেষ আদর্শের ছায়াপাত হয়েছে।বলা ভালো বিভীষণ চরিত্রের কবি একটি নতুন ব্যখ্যা দিয়েছেন। বাল্মীকির বিভীষণ ধর্ম পুত্র। সজাতি প্রীতিই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য ,কিন্তু মধুসূদন তাঁকে দেশদ্রোহী করেছেন।রাজ্যের প্রতি তাঁর লোভ সুস্পট। কিন্তু এই বিভীষণের মধ্যেও তিনি মানবতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। মেঘনাদের মৃত্যুর পরে বিভীষণের দীর্ঘ স্বগতোক্তির সজল বিলাপের মধ্যে সেই পিতৃমনেরই দ্বার পথ উন্মোচিত যা ধর্ম এর ন্যায় এ উপল খন্ড দিয়ে বাধা পড়েছিল। বিভীষণের পক্ষে যুক্তি গুলি রাবণ কে পরিত্যাগের কারন যেভাবে এবং ভাষায় প্রকাশিত তাতে বিভীষণ কে হেয় করার

চেষ্টা নেই।কেবল ঘটনার এমন একটা মুহূর্তে তিনি এই আপাত প্রান হীন শুষ্ক সংলাপ বলেছেন যাতে এগুলি পাঠক মনে কোনো সাড়া জাগায় না।

অন্যদিকে বাল্মিকীর রামায়নে রাম সৎ, ধার্মিক, সাহসী, সত্যনিষ্ঠ এবং দয়াবান। রাবণ পাপীতাপী, অন্যায়কারী ও অত্যাচারী। কিন্তু মধুসূদনের মহাকাব্যে রাম ভীরু, শঠ, প্রতারক এবং দুর্বল চরিত্রের মানুষ। রাবণ সাহসী পুরুষ, স্নেহময় পিতা, প্রজাহৈতিষী। দেবতাদের চক্রান্ত ও কোপানলে পড়ে তিনি একজন বিরহী ও দুঃখী মানুষ। তিনি রামায়ন নির্দেশিত পথে না চলে রাক্ষস বংশের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়েছেন। তাঁর কাব্যে রাক্ষসেরা বীভৎস এবং ঘৃণ্য কোনো প্রাণী নয়, বরং আমাদের মতই আবেগ-অনুভূতিতে পূর্ণ মানুষ। রাবণ চরিত্রের জন্যই মেঘনাদবধ কাব্য করুণ রসের আধার হয়ে উঠেছে।

মেঘনাদবধ কাব্য শুরু হয়েছে হাহাকার দিয়ে এবং শেষ হয়েছে হাহাকার, দিগন্তবিহস্তারী কান্নার মধ্যে দিয়ে। বিষাদেই শুরু, বিষাদেই শেষ। মেঘনাদের মৃত্যুতে শত্রু শিবিরে জয়ধবনি উঠেছে, কান্নায় ভারী হয়েছে লঙ্কার আকাশ বাতাস। বিষয়বস্তুর বিরাটত্ব, চরিত্রের সমোন্নতি, ভাবের গাম্ভীর্য, বস্তুধর্মের প্রাচুর্য,ঘটনা ও চরিত্র বর্ণনার নাটকীয়তা এবং সমস্ত কিছুর বাহন স্বরূপ কাব্যকলার উৎকর্ষ প্রভৃতি লক্ষণের কথা এরিস্টটলের সংজ্ঞা থেকে পাওয়া যায়। মেঘনাদবধ কাব্যেও এর উপস্থিতি অস্বীকার করা যায় না। বরং মেঘনাদবধ যদি মহাকাব্য হয় তবে শেষোক্ত অন্তরঙ্গ লক্ষণেই হয়েছে,তা বিশ্বনাথের সংজ্ঞানুসারে নয়। কয়েকটি চিত্র মধুসূদন সরাসরি মিল্টন, হোমার কিংবা ভার্জিল থেকে নিয়েছেন। প্রথম সর্গে বারুনী ও সুরলার প্রসঙ্গ মিল্টনের comes থেকে নেয়া। প্রমীলার নিদ্রাভঙ্গের দৃশ্য প্যারাডাইসলস্ট –এর অনুরূপ ইত্যাদী অসংখ্য ঘটনার উৎস –ভারতীয় ঐতিহ্যে না খুঁজে পাশ্চাত্য সাহিত্যে পাওয়া যাবে। তদুপরি অমিত্রাক্ষর ছন্দ মিল্টনের blank verse-এর,বঙ্গ-সংস্করণ। এভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে ‘কবির চিত্ত ফুলবন মধুলয়ে’ মধুচক্র রচনা করেছেন।

২.৫-সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

মন্তব্য

১ -মেঘনাধ বধ কার লেখা?

মেঘনাদ বধ কবি মাইকেল মধুসূদনের দত্তের লেখা।

২ -মেঘনাধ বধ কত খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়েছিল?

মেঘনাধ বধ ১৮৬১ সালে দুই খণ্ডে বই আকারে প্রকাশিত হয়। কাব্যটি মোট নয়টি সর্গে বিভক্ত।

৩ -মেঘনাদ বধ কোন ছন্দে রচিত?

মেঘনাদ বধ অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা 'ফ্রি ভার্সে' রচিত।

৪ -মেঘনাদ বধ এর মুখ্য চরিত্র কে?

মেঘনাদ বধ এর মুখ্য চরিত্র ইন্দ্রজিৎ তথা রাবনের সন্তান ,কিন্তু সমস্ত কাব্য জুড়ে আছে মহাবীর রাবন।

৫ -কবি মাইকেল মধুসূদনের দত্তের জন্ম ও মৃত্যু সাল কত?

কবি মাইকেল মধুসূদনের দত্তের জন্ম ১৮২৪ এবং মৃত্যু ১৮৭৩ সালে।

২.৬-অনুশীলনী প্রশ্ন

১ -মেঘনাদবধ কাব্যের মহাকাব্যিক আধুনিকতা বিচার কর।

২.৭-গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- দেবেশ কুমার আচার্য্য।

মেঘনাদবধ কাব্য- শ্রী হরিপদ চক্রবর্তী।

একক-৩ কবি যতীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা গুলির আলোচনা

বিন্যাস ক্রম

৩.১-যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত- (১৮৮৭-১৯৫৪) – ভূমিকা

৩.২-সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

৩.৩-অনুশীলনী প্রশ্ন

৩.৪-গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ ভূমিকা

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শান্তিপুরে তাঁর জন্ম। তিনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি (১৯১১) লাভ করে প্রথমে নদীয়া জেলাবোর্ড ও পরে কাসিমবাজার রাজ-এস্টেটের ওভারসিয়ার হন। চাকরির পাশাপাশি তিনি সাহিত্য চর্চাও শুরু করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই কবি হিসেবে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। রবীন্দ্র যুগের কবি হয়েও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এড়িয়ে যে কয়জন কবি-সাহিত্যিক নতুন ভাবনা ও স্বতন্ত্র বক্তব্য নিয়ে কাব্যচর্চা করেন, যতীন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম।

নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতা আধুনিক বাংলা কবিতার আশ্রয়। শহুরে যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাত, ক্লান্তি, নৈরাশ্য, আত্মবিরোধ, অনিকেত মনোভাব ইত্যাদি তিলক পরিধান করে তিরিশোত্তর আধুনিক কবিতা তার রংরিক্ত শোভাযাত্রা শুরু করে। পঞ্চ আধুনিক – বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে ও অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা নগরকেন্দ্রিক সভ্যতাকে ধারণ করলেও তাঁরা কেউই বাংলা সাহিত্যে নাগরিক কবি

হিসেবে বিশেষভাবে চিহ্নিত হননি। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আধুনিক কবিদের উত্তরসূরি। আক্ষরিক অর্থে তিনি বাংলা সাহিত্যের নাগরিক কবি। সত্যিকার অর্থে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিতায় নগরকেন্দ্রিক সমকালের বিবর্ণ প্রতিবেশ পৃথিবীর চৌচির মুখচ্ছবি অঙ্কিত। স্বপ্নসৌন্দর্যময় মনোবিশ্ব থেকে তিনি স্খলিত পদপাতে উঠে এসেছেন প্রতিবেশ পৃথিবীতে । বিশ্বের পটভূমিকায় নগর তথা যথার্থ নগর বঙ্গই। এই বঙ্গের অধিবাসী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বাংলাকাব্যে নাগরিকতার ধারক।

আমরা জানি, মধ্যযুগের শেষ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি। নগর ও পল্লী জীবনের প্রেক্ষাপটে ভারতচন্দ্রের জীবন ও কর্মকীর্তি । কিন্তু যে অর্থে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত নাগরিক কবি, সে অর্থে ভারতচন্দ্র নন। ভারতচন্দ্র বিশেষ ও সীমিত অর্থে নাগরিক। তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্যায় নগর জীবনের পরিবেশের মধ্যে উদ্ঘাটিত। অবস্থার পাকে তিনি নগরজীবনের বিচিত্র তন্তুজালের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। ফলে নগরজীবনের বিভিন্ন দিক ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ তাঁর হয়েছে। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি। দরবারি সমাজের শূন্য গর্ভপর্দ ও জৌলুস, নগরসমাজের অনাচার বিলাস ও বিভ্রমের মধ্যে তাঁর দৃষ্টি ও বুদ্ধিকে তিনি আচ্ছন্ন হতে দেননি। নিছক জীবিকার প্রয়োজনে শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায় ও দরবারি সমাজের রুচি, অহংকার, অভিমান, বিলাসলালসার ক্ষুধা তাঁকে মিটাতে হয়েছে। এজন্য মধ্যযুগের দেবনির্ভর কাব্যচেতনা ও নগরকেন্দ্রিক সমাজের মনোরঞ্জনের জন্য ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে নাগরিকতা আমদানি করেছেন মাত্র। তাঁর নাগরিকতা স্বতঃস্ফূর্ত নয়, এজন্য আধুনিক অর্থে ভারতচন্দ্র নাগরিক কবি নন। ভারতচন্দ্রের কবিকর্মে সৃষ্টিমূলক জীবনদর্শন ও সাহিত্যের প্রেরণা শিথিল। মূলত নাগরিক সমাজের শূন্যগর্ভতাকে তীক্ষè ব্যঙ্গ ও বিদ্রƒপের বাণে বিদ্ধ করেছেন ভারতচন্দ্র। তবে একথা সত্য-, বাংলা কাব্যে ভারতচন্দ্রই নাগরিকতার বীজ বপন করেন।মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, জসীমউদ্দীন, ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের বহু খ্যাতিমান কবি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ নিজ নিজ ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি

হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও নাগরিক কবি হিসেবে কাউকে চিহ্নিত করা যায় না। কারো কারো কবিতায় নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার ছোঁয়া আছে মাত্র। সর্বময় নাগরিকতা নিয়ে কেউ নিজেকে উপস্থাপন করতে সমর্থ হননি। একমাত্র যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বাংলাকাব্যে সর্বময় নাগরিকতার নন্দিত উপস্থাপক। জীবনযাপনে, নন্দনে মননে-যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আয়ত্ত করেছিলেন একজন খাঁটি নাগরিক- কবির তাবৎ বৈশিষ্ট। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি আয়ত্ত করেছিলেন এক অনুকরণীয় বর্ননামূলক বাকভঙ্গি, যা সহজবোধ্য এবং যাতে বিবরণ বা স্বীকারোক্তির ভেতর দিয়ে একটি জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত মানস বা 'ইথোস'কে ধরা যায়। একান্ত নিজস্ব বাকভঙ্গির মধ্যে দক্ষ শব্দ জাদুকরের মতো মিশিয়ে দিয়েছেন প্রচুর অভিনব শব্দবন্ধ, চিত্রকল্প, উপমা এবং রূপক। নাগরিক বাস্তবতার রূঢ় জমিনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন বলে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বাংলাকাব্যের শ্রেষ্ঠ নাগরিক কবি।কবি যতীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছিলেন, ''যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আমাদের আরাধনীয় ছিলেন — ভাবের আধুনিকতার দিক থেকে যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব অভিজ্ঞতা। আমাদের তদানীন্তন মনোভাবের সঙ্গে চমৎকার মিলে গিয়েছিল দুঃখের মধ্যে কাব্যের যে বিলাস আছে, সেই বিলাসে আমরা মশগুল ছিলাম। তাই নৈরাশ্যের দিনে ক্ষণে-ক্ষণে আবৃত্তি করতাম 'মরীচিকা'।যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের এই উক্তিটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা রবির কিরণ তখন মধ্যগগনে— কাব্য, উপন্যাস, গল্প, নাটকের জগতে কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারছেন না। বেশির ভাগ সাহিত্যিকই কোনও না কোনও দিক থেকে রবীন্দ্র অনুগামী, রবীন্দ্র অনুসারী হয়ে পড়েছেন। ঠিক সেই সময়ে আধুনিক কাব্যধারার জগতে একটি স্বতন্ত্র ধারা নিয়ে আর্বিভূত হলেন যতীন্দ্রনাথ।যতীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যরচনায় রবীন্দ্র অনুকরণ থেকে মুক্ত হয়ে, সাহিত্য ক্ষেত্রে একটি বিশেষ শাখাপথ তৈরি করতে পেরেছিলেন। সেই শাখা পথটিকে আমরা বলি 'দুঃখবাদ'। সেটা কতটা যুক্তিযুক্ত সেই তর্ক থেকে দূরে সরে বলা যেতে পারে, সেই নতুন কাব্যমানসের জন্যই তিনি রবীন্দ্রযুগে আপন মহিমায় স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে নিয়েছিলেন।যতীন্দ্রনাথ ১৮৮৭

সালে ২৬ জুন এখনকার গ্রামীণ বর্ধমানের কালনা মহকুমার অন্তর্গত পাতিলপাড়ায় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পৈতৃক নিবাস ছিল নদিয়ার শান্তিপুর শহরের পশ্চিমে হরিপুর গ্রামে। কবির শৈশব কেটেছে হরিপুর অঞ্চলে। পিতা ছিলেন দ্বারকানাথ সেনগুপ্ত, মায়ের নাম মোহিতসুন্দরী দেবী। যতীন ছিলেন বাবা-মায়ের এক মাত্র জীবিত সন্তান, তার আগের চার-পাঁচ ভাইবোন কেউই শৈশব পেরোয়নি। যখন যতীনের বয়স আট বছর, তিনি পড়লেন ম্যালেরিয়ায়। সেই যে রোগ তাঁকে ধরল, সেই রোগ থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি রেহাই পাননি। ছেলেবেলা থেকেই আমবাগান, অশ্বত্থগাছ, দিগন্ত প্রসারিত মাঠ, বিল, বিশাল চর, পল্লিপথ, পাখপাখালির ডাকের সঙ্গে গ্রাম্যজীবনের দুর্গোৎসব, দোলযাত্রা, মহরমে আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হয়ে যতীন্দ্রনাথের মানসলোক গড়ে ওঠে। শৈশবে গ্রামের বিদ্যালয়ে তাঁর লেখাপড়ার হাতেখড়ি। গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা করতে-করতে যখন তাঁর বয়স বারো বছর, তিনি স্কুলবৃত্তি পেয়ে কলকাতায় কাকার বাড়িতে চলে যান উচ্চশিক্ষা নেওয়ার জন্য। কলকাতায় পড়াশোনা করতে-করতে দেড় বছরের মাথায় আবার তাঁকে ধরল প্লেগে। কিন্তু প্লেগ তাঁকে কাবু করতে পারল না। প্লেগমুক্তির কিছু দিন পরে পড়লেন টাইফয়েডে। যন্ত্রণায় পেটের নাড়ি ছেয়ে গেলেও এ যাত্রায় ফের প্রাণে বেঁচে গেলেন। রোগে-রোগে ভুগে যতীনের শরীর হয়ে গেলো শীর্ণকায়। বাড়ির লোকে মনস্থির করতে পারছেন না, তাঁকে দেশের বাড়ির পাশের গ্রামের স্কুলে পড়াবেন না কলকাতায়। সেই সময়ে তাঁর বাবা বালেশ্বরে চাকরির সুবাদে যতীনকে সেখানে নিয়ে গিয়ে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। দিন যত গেল, বালেশ্বরের জল-হাওয়ার গুণে কয়েক মাসে যতীন্দ্রনাথের শরীরের হতশ্রী দশা দূর হতে লাগল। কিন্তু তাঁর ভাগ্যে সুখ নেই। কিছুদিন বাদে বাবার চাকরি চলে গেল। তাঁকে আবার কলকাতায় ফিরতে হল। কলতাতায় ফিরে ১৯০৩ সালে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স, ১৮ বছর বয়েসে জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ় ইনস্টিটিউশন (বর্তমানে স্কর্টিশ চার্চ কলেজ) থেকে এফএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এক বন্ধুর পরামর্শে যতীন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হলেন। শিবপুরে ভর্তি প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন, ‘‘...পদ্মপুকুরের সন্নিকটে বসেই প্রবেশিকা পরীক্ষা করলেন

সেখানকার ডাক্তার। বুকের মাপ, দেহের ওজন সবই কম হল। তখন ডাক্তারবাবু একটা পরীক্ষা করলেন। সেটা তৃতীয় প্রহরের নিদাঘ রৌদ্রে দূরের একটা অশ্বত্থগাছ দেখিয়ে বললেন— ঐ পর্যন্ত জোরে ছুটে গিয়েই ফিরে এস। হাঁপিয়ে গেলেও সেটা পারলাম।... তখন ডাক্তার করুণাপরবশ পাশ করিয়ে দিলেন অর্থাৎ বুকের মাপ দেহের ওজন ইত্যাদি বাড়িয়ে লিখে দিলেন। ইঞ্জিনিয়ার হবার জন্য কোমর বাঁধলাম।''

কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে যতীন লেখাপড়া চালাতে লাগলেন পুরোদমে। কিন্তু সমস্যা এসে জুটল ওয়ার্কশপে। তিনি লিখছেন, ''প্রথম বছর ছুতোরখানার কাজ। প্রথমেই প্রত্যেককে রেলের স্লিপারের মতো একটা কাঠ দিয়ে হাত করাতের সাহায্যে সেটাকে ফালাফালা করে চিরতে বলা হল। সেই সামান্য কাজটুকু সুসম্পন্ন করার পর আসল কাজ শেখানো হবে। দু তিন দিনের মধ্যে দু হাতে ফোস্কা পড়ে, গলে ঘা হয়ে গেল, কিন্তু কাঠ বির্দীর্ণ হল না। দু চার জন তার পরই সরে পড়লেন অভিভাবকদের বহু টাকা নষ্ট করে।... আমরা গরীবের ছেলে, প্রাণপণে কাজ ও পড়া চলিয়ে যেতে লাগলাম।''

এই ভাবে নিরলস পরিশ্রম করতে-করতে কবি ছুতোরশাল-কামারশাল-কণ্টকিত বিদ্যার পরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত কষ্টসৃষ্টে পাশ করলেন। পাশ করার পরে প্রথম ট্রেনিং পড়ল ঢাকায়। তা শেষ করে আসার পরে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে-তে সার্ভেয়ার পদে প্রথম যোগ দেন। এবং মাত্র ১২ দিন বাদেই ১৯১৩ সালে নিজের পিতৃভূমি নদিয়ায় জেলা বোর্ডের চাকরিতে যোগদান করেন।

কলেজে পড়ার সময়ে এক বার বন্ধু মিহিরের সঙ্গে যতীনের তর্ক বাধে। স্মৃতিকথায় তিনি উল্লেখ করেছেন, ''মিহির বলে, রবীন্দ্রনাথের মতো কবি বাংলায় জন্মায়নি, সে উত্তপ্ত হয়ে জানায় নবীন সেনের 'কুরুক্ষেত্র' যে পড়েছে সে ও কথা বলবে না। কিছু দিন পূর্বে আমরা 'কুরুক্ষেত্র' পড়েছিলাম, মাইকেলের 'সীতা ও সরমা' অংশ, হেমচন্দ্রের 'অশোকতরু' প্রভৃতি দশ-বিশটা কবিতা পড়া ছিল, বাল্যকালে পিশিমার কাশীরাম দাসের মহাভারতখানি লুকিয়ে কয়েকবার শেষ করেছি, গ্রামের মুচিপাড়ায় ও কুলোপাড়ায় বারোয়ারি পূজায় কবির গান ও তর্জার লড়াই আমরা শুনেছি। কিন্তু রবি

ঠাকুরের কবিতা আমরা তখনও পড়িনি, গান দু দশটা শুনেছি। মিহির মৃদু হেসে বলল— নবীন সেন ও রবীন্দ্রনাথে কি তফাৎ সেটা বোঝাবার জন্য রবিবাবুর কাব্যগ্রন্থাবলী তোমাদের দেব, আগামী বর্ষবকাশে পড়ে দেখো তারপরে তর্ক কোরো। মিহির প্রদত্ত আড়ে-দীঘে সমান, একখানি প্রকাণ্ড রবীন্দ্র কাব্যগ্রন্থাবলী নিয়ে ছুটির সময়ে হরিপুরে এলাম। পড়ে দেখে আমরা তো অবাক। হায় নবীন সেন, এই বিদ্যা নিয়ে মিহিরের সঙ্গে তর্ক করা হচ্ছিল।'' তিরিশের যুগে একটা শাখাপথ সৃষ্টি করে এমন এক ধরনের কবিতা তিনি লিখেছিলেন যে রবীন্দ্রযুগে আপন মহিমায় স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে নিয়েছিলেন। বৃত্তিতে তিনি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। ইট কাঠ পাথর নিয়েই তার কারবার। সুতরাং তার হাতুড়ির ঘায়ে ভাবজগতের ভাববিলাস বিলকুল নিপাত যাবে এই ছিল তার অভিলাষ। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে তিনি রবীন্দ্র প্রভাবের সাবেকী সংস্কার ভাঙতে চেয়েছিলেন। প্রেম,প্রকৃতি,ভগবান, রোমান্টিকতা প্রভৃতির কৃত্তিম সংস্কারের চশমা খুলে ফেলে নির্ভেজাল আবেগ, কঠিন বাস্তবের দৃষ্টি দিয়ে জগত ও জীবনের কঙ্কাল মূর্তি ফুটিয়ে তোলাই তার উদ্দেশ্য ছিল। তথাকথিত রবীন্দ্র গোষ্ঠীর তার সম্পর্ক খুব কাছের ছিল, এবং একদা কল্লোল গোষ্ঠীতে তিনি খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন। 'দুঃখবাদী কবি' বলে খ্যাতি অর্জন করলেও তিনি ছিলেন সমাজসচেতন ও মানবতাবাদী কবি। তাঁর দুঃখের সূতিকাগার ছিল মানবপ্রেম। মানুষের দুঃখ-বেদনা সামাজিক অবিচার ও বৈষম্যে তাঁর কবি হৃদয় হাহাকার করে উঠেছিল। বাংলা কবিতার প্রবল রোমান্টিক যুগে জন্মগ্রহণ করেও, রোমান্টিক আবহে নিমজ্জিত থেকেও তিনি কবিতাকে বাস্তবতার কঠিন মাটিতে দাঁড় করাতে চেয়েছেন। পেশাগত জীবনে তিনি একজন প্রকৌশলী হিসেবে তাঁর বিজ্ঞানমনস্ক অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পেরেছিলেন।

যতীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন যুক্তিবাদী ও মননশীল লেখক; সমাজ ও সমকাল তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু। ভাষার মধ্যে তর্ক, কটাক্ষ ও প্রচ্ছন্ন পরিহাস তাঁর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। দর্শন ও বিজ্ঞান উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি ছিলেন দুঃখবাদী, আর এই দুঃখবাদ তাঁর কাব্যের মূল সুর। প্রকৃতি ছলনাময়ী, জীবন দুঃখময়, সুখ অনিত্য ও

ক্ষণিকের এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি জগৎ-সংসারকে দেখেছেন। কোনোরূপ ভাববাদের বশবর্তী হয়ে নয়, বরং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও বাস্তব পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি দুঃখ ও নৈরাশ্যের চিত্র এঁকেছেন। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ মরীচিকা (১৯২৩), মরুশিখা (১৯২৭), মরুমায়া (১৯৩০), সায়ম্ (১৯৪০), ত্রিযামা (১৯৪৮), নিশান্তিকা (১৯৫৭) এবং কবিতা-সংকলন অনুপূর্বা (১৯৪৬)। প্রথম তিনখানি কাব্যের নামকরণে অগ্নি, রুদ্র ও মরুর দহন এবং শেষের তিনটির নামকরণে রাত্রির অন্ধকারের প্রতীক-দ্যোতনা প্রকাশ পেয়েছে।

যতীন্দ্রনাথের মতে মানুষের জীবনের প্রথমার্ধ অবিরত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে নিদারুণ দুঃখ-কষ্টে অতিবাহিত হয়, দ্বিতীয়ার্থে অপরাধ জরা-ব্যাধি ভারাক্রান্ত অবসন্নতা নেমে আসায় রাত্রির অন্ধকার-সদৃশ অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটে। প্রেম, প্রকৃতি বা ঈশ্বর মানবজীবনের দুঃখের দহনজ্বালা ও নৈরাশ্যের অবসন্নতা দূর করতে পারে না। তাঁর বিশ্বাস ছিল এমন যে, ঈশ্বর স্বয়ং দুঃখময়, ঈশ্বরের বার্তা মানুষের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না; জগৎ যেমন তেমনই থাকে; প্রেম বলে কিছু নেই, চেতনাই জড়কে সচল করে।

যতীন্দ্রনাথের ভাষা আবেগমুক্ত ও যুক্তিসিদ্ধ; তিনি সরাসরি বিষয়ের প্রকাশ ঘটান। তবে অন্ত্যপর্বের কাব্যগুলিতে তাঁর রোম্যান্টিক বিহবলতা ও চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর জীবনদর্শন ও রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর জীবনদৃষ্টিতে মানবতাবাদ ও দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের প্রতি গভীর মমতা লক্ষণীয়। শেষ বয়সে তিনি ম্যাকবেথ, ওথেলো, হ্যামলেট, কুমারসম্ভব ইত্যাদি অনুবাদ করেন। তাঁর কাব্য-পরিমিতি (১৯৩১) একটি সমালোচনামূলক গদ্যগ্রন্থ। মাসিক বসুমতীতে (১৯৪৯) 'বিপ্রতীপ গুপ্ত' ছদ্মনামে তিনি স্মৃতিকথা নামে আত্মজীবনী প্রকাশ করেন।

বাংলা কাব্যকে অবাস্তব কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে তাঁকে একজন পথিকৃৎ বলা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরে তিনিই মনে হয় প্রথম কবি যিনি সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর জয়গান গেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যেখানে সমাজ সংস্কারের

ভূমিকাকে তেমন গুরুত্ব দেননি, যতীন্দ্রনাথ সেখানে চাইলেন বাস্তব কর্মজগতের মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে। তিনি বলেন –

কর্মশালার সর্বদুয়ার
খুলে ডেকে লও মোরে,
কর্মের তাপে ঘর্ম ঝরুক
শিলাজতু নির্ঝরে
(আবেদন, মরীচিকা)

বহুকালচালিত সংস্কার শাসন নিষ্পেষণ এবং ধর্মের নামে মানুষকে নির্যাতনের যে অলিখিত নিয়ম চালু হয়েছিল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সেগুলো গভীরভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। সমাজের কিছু মানুষ একদিকে জীবনের রূপ-রস-অর্থ-প্রাচুর্য কুক্ষিগত করেছে, আর অপরদিকে কিছু মানুষ কেবলই হয়েছে শোষিত। সমাজের গরিব শ্রেণীর মানুষ ধনীদের ভোগ-বিলাস উদ্যাপনে টোপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যতীন্দ্রনাথ এই বৈষম্যের জন্য কেবল মানুষকেই দোষারোপ করেননি, তিনি বিধাতাকেও সন্দেহসংকুল করে ফেলেছেন। 'তিনি ঘুমের ঘোরে, প্রথম ঝোঁকে' কবিতায় বলেছেন-

সাগরের কূলে পুরী তব দারু মূরতি জগন্নাথ;
রথের চাকায় লোক পিষে যায়, তোমার নাহিক হাত।

'ঘুমের ঘোরের তৃতীয় ঝোঁকে'র কবিতায় নিপীড়িত মানুষের জন্য কবির সমবেদনা প্রকাশিত হয়েছে। ক্ষমতাবানদের নিত্যনতুন বৈভব ও ঐশ্বর্য, সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি নিয়তই অর্জিত হচ্ছে দুর্বল অত্যাচারিত মেহনতি মানুষের রক্তের বিনিময়ে। অথচ যাদের দানে এই ধনিক শ্রেণী পুষ্ট তারাই থাকছে অনাহারী।

খস্ খস্ ঠক্ চলেছে তাঁতীদের তাঁত বোনা!
এ হাত ও হাত ফিরিতেছে মাকু ধৈর্য্যের নাহি চ্যুতি,
কার সুতা খুলে দিয়ে বুক থেকে কার তরে বুনে ধুতি।
দেখিনু তন্দ্রাভরে

তাঁতীর টাকার বড় দরকার, মাকু ছুটাছুটি করে।

(ঘুমের ঘোরে, তৃতীয় ঝোঁক)

'ডাকহরকরা', 'বারনারী', 'চাষার বেগার', 'পথের চাকুরি', 'অভাগার ভাগ্য', 'কান্ডারী', 'গাড়োয়ানের গল্প', 'নবান্ন', 'ফেমিন রিলিফ', 'বেদেনী' প্রভৃতি কবিতাতে সমাজের নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের দৈনন্দিন দুঃখের চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে। ডাকহরকরার জীবনের চরম ট্র্যাজেডি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। সে অপরের প্রয়োজন মেটায় অথচ তার প্রয়োজন মিটাবার বা সুখ-দুঃখের কথা শোনার অবকাশ কারো নেই। পরবর্তীকালে রচিত সুকান্ত ভট্টাচার্যের রানার কবিতাটির কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। যে বারনারী সমাজে ঘৃণ্য এবং পরিত্যক্ত তাকেও যতীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। বরং এদের মধ্যে কবি উদার রমণীকেই প্রত্যক্ষ করেছেন।

যৌবনখানি বসনের মত

খুলে রাখ, তুলে পর!

কার কল্যাণে করে কঙ্কণ

সিন্দুর সিঁথা পরে;

অমর কাহারে বরিয়া লয়েছ বিশ্ব সয়ম্বরে

কিংবা

নহ মা ঘৃণ্য, কৃপার পাত্র

আজ যে বুঝেছি খাঁটি-

মায়ের পূজায় কেন লাগে তোর

চরণে দলিত মাটি।

(বারনারী, মরীচিকা)

পরবর্তীকালে নজরুল ইসলামও বারাঙ্গনাকে মাতৃত্বের আসনে বসিয়েছিলেন। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই নীতিবাক্য আমরা যতই ঘোষণা করি না কেন, বাস্তবক্ষেত্রে এই সত্যকে আমরা মেনে চলি না। প্রকৃতপক্ষে আমাদের

সমাজব্যবস্থায় শ্রমজীবী চাষী-মজুরদের শোষণ-শাসনের কৌশলই কেবলমাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। একটা শ্রেণীগত বিভেদ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে। ফলে শ্রমজীবী মানুষ তাদের অধিকার থেকে চিরদিন বঞ্চিত হয়েছে। যে কৃষক পায়ের ঘাম মাটিতে ফেলে ফসল ফলায় সেই থাকে নিরন্ন। যে শ্রমিক দালান কোঠা নির্মাণ করে সেই শ্রমিক সেখানে ঠাঁই পায় না। যে তাঁতি কাপড় তৈরি করে সেই তাঁতির বস্ত্র থাকে না। কবি তাই বেদনার সঙ্গে বলেন –

হালের ফলকে লক্ষ্মী উঠিলে করিয়া দান
লক্ষ্মীমানের ঘরে
দুর্ভিক্ষের ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া, প্রাণ
দেয় যারা নিজ করে
বেতসের মত সত্য শিক্ষা শেখেনি যারা
হাওয়ার নেশায় মাতি
বটের মতন খোলা মাঠে আজও রয়েছে খাড়া,
তারা মানুষের জাতি।
(মানুষ, মরীচিকা)

অথচ এসব মানুষ সামান্যতম সামাজিক মূল্য এবং অর্থনৈতিক সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। সমাজের ক্ষমতাবানদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপরে নির্ভর করে এদের ভালো থাকা মন্দ থাকা। নিজের ঘরে চাল নেই, ছিন্ন ঘর ছাওয়ার মত পয়সা নেই, কিন্তু রাজার আদেশে বেগার খাটতে হবে তাকে –

রাজার পাইক বেগার ধরেছে,
ক্ষেতে যাওয়া বন্ধ হল আজ;
জীর্ণচালে হল না আর দেওয়া
কোথাও দুটি পঁচা খড়ের গুঁজি,
সারা সনের অন্ন ছাড়ি
যেতেই হবে রাজার বাড়ি!

স্বর্ণচূড়ায় বর্ণ সেথায় মলিন হল বুঝি।

(চাষার বেগার, মরীচিকা)

মরুশিখা কাব্যগ্রন্থে গাড়োয়ানের গল্প এবং মরুমায়ায় প্রতীকধর্মী গল্প মৎস্য শিকারের ব্যঞ্জনাও অনেকটা সমগোত্রীয়। পথের চাকরি কবিতাতে মধ্যবিত্ত চাকরিজীবীদের সুখ-দুঃখ ফুটে উঠেছে। 'কাণ্ডারী', 'নবান্ন' প্রভৃতি কবিতায় নিরন্ন ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের কথা এক গভীর মমতায় প্রকাশ করেছেন কবি। দরিদ্র সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ ও সংগ্রামশীলতা তিনি নিখুঁতভাবে অঙ্কন করেছেন। 'নবান্ন' কবিতায় কবি কৃষকের মনের নতুন আশার বর্ণনা দিয়েছেন-

আমি ভাবি ফসলটা নাবি, আরও কটা দিন যাক,

ভরা অঘ্রাণে ঘটে না-ত কোন দৈব-দুর্বিপাক।

মাড়াই-সরাই শেষ করে সবে খামারে দিইছি হাত,

কালকে হঠাৎ

বন্ধু দোহাই, তুলনাকো হাই হইনু অপ্রগলভ_

ক্ষমা কর সখা বন্ধ করিনু তুচ্ছ ধানের গল্প।

(নবান্ন, মরুমায়া)

'ফেমিন-রিলিফ' নামক কবিতায় কবি উল্লেখ করেছেন, সহায়-সম্বলহীন অসহায় মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য সরকারের কাছ থেকে যেসব রিলিফ সামগ্রী আসে উচ্চবিত্তের লোকজন তাও চেটেপুটে খেয়ে নেয়। শোষণের এক নির্দয় চিত্র অঙ্কন করেছেন যতীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় –

তিন আনা চৌকা

ভুখা পেটে খেটে খা,

দলে দলে লেগে যা।

কে বলে কঠিন মাটি? না পোষায় ভেগে যা।

ঘরে বসে মড়'কে

চলছিলি নরকে

না হয় কোদাল হাতে মরবি এ সড়কে

খাট তবে খাট রে।

ডোঙা পেট কোঙা করে গোঙা মাটি কাটরে।

(ফেমিন-রিলিফ)

কিন্তু বিশ্রাম নেয়ার উপায় নেই। আহারক্লিষ্ট পরিশ্রান্ত শরীর ঝিমিয়ে পড়তেই আসবে তাগাদার পর তাগাদা। এদের পিপাসা পেতে নেই, অসুস্থ হতে নেই –

ওকে ওরে মেষ্টা।

পেল বুঝি তেষ্টা?

তোদের কষ্ট মেটে তারই তো এ চেষ্টা।

এবারের বৈশাখ

পিপাসাটা চেপে রাখ।

কিন্তু এতসব কষ্টের পরেও এই দরিদ্র-ক্লিষ্ট মানুষের কাছে কোন রিলিফ পৌছায় না। শ্রমিক তার স্ত্রীকে প্রবোধ দিয়ে বলে-

কাঁদিসনি খোকা ধন, ভাবিসনি বৌ গো!

আজ তো কেটেছি মাটি পুরো এক চৌকো।

বুকে পিঠে মাটি চাপে, এ মাটি কে মাপে রে?

হক্ মাটি মাপ দিতে বুক কেন কাঁপে রে?

'বেদিনী', 'কচিডাব' প্রভৃতি কবিতায়ও জীবন সংগ্রামে পর্যুদস্ত দুঃখী মানুষের কথা চিত্রিত হয়েছে। 'পাষাণ পথে', 'কেতকী' প্রভৃতি কবিতায় লাঞ্ছিত নারীর অপমানকেই কবি প্রত্যক্ষ করেছেন। সায়ম কাব্যগ্রন্থের কৃষ্ণা কবিতাটিতে পৌরাণিক কাহিনীর অন্তরালে সমকালীন নারী নির্যাতনের চিত্রই প্রতিফলিত! পাষাণ পথে কবিতার ব্যঞ্জনা সার্থক কবিতাটির সগোত্রীয়! জ্যৈষ্ঠ দুপুরের সেরা শহরের ইটপাথরে বিরাট নগর যখন প্রচ- তাপে 'জ্বরঘোরে' ধুঁকে, তখন কাননরানীর শিশুকন্যা বকুল অবরুদ্ধ পাষাণকারায়। অথচ এই বকুলদের

জীবনেও বিকাশসম্ভাবনা থাকে; কিন্তু ক্ষমতামদমত্ত বিলাসী মানুষ আপন ভোগস্পৃহার বহ্নিতে এদের আত্মদানে বাধ্য করে। শুধু তাই নয়, নিজের ভোগবিলাসীর স্বপক্ষে যুক্তি খাড়া করে। মাংসের দোকানের পাশ থেকে কেনা কেতকীও একই ব্যঞ্জনা বহন করে। কবি যখন বলেন-

বৌবাজারের মোড়ে,
যেখানে ফুলের দোকানের পাশে কসাই
এ মাংস থোড়ে।

তখন ফুলের ব্যবসার পাশাপাশি মাংস থোড়ার ব্যঞ্জনাটি সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ, কিন্তু এই অনাচার এবং অত্যাচারের জন্য শুধু মানুষ দায়ী নয়, দায়ী ধর্মও। কারণ আমাদের সমাজব্যবস্থায় যে ধর্ম তাতে নারী অবহেলিত, পুরুষ সর্বেসবা। তবে কবি এও বিশ্বাস করেন নারী কেবলমাত্র নিপীড়িতা এবং অনুগৃহীতা হয়েই থাকবে না, যুগের আবর্তনে সেও জেগে উঠবে। কারণ এ নারী কৃষ্ণরূপ মহাশক্তিমানের সখী। আঘাতে আঘাতেই ঘটবে তার জাগরণ। দিকে দিকে সেই শক্তিময় নারীর জাগরণ ধ্বনিত হচ্ছে। যুগের শঙ্খ উঠেছে বেজে।

বহুযুগান্তে গগনপ্রান্তে
যুগের শংখ বাজিছে ওকি?
তোমারে জাগাতে কে জ্বালে অনল
হে কৃষ্ণা, অয়ি কৃষ্ণ সখি!

যতীন্দ্রনাথ মূলত মানবতাবাদী কবি। সমাজের অনাচার বৈষম্যে ব্যথিত কবির মর্ম থেকে উঠে এসেছে বেদনার জয়গান। তাঁর বহু কবিতায় কখনো হালকাভাবে আবার কখনো তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ, তির্যক বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে শোষকগোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষ রূপায়িত হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে তিনি অত্যন্ত প্রত্যয়ী মনোভাব নিয়ে বিশ্বাস করেছেন সমাজের যে বঞ্চিত, সর্বহারা নিপীড়িত মানুষের দল যুগ যুগ ধরে অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার ও নিষ্ঠুরতা

সহ্য করে আসছে একদিন আবর্তের পর আবর্ত রচনা করে এমন এক শঙ্খধ্বনি জাগাবে, যে ধ্বনিতে অগণিত ভাষাহীন, মৌনমুখ বঞ্চিতদের বিদ্রোহের ধ্বনি বেজে উঠবে।

বিদ্যুৎসম মনে পড়ে মম
মন্থনদিন প্রলয়ে
নীলকণ্ঠের অট্টহাস্যে
উঠেছিনু আমি শংখ,
অসংখ্য মূক শঙ্কিতে করি'
মুখরিত নিঃশঙ্ক।

কিংবা

আগুনের তাপে সাঁড়াশির চাপে আমি চির নিরুপায়,
তবু সগর্বে ভুলিনি ফিরাতে প্রতি হাতুড়ির ঘায়।
যাহা অন্যায়, হোকনা প্রবল, করিয়াছি প্রতিবাদ;
আমার বুকের কোমল অংশ, কে বলিল তাহে খাদ?

তবে যতীন্দ্রনাথ শুধু শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হননি, সমাজের নানাবিধ অসঙ্গতির জন্য, আগেই উল্লেখ করেছি, স্বয়ং বিধাতাকেও দায়ী করেছেন এবং সর্বোপরি মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন।

শুনহ মানুষ ভাই!
সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা আছে বা নাই।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে বাংলা কাব্যজগতে মূলত দুঃখবাদী কবি হিসেবেই চিত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু এ কথাও ভুললে চলবে না, কবি যতই দুঃখবাদী হন না কেন, তিনি মানবতাবাদী। সামাজিক অসঙ্গতি এবং মানবতাবোধই তাঁকে দুঃখবোধে জাগ্রত করেছে।

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এই দুঃখবাদ কবির বিলাসমাত্র নহে, উহা তাঁহার মর্মমূল হইতে উৎসারিত, পৃথিবী ও জীবনের প্রতি গভীর মমতাই

তাঁহাকে দুঃখের কবি করিয়া তুলিয়াছে। ইহা জীবনের দুঃখ হইতে পলায়ন নহে, দুঃখময় জীবনকে গভীররূপে উপলব্ধি করিবার সাধনা ।"

মানব এবং মানবজমীনের প্রতি আকর্ষণ ছিল বলেই অসঙ্গতিগুলো তাঁকে বেদনা দিয়েছে। সেই বেদনার মর্মমূল থেকেই জাগ্রত তাঁর দুঃখবোধ। সুকুমার সেন তাই বলেছেন, "দুঃখের ফ্রেমে বাঁধা হইলেও জীবনচিত্রের উজ্জ্বলতা তাঁহার কাছে কিছু কম কমনীয় নয় ।" যতীন্দ্রনাথের মতে মানুষের জীবনের প্রথমার্ধ অবিরত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে নিদারুণ দুঃখ-কষ্টে অতিবাহিত হয়, দ্বিতীয়ার্ধে অপরাধ জরা-ব্যাধি ভারাক্রান্ত অবসন্নতা নেমে আসায় রাত্রির অন্ধকার-সদৃশ অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটে। প্রেম, প্রকৃতি বা ঈশ্বর মানবজীবনের দুঃখের দহনজ্বালা ও নৈরাশ্যের অবসন্নতা দূর করতে পারে না। তাঁর বিশ্বাস ছিল এমন যে, ঈশ্বর স্বয়ং দুঃখময়, ঈশ্বরের বার্তা মানুষের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না; জগৎ যেমন তেমনই থাকে; প্রেম বলে কিছু নেই, চেতনাই জড়কে সচল করে।

রবীন্দ্রনাথ কবিতাকে 'অসঙ্কুচিত গদ্যরীতি' বলে তার কাব্যভাবনাকে একটু বাড়িয়ে নিয়ে মূলত মনের আধারের কাব্যবিশ্বাসকেই একটা বাস্তবতার নিরিখে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে কবিতা নামক প্রাচীন শাখাটি হাজার বছরের বাঙালি ঐতিহ্যে এক ধরনের সমাজ অনুষঙ্গী চেতনাকেই সময়ের নিরিখে ক্রমবিকশিত করেছে। কবিতার রূপ-নির্মাণে কবিরা কবিতাকে সব সময়ই নিজের মতো করে গ্রহণ করেছেন। জীবনানন্দ বলেন, 'কবিতা অনেকরকম, কবিতার অস্থির ভেতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।' কবিতা বিষয় এরূপ প্রস্তাবনার উদ্দেশ্য কবিতার দায়বদ্ধতা কিংবা প্রকৃত কবি হিসেবে কাউকে সংজ্ঞায়িত বা চিহ্নিত করা নয়। কবিদের ভাববাচ্যে আমরা অনুসন্ধান করি, বস্তু এবং বস্তু সম্পর্কে ধারণা জন্মাবার পর এ দুয়ের দ্বন্দ্বে কতটুকু অনির্বচনীয় পাঠক চিত্তে জন্ম নিল। পাঠক সেই 'অপরূপ ব্যঞ্জনাময় চঞ্চলতা' উপলব্ধিতে আনলেই তা কবিতা।

তবে নিশ্চিত অর্থেই সেখানে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান ও ইতিহাসবোধ। বাংলা কবিতার মূলধারার চর্চায় কবিদের এমন বোধেই তাদের পরিশুদ্ধ হতে দেখা গেছে। প্রকৃত অর্থে, পূর্ণাঙ্গ জীবন-সত্যকে চিত্রিত করতে গেলে বুঝি এর কোনো ব্যত্যয়ও নেই। কবিতা কখনই বস্তুনিরপেক্ষ হতে যেমন পারে না তেমনি বস্তুসাপেক্ষ হওয়াও তার পক্ষে সম্ভব নয়। কবি তার পরিমিত আবেগে, পূর্ণাঙ্গ জীবনবীক্ষণে এর সমন্বয়ে একটি রোমান্টিক রুচির জন্ম দেবেন। এই রোমান্টিকতার পরতে লুকিয়ে থাকবে কবিমনের প্রেম-অপ্রেম, সুন্দর-অসুন্দরের ভাবনা। কবির মনোভূমির এ রসাসিক্ত অনির্বচনীয়তা বোধেরই কাব্য। কবি স্টিফেন স্পেন্ডার কিংবা মালার্মের- যাই বলি কবিতা বিচারে কবি মনোভূমির বাইরে আসলে কিছুই নেই।

কবিতায় আধুনিকতা বিচার বা আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনা কিভাবে কিংবা কোনটা আধুনিকতা বা অনাধুনিকতা সেটা নিরূপণ করা বিপজ্জনক। বাংলাদেশের কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে এ প্রশ্নটি অনিবার্যভাবে এসেও যায়। কবিতার চেহারা, কাব্যবোধের মাত্রা যেমন বিচিত্র তেমনি বহুমাত্রিকতারও। তবে বাংলা কবিতার ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে এমনটা বলা চলে, তরুণ কবি সমাজের লেখা যে কবিতা যথাসম্ভব রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত; প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী চলমান সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কে যে কবিতা পূর্ণমনস্ক এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকরণে যা নব্যতন্ত্রী তাই আধুনিক বাংলা কবিতা। এই লক্ষণগুলো আধুনিক বাংলা কবিতাকে কমবেশি নির্মাণের প্রয়াস পেয়েছে। রবীন্দ্র প্রভাবের উল্লিখিত যুগেই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) এবং কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), জসীমউদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬) আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত চেতনায় তাদের মননধর্মকে বাংলা কবিতায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। মোহিতলালের জীবনবাদী ভাবনা, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বস্তুভাবনা, যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদী চেতনার মধ্যে নজরুল ধর্মনিরপেক্ষ যুগভাবনায় গণসংবেদ্য বাণী,

জসীমউদ্দীনের পল্লীর ঐতিহ্য নিয়ে বাংলা কবিতায় নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটান। ফলে আধুনিক বাংলা কবিতার প্রসারতা যেমন দ্বিধামুক্ত হলো তেমনি একটা নতুনতর উদ্ভাবনায় তা রবীন্দ্রবলয় অতিক্রম করে। তবে সন্দেহাতীতভাবে এটা সত্য এমনটি বোধকরি সম্ভব হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কাব্যসত্তার দৃঢ়ভিত্তির কারণেই।

আধুনিক বাংলা কবিতার সূত্রপাতের নান্দীপাঠকেরাই সবচেয়ে ফলবান, তাঁদের তুল্য সিদ্ধি উত্তরকাল আজো অর্জন করতে পারেনি। শব্দের পবিত্র শিখা নিয়ে অতন্দ্র সাধনায় তাঁরা ঈর্ষাময়ী কবিতার ধ্যান করেছিলেন। তাঁরা কবিতার আদর্শ ও আবহাওয়া বদলে দিয়েছেন, পাঠক তৈরি করেছেন, সমালোচনার সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে রচনা করেছেন কিছু অনবদ্য পদাবলি- এমন কিছু পদাবলি যার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলার অর্থ কবিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই প্রশ্ন তোলা।

আধুনিক বাংলা কবিতাকে চিরাচরিত আবেগ থেকে মুক্তিদানের প্রথম প্রয়াস চালিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪)। রবীন্দ্র সাহিত্যের দোর্দন্ড-প্রতাপের মধ্যে তিনি সাহিত্যকর্ম শুরু করেও রবীন্দ্র নিগড় থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর সেদিক দিয়ে তিনি নজরুল ও তিরিশের কবিদের পূর্বসূরিত্বের দাবিদার। দুঃখবাদী কবি বলে খ্যাতি অর্জন করলেও তিনি ছিলেন সমাজসচেতন ও মানবতাবাদী কবি। তাঁর দুঃখের সূতিকাগার ছিল মানবপ্রেম। মানুষের দুঃখ-বেদনা সামাজিক অবিচার ও বৈষম্যে তাঁর কবি হৃদয় হাহাকার করে উঠেছিল। বাংলা কাব্যকে অবাস্তব কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে তাঁকে একজন পথিকৃৎ বলা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরে তিনিই মনে হয় প্রথম কবি যিনি সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর জয়গান গেয়েছেন। যতীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন যুক্তিবাদী ও মননশীল লেখক; সমাজ ও সমকাল তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু। ভাষার মধ্যে তর্ক, কটাক্ষ ও প্রচ্ছন্ন

পরিহাস তাঁর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। দর্শন ও বিজ্ঞান উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি ছিলেন দুঃখবাদী, আর এই দুঃখবাদ তাঁর কাব্যের মূল সুর। প্রকৃতি ছলনাময়ী, জীবন দুঃখময়, সুখ অনিত্য ও ক্ষণিকের এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি জগৎ-সংসারকে দেখেছেন। কোনোরূপ ভাববাদের বশবর্তী হয়ে নয়, বরং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও বাস্তব পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি দুঃখ ও নৈরাশ্যের চিত্র এঁকেছেন। আধুনিক বাংলা কবিতাকে চিরাচরিত আবেগ থেকে মুক্তিদানের প্রথম প্রয়াস চালিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। যিনি রবীন্দ্র সাহিত্যের দোর্দন্ড প্রতাপের মধ্যে সাহিত্যকর্ম শুরু করেও রবীন্দ্র নিগড় থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'দুঃখবাদী কবি' বলে খ্যাতি অর্জন করলেও তিনি ছিলেন সমাজসচেতন ও মানবতাবাদী কবি। তাঁর দুঃখের সূতিকাগার ছিল মানবপ্রেম। মানুষের দুঃখ-বেদনা সামাজিক অবিচার ও বৈষম্যে তাঁর কবি হৃদয় হাহাকার করে উঠেছিল। বাংলা কবিতার প্রবল রোমান্টিক যুগে জন্মগ্রহণ করেও, রোমান্টিক আবহে নিমজ্জিত থেকেও তিনি কবিতাকে বাস্তবতার কঠিন মাটিতে দাঁড় করাতে চেয়েছেন। দুই বাংলার বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে তাঁর বেশ কিছু কবিতা অন্তর্ভুক্ত করা আছে। পেশাগত জীবনে তিনি একজন প্রকৌশলী হিসেবে তাঁর বিজ্ঞানমনস্ক অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্যে সমাজ সচেতনতা কোন প্রক্ষিপ্ত বিষয় ছিল না। কাব্য রচনাকে তিনি মানবতাবাদের পক্ষে এক আন্দোলন হিসেবে নিয়েছিলেন। যে কারণে তার কাব্যগ্রন্থের নামের মধ্যেও একটি ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। তৎকালে সাধারণত বিখ্যাত কবিদের জনপ্রিয় কবিতার অনুকরণেই হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করা হতো। প্রাসঙ্গিক হওয়ায় কয়েকটি 'ব্যঙ্গ কবিতা' উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শরৎ' কবিতাটি অনুকরণ করে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'শরৎ' নামে কবিতা রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত 'শরৎ' কবিতাটি হলো-

'আজি কি তোমার মধুর মূরতি

হেরিনু শারদ প্রভাতে!

হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ

ঝলিছে অমল শোভাতে।..'

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর 'শরৎ' কবিতাটি নিম্নরূপ-

আজি কি তোমার বিধুর মূরতি

হেরিনু শারদ প্রভাতে!

হে মাত বঙ্গ, মলিন অঙ্গ

ভরি গেছে খানা ডোবাতে।..'

অতএব তিনি শুধু দুখিবাদি কবি নন প্রয়োজনে হাস্যরসও সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু তার কাছে বিশেষ ভাবে প্রেম,প্রকৃতি,নারী বিশুদ্ধ রকমের ফাঁকি ছাড়া কিছু না। সত্য শুধু অনন্ত যন্ত্রণা। ভগাবান কে আমরা লীলাময় বলি বটে কিন্তু তার কাছে এই নামে কেউ থাকলে সে নিদারুন স্বেচ্ছাচারী ও সীমাহীন নির্মম। তিনি নিরীহ মানুষ কে সুখের টোপে ফেলে নিদারুণ দুঃখে খেলিয়ে বেড়াচ্ছেন। এই রকম অ্যান্টিরোমান্টিক নৈরাশ্য পূর্ণ বুদ্ধিকেন্দ্রিক কবিতা লিখে তিনি চিন্তাশীল শিক্ষিত মহলে বেশ আলোড়ন তুলেছিলেন। আলোড়নের কারন শুধু বিষাদ বৈচিত্র নয় দুঃখবাদ নয়। বিষয় বস্তুতে তিনি যেমন শুষ্ক বুদ্ধিবাদী বাস্তব ব্যাপারের আমদানি করলেন। তেমনি রচনা ভঙ্গিমাতে মোটামুটি সনাতন রীতি অনুসরণ করলেও চলতি, অমসৃণ রূঢ় ধরনের শব্দ ব্যবহারে কিছুমাত্র কার্পণ্য করলেন না।অর্থাৎ কাব্যের পোশাকি সংস্কার ত্যাগ করে বিষয় রীতিতে একেবারে কঠোর জীবন রসের ধারা ধোলাই করে নিলেন। ফলে আবেগ প্রবন বাংলা কাব্য এই বুদ্ধিকেন্দ্রিক, যুক্তি পূর্ণ, ও চিরাচরিত সংস্কার বর্জিত কাব্যকবিতা পাঠক চিত্তে যে প্রবল চমক সৃষ্টি করেছিল তা এখন মুছে যায় নি। তিনি পৃথিবীতে শুধু দুঃখ আর নৈরাশ্য দেখেছেন বলেই দুঃখী বাদী কবি খেতাব পেয়েছেন। একদিক থেকে বুদ্ধিজীবী নিঃস্পৃহ ইংরেজ কবি জন ডান

(১৫৭৩-১৬৩১) এঁর সাথে তার বেশ সাদৃশ্য আছে।কিন্তু এই সাদৃশ্য তার ইচ্ছাকৃত নয়। অবশ্য একটু ভেবে দেখলে তার অভিনব মতবাত কে খুব মৌলিক বলে মনে হবে না। অনেক সময় নিছক দুঃখ বাদ তার সমস্ত সত্তার সঙ্গে মিলিয়ে যায় নি। মুখোশ যেমন মুখোশ কে ঢেকে রাখলেও মুছে ফেলতে পারে না, তেমনি কবিও দুঃখী বাদী মুখোশের দ্বারা নিজ স্বভাব সিদ্ধ কবি ধর্ম কে পুরোপুরি আড়াল করে রাখতে পারেননি। গড়ার দিকে তিনি তাল ঠুকে দুঃখী বাদ কে তুলে ধরেছেন, তিনি অসংগত নৈরাশ্যবাদি হলেও নিরীশ্বর বাদী নন। তার ঈশ্বর এক নির্মম শক্তি। তিনি কবির বন্ধু কিন্তু বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর প্রেম পিরিতির সম্পর্ক নয়। শুধু আঘাতের সম্পর্ক। কবি যত ব্যাথা পান ততই দুঃখের দেবতাকে আঁকড়ে ধরতে চান। এই আসক্তির আকর্ষণ থেকেই তিনি উত্তর জীবনে দুঃখ নৈরাশ্যের জগত ছেড়ে আবার প্রেমপ্রীতির জগতের আলোক রেখা দেখতে পেলেন। যার আভাস ‘সায়ম’ ‘ত্রিযামা’ ও ‘নিশিকান্তা’য় পাওয়া যায়। ‘মরু’ আখ্যা যুক্ত দুঃসহ উত্তপ্ত কাব্য মণ্ডল ছেড়ে তিনি সায়াহ্ন, রাত্রি ও রাত্রি প্রভাতের শান্ত। বিষণ্ণ ও নব আশার অরুনদয় লাভ করলেন। সুতরাং তাকে বিশুদ্ধ দুঃখবাদী কবি বলা যায় না। কারন শেষ জীবনে তার কবিতা থেকে যুধ্যমান দুঃখ বাদের হুঙ্কার বিদায় নিয়েছে। সেখানে চিরচারিত প্রেম অ প্রিতিই উঁকি দিয়েছে। এজন্য কেউ কেউ একটু তীব্র ভাবেই বলেন যতীন্দ্রনাথ এঁর তাথাকথিত দুঃখবাদ এক ধরনের ‘পোজ’ বা কৃতিম সংস্কার মাত্র। কিছুদিনের মধ্যেই যা খসে পড়েছে। সে যাই হোক ১৯৩০ সাল থেকে রবীন্দ্র প্রভাবের পরিমণ্ডল ছেড়ে যে সমস্ত নবীন কবি নতুন প্তহে যেতে চেয়েছিলেন তাঁদের অগ্রজ হিসাবে যতীন্দ্রনাথের নাম স্মরণীয়। পূর্বে আলোচিত কবিতা গুলি বাদে আরো কয়েকটি যতীন্দ্রনাথের দুঃখ বিষণ্ণতা ও নৈরাশ্যের ইঙ্গিতবহ দুই চার ছত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল-

হাট

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

দূরে দূরে গ্রাম দশ-বারোখানি, মাঝে একখানি হাট,

সন্ধ্যায় সেথা জ্বলেনা প্রদীপ, প্রভাতে পড়ে না ঝাঁট।

বেচা কেনা সেরে বিকেল বেলায়

যে যাহা সবে ঘরে ফিরে যায় ;

বকের পাখায় আলোক লুকায় ছাড়িয়া পুবের মাঠ ;

দূরে দূরে গ্রামে জ্বলে ওঠে দীপ --- আঁধারেতে থাকে হাট।

নিশা নামে দূরে শ্রেণীহারা এক ক্লান্ত বকের পাখে ;

নদীর বাতাস ছাড়ে প্রশ্বাস পার্শ্বে পাকুড়-শাখে।

হাটের দোচালা মুদিল নয়ান,

কারো তরে তার নাহি আহ্বান,

বাজে বায়ু আসি বিদ্রুপ-বাঁশি জীর্ণ বাঁশের ফাঁকে ;

নির্জন হাটে রাত্রি নামিল একক কাকের ডাকে।

দিবসেতে সেথা কত কোলাহল চেনা-অচেনার ভীড়ে ;

কত না ছিন্ন চরণচিহ্ন ছড়ানো সে ঠাঁই ঘিরে।

মাল চেনাচিনি, দর জানাজানি,

কানাকড়ি নিয়ে কত টানাটানি ;

হানাহানি ক'রে কেউ নিল ভ'রে, কেউ গেল খালি ফিরে।

দিবসে থাকে না কথার অন্ত চেনা-অচেনার ভিড়ে।

কত সে আসিল, কত বা আসিছে, কত না আসিবে হেথা ;

ওপারের লোক নামালে পসরা ছুটে এপারের ক্রেতা।

শিশির-বিমল প্রভাতের ফল,

শত হাতে সহি' পরখের ফল---

বিকাল বেলায় বিকায় হেলায় সহিয়া নীরব ব্যথা।

হিসাব নাহি রে---এল আর গেল কত ক্রেতা-বিক্রেতা।

নূতন করিয়া বসা আর ভাঙা পুরানো হাটের মেলা ;

দিবসরাত্রি নূতন যাত্রী, নিত্য নাটের খেলা

খোলা আছে হাট মুক্ত বাতাসে

বাধা নাই ওগো---যে যায় যে আসে,

কেহ কাঁদে, কেহ গাঁটে কড়ি বাঁধে ঘরে ফিরিবার বেলা।

উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে চিরকাল একই খেলা॥

ত্রিশোত্তর কবি হিসেবে পরিচিত জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তী ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পাশ্চাত্য অনুসঙ্গে বাংলা ভাষায় কলাকৈবল্যবাদি কবিতা রচনা করে নিজস্ব অস্তিত্বকে করেছেন অনুরণিত। ঐ কালপর্বে গণজাগরণের ঐক্যে বিভেদের ফলে সামাজিক অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে; সমাজসচেতন কবিরা আশ্রয় গ্রহণ করেন রোমান্টিক স্বপ্নলোকে। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর ২য় পর্বের বৈচিত্র্যপূর্ণতায় হয়ে ওঠেন গভীর দু:খবাদি।

পাষাণ পথে

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

জ্যৈষ্ঠ দুপুরে শ্রেষ্ঠ শহরে পথ চলি আর ভাবি-

কত না বকুল দিল তার ফুল মিটাতে নরের দাবি।

কত না বকুল দিল তার ফুল, কত ফুল দিল গন্ধ!

দেবে নেরে মিলে ফুলের কপালে লেখে দিল সেবানন্দ।

ঘ্রানলোলুপের করে প্রাণ সঁপা,- সেই তো পরম সুখ,

ফুলজীবনের পরম স্বর্গ মিলন মথিত বুক!

যদি সে মোক্ষচায়,-

ভক্ত জনের অঞ্জলিপুটে লুটাক দেবতাপা'য়!

নির্যাতনের যতনে ভুলায়ে এইমত বারোমাস

ভক্তিবিলাসী বিলাসভক্তে চালায় ফুলের চাষ।

প্রতি সন্ধ্যায় কোতি কুসুমের অকাল মরণ বাতি',

ঘরে ঘরে নামে খাঁটি স্বর্গীয় প্রেমের কামারু রতি।

ভোরের ভক্ত গুন গুন গাহি' বোঁটা হতে ছিঁড়ি ছিঁড়ি',

চন্দন বাঁটি' ফুলে ফুলে আঁটি' গাঁথে স্বর্গের সিঁড়ি।

এত শোভা এত মধু এত বাস বিফলে কেন বা যাবে?-

-অবলা ফুল যে কি বলিতে ফুটে, সে কথা কে কোথা ভাবে?

পাষাণ পথের বকুল গন্ধে সহসা লাগিল হাঁফ,-

বুঝিনু,- এ চির প্রবঞ্চিতের মর্মের অভিশাপ!

ফুলের গন্ধ নাই, নাই, ভাই,- কোল্লের ব্যথা যত

কঠিনের বুকে বিফলে ঘা দিলে লাগে গন্ধেরই মত।

বিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক, উপমহাদৈশিক ও দেশীয় রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি ও সামাজিক সংস্কার প্রভৃতির ঘূর্ণাবর্তে যে জটিল জঙ্গমতা সৃষ্টি হয়েছিল উনিশ শতকের চেতনা-স্নাত হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) তার মর্ম পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপনিষদ-পরিশ্রুত মাঙ্গলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সেইসব ঘটনা যেভাবে এবং যে-শৈলীতে ধরা পড়েছে, জীবন-যাপনের যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট উপনিবেশিত জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তার দূরত্ব ছিল বিস্তর। দর্শনগত এ-দূরত্ব রবীন্দ্র-সমকালীন কোনো কোনো কবি তাঁদের কবিতায় ধারণ করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবেগ-উচ্ছ্বাসের দূরবর্তী সীমাবদ্ধ শৈলীকে অবলম্বন করে সমকালীন কাব্য-রন্নচিতে অনভ্যস্ত বিষয়-আশয় নিয়ে প্রমথ চৌধুরী রচনা করেছেন সনেট। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর কবিতায় উপজীব্য করেছেন রঙ্গ-ব্যঙ্গ-পরিহাস ও স্যাটায়ারকে। মোহিতলাল মজুমদার তাঁর কালাপাহাড়ী শক্তিমত্ততায় চুরমার করতে চেয়েছেন সমাজের প্রথাগত বোধ ও বিশ্বাসকে। অন্যদিকে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত জীবন-যাপনের রাজপথ থেকে অলিগলি সর্বত্রই পেয়েছেন দুঃখের ছোঁয়া। ফলে তাঁর কবিতার কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে ওঠে নঞর্থকতা। এ কথা

এখন সর্বজন জ্ঞাত যে, বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি সৃষ্টির পশ্চাতে যাঁদের চিন্তার সারাৎসার, দূরদর্শী পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয় সক্রিয়তা সক্রিয় ছিল কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন তাঁদেরই একজন। ফলে তাঁর জীবনাভিজ্ঞতার প্রতিফলন অন্য-রকম উত্তাপ ও ঔজ্জ্বল্য নিয়ে বাংলা সাহিত্যকে চমকিত ও চমৎকৃত করতে পারল। নজরুল ইসলামের মানসিকতায় নানা রকম প্রবণতা সমাহৃত ছিল। তা তাঁর কবিতায় যথাযথভাবে প্রক্ষেপিত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রতি অসাধারণ মমত্ববোধ, সাম্যবাদের প্রতি সৃদৃঢ় আস্থা, মনুষ্যত্বের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস তাঁর কবিতায় যে-বলিষ্ঠতা সঞ্চারিত করেছে, স্বরায়নে যুক্ত করেছে যে তারস্বর_ বাংলা কবিতার আবেগায়িত নমনীয় কাব্যভাষার পরিপ্রেক্ষিতে একান্তই আকস্মিক ও অভূতপূর্ব। আকস্মিক, কিন্তু তাৎপর্যরহিত নয়। ত্রিশের দশকে বাংলা কবিতার আসরে আবির্ভূত হয়েছিল এক ঝাঁক তরুণ কবি, বাংলা কবিতার সমকালীন প্রসঙ্গ ও প্রকরণে যাঁরা আত্মার আহার খুঁজে পাননি। এমনকি সমকালীন কাব্যকে তাঁরা গণমানুষের যুগোপযোগী জীবন-ভাষ্যের প্রতিফলন হিসেবে মেনে নিতে পারেননি। উপনিষদ-প্রভাবিত রবীন্দ্র-দর্শনের মাঙ্গলিকতা বিপর্য্যস্ত পারিপার্শ্বিক ও বিধ্বস্ত মানবচৈতন্যের নির্যাসকে ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে মনে করে তাঁরা রবীন্দ্র-চৈতন্যকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন। ত্রিশোত্তর কবিদের কাব্য-পর্যালোচনা করলে এ কথা সহজেই বোঝা যায় যে, তাঁদের সিদ্ধান্ত অভিন্ন হলেও তা সমবেত চিন্তার ফসল ছিল না। যাঁদের আমরা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পঞ্চকবি বলি, তাঁদের নিজস্ব শিল্প-ভাবনার মধ্যে দূরত্ব দুর্লক্ষ নয়। তবে একটি ব্যাপার বিশেষভাবে চোখে পড়ে, রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে অস্বীকারের অভিপ্রায়ে তাঁরা বিশ্বসাহিত্যের মুখাপেক্ষি হয়েছিলেন। এ-রবীন্দ্র-পরাঙ্মুখতা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকেনি। এমনকি তাঁদের বিশ্বসাহিত্য-অভিমুখিতাও ছিল মুখ্যত ইউরোপকেন্দ্রিক। বিশেষভাবে, ইয়েটস, এলিয়ট, এজরা পাউন্ড প্রমুখের প্রতি সেসব কবির প্রভাবের কথা আমরা জানি। তাঁদের সঙ্গে জেমস

জয়েস, ইউজিন ও'নীল, লুইগি পিরান দেলেল্লা প্রমুখের প্রভাবও ছিল। লেখক কিংবা মানুষ নিজেকে কী রূপে চিনতে চায়, চেনাতে চায়? কোন স্বরূপকে বলতে চায় তার আত্মপরিচয়? সার্বজনীন মানুষের কিংবা নির্দিষ্ট স্থান-কালের লেখকের স্বরূপটি কীভাবে নির্মিত হয়? এই সকল প্রশ্নের মুখে সহসা চিনে ফেলার ক্ষেত্রে যে সঙ্কটটি হাজির হয় তা হলো স্বরূপের সঙ্কট। আমরা যদি কোনো কিছুকে চেনার জন্য ঐ বস্তুটির, বিষয়টির স্বরূপ নির্ধারণ করতে না পারি তবে চেনার কাজটি হয়ে দাঁড়ায় দৃষ্টিহীনের আকাশ দেখার মতো। কারণ দৃষ্টিহীনের অভিজ্ঞতায় দৃশ্যের ধারণা থাকে না। যদি স্বরূপ ধারণা থাকে তবে বাতাসেও পাহাড় দেখা যায়। সুতরাং প্রথমত পাহাড় স্বরূপ ধারণা তৈরি হতে হয় অভিজ্ঞতায়। তবে মানুষের 'স্বরূপ' ধারণাটি কী? যদিও এই 'স্বরূপ' শব্দটি দিয়ে কোনো কিছুর গাঠনিক, অবয়বগত কিংবা অভিজ্ঞতাজাত প্রতিভাসমূলক ধারণায়িত মানকে বোঝানো যেতে পারে। কিন্তু, মানুষের যে জৈব-শারীরিক গঠন, এই গাঠনিক অস্তিত্বমান, বস্তুগত অবয়বকে তার স্বরূপ হিসেবে মানুষ নিজেই স্বীকার করে নি। তা না-করে বরং গুণগত, অধরা, ধারণায়িত সত্তাস্বরূপ কল্পনা করেছে, যা ধারণায় মূর্ত হলো না কোনো কালেই; আজও নয়। ফলে মানুষ যে নিজেকে চিনে ফেলবে তার নিজস্ব স্বরূপে, তার সেই ধারণারূপ অভিজ্ঞতা কই? আর এই স্বরূপ কেবল অভিজ্ঞতাতে, বোধে এলেই চলবে না, তার সংজ্ঞায়নও জরুরি হয়ে পড়ে, কেননা, মানুষ সকলকিছুকে ভাষাচিহ্নে রূপের মুকুরে দেখতে চায়, চিনতে ও জানতে চায়। মানুষ চায় তার ধারণায়িত অবয়বটি অন্যের বোধের ক্যানভাসে এঁকে দিতে, অন্যের অভিজ্ঞতার মুকুরে নিজেকে বিম্বিত করে চিনতে চায়। ফলত, এর ভাষাগত সংজ্ঞায়ন জরুরি, এর অবয়বগত ধারণার আন্তব্যক্তিক অভিব্যক্তি কিংবা সামাজিক যোগাযোগে একটি সামাজিক অবয়ব তৈরি করতে।বিশশতকের তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি দেখা দেয় আধুনিক কবিতা। এ-কবিতার মধ্যদিয়েই বিশশতক প্রবেশ করে বাঙলা সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথের

কবিতার পর আধুনিক কবিতায়ই প্রকৃত অভিনব সৃষ্টি বাঙলা সাহিত্যে। মূল্যবানও বটে। এরচেয়ে মূল্যবান আর কিছু সৃষ্টি হয় নি বিশশতকের বাঙলা সাহিত্যে। আধুনিক কবিতা ও এর আগের কবিতার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। এখানেই যতীন্দ্রনাথ-এর কবিতা বদলে দেয় বাঙালির চেতনা। দেখা দেয় নতুন জটিল বিস্ময়কর শোভা। বিশশতকের প্রাণ ধরা পড়েছে এ-কবিতায়। এর আগের কবিতা পড়ে বুঝতে, অন্তত তার অর্থ বুঝে উঠতে পারে যে-কোনো সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি। কিন্তু এ কবিতা তাঁদের কাছে মনে হবে দুরূহ-দুর্বোধ্য। এর আগের কবিতা প্রধানত রোম্যান্টিক কারণ তখন প্রাধান্য বিস্তার করে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ওই কবিতায় শব্দগুলো কঠিন নয়, ভাবও দুরূহ নয়। অধিকাংশ কবিতায়ই প্রকাশ পেয়েছে এমন বক্তব্য, যার মোটামুটি সারাংশ করা কঠিন নয়। ওই সমস্ত কবিতায় বাঙালির প্রথাগত আবেগ, স্বপ্ন, সুখদুঃখ, কাতরতা ও বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আধুনিক কবিতা তার পুরোপুরি বিপরীত। এ কবিতায় বদলে যায় ভাব, বদলে যায় ভাষা। বিশ্বাস, শান্তি, সুন্দর, কল্যাণ প্রভৃতির কথা বাঙলা কবিতায় বড়ো বেশি বলা হয়েছে। আধুনিক কবিরা বাদ দেন সে-সব জিনিশ। আগের কবিতার বাঙলা ছিলো পল্লীবাঙলা। আধুনিক কবিরা বেছে নেন নগরকে; রচনা করেন তার সুন্দর-অসুন্দর চিত্র। তিনি ক্লান্তির কথা বলেন, অবিশ্বাসের কথা বলেন, নিরাশার কথা বলেন। তিনি বলেন ব্যক্তিগত যন্ত্রণা ও নৈঃসঙ্গের কথা, প্রকাশ করেন বিভিন্ন রকমের কামনাবাসনা। এসব কথা বলেন এক ভিন্ন ধরনের বাঙলা ভাষায়। সে-ভাষা জটিল, দুরূহ। ছন্দ বদলে দেন এবং ছন্দের বদলে কবিতা লেখেন গদ্যে। কবিতায় তারা খচিত করেন মননশীলতা। বাঙলা ভাষার আগের কবিরা আবেগকেই কবিতা ভাবতেন। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আবেগকে শশাধিত করেন মননশীলতা দিয়ে। তিনি অসামান্য শিক্ষিত কবি। নতুন কবিতা সৃষ্টির জন্যে তিনি ছুটেছেন বিদেশি কবিতা থেকে কবিতায়। ইংরেজি, ফরাশি, জর্মন কবিতা থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন প্রেরণা; এবং জ্ঞানের

বিভিন্ন শাখা থেকে শিখেছেন তিনি অনেক কিছু। স্বাভাবিক প্রতিভা ও অধীত জ্ঞানের মিলনে সৃষ্টি হয়েছে তার কবিতা।

প্রতিটি শতক বা শতাব্দীর থাকে নিজস্ব চেতনা। উনিশশতকের নিজস্ব ভালো লাগা মন্দ লাগা ছিলো, নিজস্ব আবেগঅনুভূতি, স্বপ্ন, চেতনা ছিলো। তার প্রকাশ ঘটেছে ওই শতকের সাহিত্যে। একটি শতক কেটে গিয়ে যখন আসে আরেকটি শতক, তখন নববর্ষের মতো রাতারাতি নতুন চেতনার উন্মেষ-বিকাশ ঘটে না। নতুন শতকের এক বা দু-দশক। ধরে জীবনে ও সাহিত্যে রাজত্ব করতে থাকে পুরোনো শতকেরই চেতনা। তারপর এক সময় প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তার বিরুদ্ধে। হয়তোবা দেশে বা বিশ্বে ঘটে কোনো বড়ো ঘটনা, যা প্রবলভাবে আলোড়িত করে জীবনকে। তখন সাহিত্য ও শিল্পকলায় নতুন চেতনা অভিনব রূপ ধরে দেখা দেয়। ইউরোপে উনিশশতকের শেষ দিকেই উনিশ শতকি চেতনার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু আমাদের দেশ প্রথাগত; পুরোনোকে আঁকড়ে থাকতেই আমরা ভালোবাসি। নতুনকে আমরা খুব ভয় করি। তাই প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে সময় লাগে। এ-কারণেই বিশশতক আসার পরও দু-দশক ধরে বাঙলা সাহিত্যে উনিশশতকের চেতনাই প্রকাশ পেতে থাকে। আর এই চেতনা থেকেই উঠে আসে যন্ত্রণা নৈরাশ্য বোধ যা বোঝাতে সাহায্য করে কবিতা বা জীবন শুধু প্রেমের আবেগ নয় আছে বেদনা আছে যন্ত্রণা আছে তীব্র কঠোর দুঃখের অনুভুতি। যতীন্দ্রনাথ কবিতায় পাঠকের মননকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উঠে এলো নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাত, ক্লান্তি, নৈরাশ বোধ, বস্তুবাদ, আত্ম বিরোধ , ঘরছাড়া মনভাব , বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের প্রতি সংশয় কবিতার মন – পরিবর্তন ও উদ্বেগ , প্রথাগত নীতি ধর্মে অবিশ্বাস , বাকরীতি ও কাব্য রীতির সংমিশ্রণ, দেহজ কামনা, বাসনা , প্রেমের শরীরী রূপকে প্রত্যক্ষ করা , শব্দ প্রয়োগ বা গঠনে মিতব্যয়ীতা ও অর্থ ঘনত্ব সৃষ্টির চেষ্টা, গদ্য ছন্দের ব্যবহার, অথবা একেবারে

ছন্দ মুক্তি ইত্যাদি...বিংশ শতকের যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিস্কার মানুষের বাস্তব জীবনে ও মানসজগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে শুরু করল... তারই রেশ ধরে একবিংশ শতকের মোবাইল দুনিয়ায় আন্তর্জাতিক পরিবেশ পরিস্থিতি , জীবন ,সম্পর্কের পরিবর্তন, বিশ্বায়ন , নেটওয়ার্কিং , তথ্য বিস্ফোরণ , দূষণ , বাজার অর্থনীতি র ক্রমবিকাশ ,মিশ্র সংস্কৃতি, রাজনৈতিক দ্বিধা দ্বন্দ্ব, ক্রমাগত সাহিত্য শিল্প কাব্য যেকোনো সৃষ্টিকে প্রভাবিত করতে শুরু করে... যতীন্দ্রনাথের লেখায় উঠে এলো সামাজিক ও মানবিক অবক্ষয়ের ছবি , সম্পর্কের শৈথিল্য , মূল্যবোধের অধগতি, বেকারত্ব , স্বপ্নবিলাস , হতাশা , দুঃখ, ক্ষোভে ফুটে উঠলো ক্রমশ একা হয়ে যাওয়া মানব মনের জটিলতর অনুভবের কবিতার আজকে যেমন কথা... আর সময়ের সঙ্গে সংস্কৃতির সংকটের সাথে সাথে বাংলা ভাষার ও সংকট কাল উপস্থিত... আমাদের সময়কার বেশিরভাগ লেখাতেই কেমন একটা ইংরেজায়নের ছাপ লক্ষ্য করা যায়... বিশুদ্ধ বাংলা বলে যেন কিছুই নেই... শ্রীজাত , পৌলমি , রূপম , অনুপম সবার লেখাতেই ইংরেজি শব্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় .....কবিতার জন্য তা কতটা মঙ্গলের জানা নেই তবে বাংলা ভাষার জন্য বোধয় নয়...তবে হয়ত তাঁরা প্রকাশ মাধ্যমের উপর গুরুত্ব না দিয়ে বিষয় ও প্রকাশভঙ্গীকেই বেশি জরুরী মনে করেন... রবীন্দ্রনাথ তাঁর Religion of an Artist বইতে এক জায়গায় বলেছেন যে - “No poet should borrow his medium ready made from some shop of orthodox respectability . He should not only have his own seeds but prepare his own soil.. Each poet has his distinct medium of language not because the whole language is of his own make, but because his individual use of it, having life’s magic touch, transforms it into a special vehicle of his own creation”।

মন্তব্য

বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে যেটা লক্ষ্য করা যায় সেটা হল উনিশ শতকের প্রথম থেকেই নতুন বাংলা কবিতার বিবর্তন ভাবনা চিন্তা বাংলা কাব্যের আদর্শকে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত করতে থাকে...অধ্যাপক আবু সায়িদ আইয়ুব তাঁর আধুনিক কবিতা সংকলনে বলেন ___ " কালের দিক থেকে ,মহাযুদ্ধ পরবর্তী, এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত, অন্তত মুক্তি প্রয়াসী , কাব্যকেই আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করা হয়"... বাংলা সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন যা পাওয়া গেছে চর্যাপদ ...তাও পদাবলী অর্থাৎ কাব্যের আঙিনাতেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জয়যাত্রা শুরু... পুরানো কাব্য ধারাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা কতক গুলো শাখা পাই যেমন ভারত চন্দ্র অনুসারী কবি গোষ্ঠী, রামায়ণ মহাভারত ও কৃষ্ণ ভক্তিমূলক রচনার ধারা , উপাখ্যান ও আখ্যায়িকা , রামনিধি গুপ্ত ও অন্যান্য কবির রচিত আখড়াই গানের ধারা, কবি ওয়ালা , পাঁচালী , রাম প্রসাদের অনুসারী গোষ্ঠী প্রভৃতি।এর পরবর্তী কালে ঈশ্বর গুপ্ত , রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় , মাইকেল মধুসূদন , হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীন চন্দ্র সেন , বিহারি লাল চক্রবর্তী , অক্ষয় কুমার বড়াল হয়ে দ্বিজেন্দ্র লাল রায় , কামিনী রায় , রবীন্দ্র নাথ প্রভৃতির হাত ধরে উনিশ শতকের কবিতার ক্রমবিবর্তন সংঘটিত হয়। এর পরের পারিপার্শ্বিক ঘটনার সূত্রপাত টানলে দেখা যাবে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে ,স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ভারতবাসীর মনে গনতান্ত্রিক চেতনাকে সংহত করেছে, রুশ বিপ্লবের সাফল্য বেশ কিছুটা বাস্তব দৃষ্টি খুলে দিয়েছে।শ্রম চেতনা ,অবহেলিতের প্রতি সহমর্মিতা , সমাজ গঠনের স্বপ্ন ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে থাকে সাহিত্যের পাতায়... যতীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত এর লেখনীতে নতুন মানবিকতার জয়গান শোনা যায় ... কল্লোল- কালি-কলম- প্রগতি ইত্যাদি কে কেন্দ্র করে যে কবিরা তাঁদের রচনা শুরু করেছিলেন তাঁরা আন্তরজাতিক ঐতিহ্য গুলির (ফ্রয়ডীয় মনোবিকার পন্থা , ভিক্টোরিয়ান মরালীটি , ইউরোপিয়ান সিম্বলিস্ট কাব্য, ইমাজিস্ট, ও সমাজবাদী কাব্য সাহিত্যের) অংশীদার হয়ে রবীন্দ্র বিরোধিতার বড়াই করে এগিয়ে যান।মধ্য প্রাচ্য থেকে যতিন্দ্রীনাথ নবজাগ্রত উদ্যম কিছুটা দেখেছিলেন। বিশের দশকের নবজাগ্রত গনতান্ত্রিক চেতনা ও সাম্যবাদই জতিন্দ্রনাথের নৈরাশ্য চেতনার ভিত্তি তৈরি করেছিলো।সংকট পীড়ায় ক্ষুব্ধ

এই সময় যে উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছিল তাতে যতীন্দ্রনাথের কবিতাই মুখ্য স্থান নিয়েছিল।এরপর বুদ্ধদেব বসু , সুধিন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাস, আমিয় চক্রবর্তী , বিষ্ণু দে, সমর সেন হয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় , সুকান্ত ভট্টাচার্যের আবির্ভাব পর্যন্ত বাংলা কবিতার আমুল পরিবর্তন হতে থাকে।যদিও পরিবর্তনশীলতাই একমাত্র নিয়ম। বিংশ শতাব্দীতে উনবিংশ শতাব্দীর মুল্যবোধ গুলির বিরুধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা গেল... আধুনিক কবিরা যে মুহূর্তে উচ্ছ্বাস , অতিকথন বর্জন করে সেই পরিবর্তিত মূল্যবোধকে তাঁদের অধীত জ্ঞানসম্ভারের অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিমের সংস্কৃতি ও বহুপল্লবিত চিন্তাধারার নির্যাসের মাধ্যমে পাঠক কে পরিবেশন করলেন তখনি তা বোঝা হল সুকঠিন। প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশের আলঙ্কারিক রা বহুভাবে কাব্যের সংজ্ঞা নির্ধারণ করবার প্রয়াস করেছেন নিজেদের মত করে।বহুলাংশেই বিগত দিনের ও আজকের কবিতার মধ্যেও তার রূপ , রীতি , বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। সুতরাং তাদের ধারনার চিরন্তন বাস্তবতার দিকটি অগ্রাহ্য করলে চলেনা... এরপর আসি পাশ্চাত্তের কথা।খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় – চতুর্থ শতক থেকে প্লেটো , অ্যারিস্টটল প্রভৃতি দার্শনিকদের অনুকরনবাদের প্রভাব ই সাহিত্য ক্ষেত্রে সমাদৃত ছিল।সপ্তদশ শতকে রেনেসাঁসের কালে দেখা গেল ডেকার্টে , লকস, হবস, ড্রাইডেন, বেকন প্রভৃতি ব্যক্তিরা কল্পনা বৃত্তির কথাটি বড় করে তুললেন...অষ্টাদশ শতকের গোরার দিকে ইংরেজ সমালোচক এদিসন Essay on the pleasure of imagination প্রবন্ধে সাহিত্যে ‘কল্পনার আনন্দ’ মতবাদ তুলে ধরলেন,ওয়ার্ডসওয়ার্থ কাব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বললেন ‘ all good poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings’... সকল উৎকৃষ্ট কবিতাই শক্তি গর্ভ অনুভুতির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছলন... উনিশ শতকে টলস্তয় শিল্পের বিশেষ লক্ষণ এর কথা What is Art গ্রন্থে বলেছিলেন Art is communication... পাঠক পাঠিকার মনে অনুভব সঞ্চারিত করে দেওয়াই শিল্পের কাজ।ফরাসী বিপ্লবের পর ওখানে মানব মর্যাদা স্বীকৃতি পেতে শুরু করে... ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর বিপ্লবের ভাবধারা প্রবল হয়ে ওঠে ...সাহিত্যেও তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সাহিত্য যে জীবনেরই প্রকাশ, জীবনেরই সমালোচনা এই চিন্তার

উদ্ভাবন হয় এই সময় থেকে। ইংরেজ সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ড এর কবিতার সংজ্ঞায় পাওয়া যায় " poetry is at bottom a criticism of life; that greatness of a poet lies in his powerful and beautiful application of ideas to life__ to the question how to live."

ফরাসী বিপ্লবের বার্থতা জাত নৈরাশ্য , আশাভঙ্গ ,ক্ষোভ প্রভৃতি শিল্পী সাহিত্যিক দের এক নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে একেবারে নগ্ন বাস্তবকে , সত্যের উলঙ্গ মূর্তিকে শিল্পে সাহিত্যে উন্মুক্ত করার প্রবনতা থেকে জন্ম নেয় বস্তুবাদের।আর এই বস্তুবাদের জন্মই আধুনিক কবিতার ধারাকে অন্যপথে চালিত করবার রসদ নিয়ে আসে। জীবনক্ষেত্রে সত্যের উপলব্ধিকে প্রকাশ করার প্রক্রিয়াই শিল্পসাধনা। পূর্ণতার কামনা করা কিন্তু প্রাপ্তিতে অপূর্ণ থাকার মধ্যে যে আসক্তি এবং অসঙ্গতি রয়েছে সেটাকে আপনমতো উদযাপনের সংগ্রামই একজন জাত-শিল্পীর যাপনধর্ম, ভিন্ন ভিন্ন বিবেচনায় কখনও তা আত্মঘাতী কখনও বা অভীপ্সিত। এই স্বেচ্ছাচার, আত্ম-অভিঘাত কিংবা বর্বর মর্মপীড়ায় প্রকা- হিমবাহ গলে ফুলে ওঠে সমুদ্র, তবু তার-স্বরে উড়ে যায় শঙ্খচিল, অশ্রান্ত মেঘমালা। প্রকৃতির তাৎপর্যের মতোই শিল্পের নির্মাণকলা। অঙ্কুরের আকাঙ্খা হচ্ছে পূর্ণ-ফলনের, স্রোতের টান সমুদ্রে, আকাশ অসীমে বস্তুত সব কিছুই প্রসারমুখী। প্রতিটি ক্ষণকাল বৃত্তান্তই চিরকালে স্তূপ স্তূপ জমে আছে। কালের এবং উপযোগিতার স্থূলতাকে বাদ দিয়ে কলা-কীর্তির যা কিছু মহার্ঘ-নির্যাস থাকে, তাই উচ্চ-শিল্পের মর্যাদায় চিরকাল চর্চিত হতে থাকে। সুর, চিত্রকলা এবং কবিতা এই তিন কলাকর্মই উচ্চ-শিল্পের অধিগমনে অধিক সাবলীল। নাটক, নৃত্য, আবৃত্তি, চলচ্চিত্রসহ প্রদর্শন-শিল্পের অপরাপর অনুষঙ্গসমূহে অধিচৈতন্য (ইনটিউইশন) ততোধিক প্রয়োগযোগ্য নয় যতটা সহজ কবিতা ও চিত্রশিল্পে , কেননা দ্রুত পালাবদলের চঞ্চলতা ওই ধারাসমূহকে প্রভাবিত করে চলে এমনকি কথকতা কিংবা চরিত্র চিত্রণের চটুলতা থেকে শিল্পী অনেক সময় নিজেও মুক্তি পেতে পারে না। যদিও শেক্সপিয়ার, বার্নাড শ, ব্রেখট, ব্যাকেট, ইবসেন, হেরল্ড প্রিন্টারসহ আরও কতক মহৎ নাট্যকার আছেন যাঁদের নাটক উচ্চ-শিল্প মানে উত্তীর্ণ এবং বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে সমাদৃত। আমাদের লক্ষ্য সঙ্গীত,

নাটক বা চিত্রকলা নয়; কবিতা এবং বাংলা কবিতার পালাবদল ও নির্ণীত, অনির্ণীত নির্দেশ সম্পর্কে দু'কথা বলেই বিদায় দেব। ইংরেজী রোমেন্টিক কবিতার অন্যতম সারথি একমত - 'উৎকৃষ্ট শব্দের উৎকৃষ্ট পদবিন্যাস কবিতা'। এ্যারিস্টটল মনে করতেন।'কবিতা দর্শনের চেয়ে বেশি, ইতিহাসের চেয়ে বড়।' কবিতা কী সে সম্পর্কে এমন ভিন্ন ভিন্ন বহু মত থাকলেও কোন মন্তব্যই আসলে চূড়ান্ত নয়। তবে বোধ করি অনুভূতি যখন হৃদয়কে স্পর্শ করে তার নিপুণ শব্দনিব্যাস কবিতা। প্রায় সবটুকু লাল এখনও অন্তরীণ গোলাপের শীর্ষবিন্দুর ওই সৌন্দর্যটুকু কবিতা। চিতল হরিণী তার দ্রুতগামী ক্লান্তির শেষযামে যখন প্রস্রবনে পিপাসায় মুখ নামায় সেই জলপান-শব্দ কবিতা। মানুষের হাজার বছরের নুয়েপড়া ইতিহাস, বুকফাটা মাতম, ধসেপড়া সভ্যতার প্রত্ন-নির্যাস, বিরহীর আশাহত অশ্রুব্যঞ্জন আর শ্রান্ত-স্বেদবিন্দুর কলরোল কবিতা। বাংলা কবিতার ইতিহাস হাজার বছরের, হাজার বছরের নানা ধরন ও পরিবর্তন শেষে প্রথম আধুনিকতার ছোঁয়া লাভ করে মাইকেল মধুসূদনের হাতে; এই ছোঁয়া তাঁর অমিত্রাক্ষর প্রবর্তন, মহাকাব্য রচনা বা সনেট আমদানির জন্য নয়। বরং দেব-দেবী, হিরে-জহরত ছেড়ে মানুষের মাঝে বসে, মানুষের মতো বেদনায়, পীড়ায় ও আত্মদহনে উচ্চারণ প্রক্রিয়ার প্রারম্ভকরণের।

'বিশ্বের ক্রন্দন বিচলিত নারায়ণ, আঁখি তাঁর আশ্রুতে ভরিল,-
গোলোকে হল না ঠাই, শিব জটা বাহি তাই শতধারা ধরণীতে ঝরিল।
হিম গিরি নির্ঝরে তোমার জীবন গড়ে,- মিথ্যা মা, মিথ্যা এ কাহিনী;
যুগে যুগে নর-নারী অফুরান আখিবারি পুষ্ট করিছে তব বাহিনী,
তব তীর ধীর বায়ু হরিল কত না আয়ু, কত আলো স্রোত জলে মিলালো,
ভরি তব ভাঙা পাড়, কত কোটি হাহাকার ভাঙা মুখ রাঙা আঁখি ঘুমালো। (গঙ্গা স্তোত্র)।

৩.২-সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১- কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কত সালে জন্ম গ্রহণ করে?

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের জন্ম ১৮৮৭ সালে।

মন্তব্য

২- কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কত সালে মৃত্যু বরন করেন?

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ১৯৫৪ সালে মৃত্যু বরন করেন।

৩- তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ কি?

তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ হল মরীচিকা (১৯২৩)

৪- তাঁর অন্তিম কাব্য গ্রন্থ কি?

তাঁর অন্তিম কাব্য গ্রন্থ হল নিশান্তিকা (১৯৫৪)।

৩.৩-অনুশীলনী প্রশ্ন

১- কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। এবং তাকে দুখিবাদি কবি বলার কারণ কি?

৩.৪-গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,

কাব্যসাহিত্যের রূপ রেখা- অমল দাস।

মন্তব্য

একক-৪ যতীন্দ্রনাথ ও ভারতী পত্রিকা

বিন্যাস ক্রম

৪.১ বাংলা পত্রিকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

৪.২ ভারতী পত্রিকা

৪.৩ রবীন্দ্রসমকালীন কবি যতীন্দ্রনাথের কবিতা তৎকালীন সমাজ চিত্র

৪.৪ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

৪.৫ অনুশীলনী প্রশ্ন

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ বাংলা পত্রিকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

কোন সময়ের মাসিকপত্র এবং তাতে প্রকাশিত রচনা সে সময়ের সমাজ ব্যবস্থা, প্রচলিত আইন ও আচরিত রীতি-নীতির একটা প্রতিচ্ছবি। এ ছাড়াও অন্যান্য বিষয় যেমন, কাঠ-খোদাই ও ধাতু-খোদাই ব্লকের সাহায্যে পত্রিকার চিত্রায়ন ও অলঙ্করণ, ভাষার বিবর্তন, সময়ের সঙ্গে লেখক ও পাঠকবর্গের রুচি ও মানসিকতার পরিবর্তন ইত্যাদি অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিষয় এবং এগুলি সম্বন্ধে জানতে হলে সমকালীন সাময়িকপত্রের মত এত গুরুত্বপূর্ণ,তথ্যসমৃদ্ধ ও যথার্থ মাধ্যম আর একটিও নেই। বাংলা সাহিত্যের রূপদান ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে সাময়িকপত্র ও সংবাদ পত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম পুস্তকখানি ছিল একখানা 'ব্যাকরণ ও অভিধান'। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয়। তবে বাংলা ভাষার অক্ষর তখনও

তৈরী হয় নি। পর্তুগীজ বণিকেরা বাংলাদেশে ব্যাবসা করার তাগিদে বাংলা শেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। পর্তুগালের লিসবনে মুদ্রিত অভিধানটিতে বাংলা-পর্তুগীজ ও পর্তুগীজ-বাংলা দু'রকম শব্দ ভাণ্ডারই ছিল। পর্তুগীজরা এদেশের লোকের মুখে যে রকম ভাষা ও উচ্চারণ শুনতো, রোমান অক্ষরে সে রকমই ছাপা হয়েছিল বইটিতে। এর কিছু মনোগ্রাহী উদাহরণ দিযেছেন কেদারনাথ মজুমদার। যেমন, মুই যাইবাসছি (আমি যাইতেছি) রোমান হরফে ছাপা হয়েছে 'Moui Zeibasschee' অথবা মুহর খোওয়া দওয়া (আমার খাওয়া দাওয়া) রূপান্তরিত হয়ে হয়েছে 'Mouhore khoah dohah' ইত্যাদি। এদেশে তখনও বাংলা ছাপাখানা স্থাপিত হয় নি। এরপর মুদ্রিত হল হলহেড সাহেবের ব্যাকরণ। বইটির নাম A Grammar of the Bengali Language; ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে Sir Chirles Wilkins এটি প্রকাশ করেন। হুগলী থেকে বাংলা অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছিল এটি। পঞ্চানন কর্মকার নামক এক ব্যক্তি সে সময়ে মুদ্রণ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। উইলকিন্সের নির্দেশে তিনি কাঠের তৈরী বাংলা অক্ষর প্রস্তুত করেন। এ কাজে তিনি ছিলেন খুবই দক্ষ। প্রত্যেকটি অক্ষরের জন্য তিনি পাঁচসিকা করে নিতেন।

ভারতবর্ষে প্রথম সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল এই বাংলাদেশেই। হিকি (Hicky) ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি এটি প্রকাশ করেন; সংবাদ পত্রটির নাম ছিল 'বেঙ্গল গেজেট', হিকির গেজেট নামেও এটি পরিচিত ছিল। কিন্তু প্রকাশের পরেই গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর পরিবার সম্বন্ধে আপত্তিকর সংবাদ পরিবেশন করায় দু'বছরের মধ্যেই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'দিগ্দর্শন' নামে বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত বাংলা ভাষায় প্রথম মাসিক পত্রিকা শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন থেকে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এর ঠিক পরে ঐ বছরেই ২৩শে মে মার্শম্যানেরই সম্পাদনায় মিশন থেকে প্রকাশ লাভ করে বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র (সাপ্তাহিক) 'সমাচার দর্পণ'। ১৮১৮-এর জুন মাসেই বের হয় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের প্রকাশনায় বাঙালী পরিচালিত প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'বাঙ্গাল গেজেটি'। অতএব ১৮১৮

মন্তব্য

সালটি বাংলা মুদ্রণ ও সংবাদপত্রের ইতিহাসে একটি স্মরণযোগ্য বছর।

ইংরেজরা এদেশে শিক্ষা বিস্তারে মন দিয়েছিল যে সব কারণে তার মধ্যে একটি ছিল এদেশে মানুষের সঙ্গে মিশে তাদের অভাব অভিযোগ, সংস্কৃতি ও ধর্মবোধের সঙ্গে পরিচিত হওয়া; শাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এটির প্রয়োজনীয়তা ছিল। অপর একটি কারণ ছিল নিজেদের ধর্মমতের উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত করে ধর্মান্তরে উৎসাহ যোগানো। ইংরাজী ভাষা পড়তে এবং লিখতে পারে এরকম কিছু লোককে অফিসের কাজে নিযুক্ত করাও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। কারণ যাই হোক, এদেশে শিক্ষা বিস্তারে এবং মানুষকে বিজ্ঞান-মনস্ক করে তুলতে ইংরেজদের ইতিবাচক ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ইংল্যাণ্ড থেকে আগত সিভিলিয়ানদের এদেশের ভাষা ও রীতিনীতি শেখার উদ্দেশ্যে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ চালু হযেছিল। অন্য কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ধীরে ধীরে স্থাপিত হয়েছিল বিভিন্ন স্থানে। বাংলা সাহিত্য সে সময়ে মূলতঃ বাংলা সংবাদপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ধর্ম বা সামাজিক কোন বিষয়ে একটি পত্রিকায় প্রকাশিত মতামত কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য না হলে তারা অন্য একটি পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে নিজেদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হত। এ ধরণের বিতর্ক ও বিবাদকে কেন্দ্র করে বহু পত্রিকা জন্মলাভ করেছে। কিন্তু প্রকৃত সাহিত্য চর্চা ও তার প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় লেখক বা পাঠক গোষ্ঠী কোনটাই তখন গড়ে ওঠে নি। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে সব পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল এবং তখনও সচল ছিল সম্পাদকের নাম সহ তাদের কয়েকটি হল : সমাচার দর্পণ (১৮১৯), জে.সি.মার্শম্যান; সমাচার চন্দ্রিকা (১৮২২),ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; জ্ঞানান্বেষণ (১৮৩১), রামচন্দ্র মিত্র; সংবাদ পূর্ণোচন্দ্রোদয় (১৮৩৫), উদয়চন্দ্র আঢ্য ; সংবাদ প্রভাকর (১৮৩৬), ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত; সম্বাদ সৌদামিনী (১৮৩৮), কালাচাঁদ দত্ত; সম্বাদ ভাস্কর (১৮৩৯), শ্রীনাথ রায়; সম্বাদ রসরাজ (১৮৩৯), কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদি। এই সময়ের মধ্যেই অনেক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যেমন – রামমোহন রায়ের ‘সম্বাদ কৌমুদী', কৃষ্ণমোহন দাসের ‘সম্বাদ তিমিরনাশক',

প্রেমচাঁদ রায়ের ‘সম্বাদ সুধাকর', কালীশঙ্কর দত্তের ‘সম্বাদ সুধাসিন্ধু', রামচন্দ্র ও কৃষ্ণধন মিত্রের ‘জ্ঞানোদয়', রামচন্দ্র মিত্রের ‘পশ্বাবলী' ইত্যাদি।

সে সময়ে সাহিত্যপত্র হিসাবে আলাদা কোন পত্রিকা ছিল না। কিছু কিছু সাহিত্যাশ্রয়ী লেখা সংবাদপত্রতেও বেরোত এবং সেগুলিই সাহিত্যপত্রের কাজ করত। লেখকের সংখ্যাও ছিল কম; একই লেখককে বিভিন্ন বিষয়ে লিখতে হত। এ প্রসঙ্গে একটি পত্রিকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; সেটি হল ‘সংবাদ প্রভাকর'। এটি প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল (২৮শে জানুয়ারি, ১৮৩১) সাপ্তাহিক হিসাবে এবং পরে বারত্রয়িক (সপ্তাহে তিন বার) থেকে দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয় (১৪ই জুন,১৮৩৯)। এটিই ছিল বাংলা ভাষায় প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। সংবাদপত্র নাম হলেও এটিকে অনেকে সাহিত্যপত্র হিসাবেই চিহ্নিত করেছেন। 'সংবাদ প্রভাকর' সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন – “বাংলা সাহিত্য এই প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী। .... একদিন প্রভাকর বাঙ্গালা সাহিত্যের হর্তাকর্তা বিধাতা ছিল। প্রভাকর বাঙ্গালা রচনার রীতিও অনেক পরিবর্তন করিয়া যান ....।” লেখক তৈরীর ভূমিকাও পালন করেছে 'সংবাদ প্রভাকর'।

এরপর উল্লেখযোগ্য ‘তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা এটি প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট এবং প্রথম সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন এই পত্রিকাটি স্ত্রী-স্বাধীনতা, বিধবা বিবাহ, স্ত্রী-শিক্ষা ইত্যাদির পক্ষে এবং বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি কু-প্রথার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করে জনমত গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিল। আশি বছর ধরে পত্রিকাটি সমাজ সেবার কাজ চালিয়ে গিয়েছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকাশিত হয় ১৮৫১ সালের অক্টোবর মাসে – ‘বঙ্গদেশস্থ জনগণের জ্ঞানবৃদ্ধি হয় এমত ও আনন্দ-জনক প্রস্তাব সকল প্রচার করা' ছিল পত্রিকাটির উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথের ‘জীবনস্মৃতি'তে এর উল্লেখ রয়েছে।
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ‘সোমপ্রকাশ’ (১৮৫৮), যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের ‘অবোধবন্ধু' (১৮৬৩), উমেশচন্দ্র দত্তের ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’ প্রকাশিত হয়েছিল মেয়েদের কথা তুলে ধরতে এবং “বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের

জন্য" ছাপা 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪) নামক পত্রিকাটি ছিল মেয়েদের জন্য প্রথম কাগজ।

কিছু পত্রিকা অনেক বছর ধরে চলেছিল আবার কয়েকটি ছিল স্বল্পায়ু। উদয়চন্দ্র আঢ্যের 'সংবাদ পূর্ণোচন্দ্রোদয়',ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাচার চন্দ্রিকা' ৭০ বছরেরও বেশী পরমায়ু পেয়েছিল। ব্যবসায়িক কারণে অনেক পত্রিকা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি। পাঠকেরা অনেক সময়েই পত্রিকা নিয়ে গ্রাহক মূল্য পরিশোধ করতেন না। এই একটি কারণেই পরবর্তী কালেও অনেক পত্রিকার বিলুপ্তি ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় একজন সম্পাদক লিখেছেন -"ধন্য আমাদের দেশ। ধন্য আমাদের 'নেব দেব না প্রবৃত্তি'।" মন্তব্যটি বিশেষ করে প্রনিধানযোগ্য এই কারণে যে এথেকে বোঝা যায় মানুষের মূল প্রকৃতি ও মানসিকতা যুগের সঙ্গে অপরিবর্তিতই থেকেছে। অনেক সময়ে প্রকাশক ক্ষতি স্বীকার করেও পত্রিকা প্রকাশ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ততা ও সমাজকল্যাণের প্রেরণা তাদের উদ্বুদ্ধ করেছে পত্রিকা চালাতে। এ রকম একটি পত্রিকা হরিনাথ মজুমদারের 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'। এটি আত্মপ্রকাশ করেছিল এপ্রিল ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৭২ সালের ১২ই এপ্রিল প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'। পত্রিকাটিকে অনেকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পত্রিকা বলে মনে করেন। এই মূল্যায়ন সমর্থিত হয় রবীন্দ্রনাথের বিচারে – "বঙ্গদর্শনের পূর্ববর্তী ও তাহার পরবর্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা তাহা অপরিমিত। দার্জিলিঙ হইতে যাহারা কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরমালা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন, সেই অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের উদয়রবিরশ্মি-সমুজ্জ্বল তুষারকিরীট চতুর্দিকের নিস্তব্ধ গিরিপারিষদবর্গের কত উর্ধ্বে সমুত্থিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী বঙ্গসাহিত্য সেইরূপ আকস্মিক অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে; একবার সেইটি নিরীক্ষণ ও পরিমাণ করিয়া দেখিলেই বঙ্কিমের প্রতিভার প্রভূত বল সহজে অনুমান করা যাইবে"।

এই স্বল্প পরিসরের ভূমিকাতে প্রকাশনা সময়ের ক্রম বজায় রেখে বিশাল সংখ্যক সাময়িক পত্রিকার নামোল্লেখ করা উদ্দেশ্য নয়, সেটা সম্ভবও নয়। এ ধরণের গ্রন্থ

আগেই প্রকাশিত হয়েছে। তবে কয়েকটি পত্রিকার বিশেষত্ব উল্লেখ করা যেতে পরে। যেমন -

বাংলা ভাষায় ধর্ম বিষয়ক প্রথম পত্রিকাটি ছিল ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিভাষিক 'গসপেল ম্যাগাজিন'।

বিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম সাময়িকপত্র ‘বিজ্ঞান সেবধি’ ১৮৩২ সালের এপ্রিল মাসে Society for Translating European Sciences কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র ‘সংবাদ প্রভাকর'; প্রকাশনার তারিখ ছিল ১৮৩৯ সালের ১৪ই জুন।

চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধীয় প্রথম পত্রিকা ‘আয়ুর্ব্বেদ দর্পণ’ চাণক নিবাসী নারায়ণ রায় কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১৮৪০-এর জুন মাসে।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ'; প্রকাশিত হয় ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে।

প্রথম রঙ্গরসের পত্রিকা ‘বিদূষক' প্রকাশিত হয় ১২৭৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে।

মহিলা পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকা ‘অনাথিনী'-র প্রকাশ ১২৮২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে, সম্পাদিকা থাকমণি দেবী।

মহিলাদের জন্য প্রচারিত প্রথম মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার। প্রকাশিত হয় ১২৬১ বঙ্গাব্দের ১লা ভাদ্র,পত্রিকাটির নাম ছিল ‘মাসিক পত্রিকা'।

প্রথম আঞ্চলিক সংবাদপত্র ‘মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী’। কাশিমবাজার রাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আনুকূল্যে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে প্রকাশিত হয় পত্রিকাটি।

প্রথম কবিতা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা ‘কবিতাকুসুমাবলী’ ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালের মে মাসে; শুরুতে সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় ১৮৭৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত ‘বালকবন্ধু' ছিল প্রথম শিশু-পত্রিকা। তবে পত্রিকাটির প্রকাশনা ছিল অনিয়মিত এবং এটি ছিল স্বল্পায়ু। এ কারণে ১৮৮৩ সালের ১লা জানুয়ারি প্রকাশিত ‘সখা'ই ছিল

বালক-বালিকাদের প্রকৃত সখা। মাসিক পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন প্রমদাচরণ সেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সত্যপ্রদীপ' পত্রিকাটিকে অনেকে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম শিশুপাঠ্য পত্রিকা বলে চিহ্নিত করেছেন।বাংলা সাময়িকপত্র চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে প্রথমেই ঋণ স্বীকার করতে হয় কেদারনাথ মজুমদারের (১৮৭০-১৯২৬) কাছে। তার রচিত 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' গ্রন্থে ৪০টি সাময়িক পত্রের পরিচয় বাদ দিয়েও রয়েছে কয়েকটি মূল্যবান অধ্যায়। সেখানে তিনি যে সব বিষয় আলোচনা করেছেন তার মধ্যে রয়েছে – 'মিশনারি যুগের বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থ', 'কোম্পানির আমলে দেশীয় শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা','বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও বঙ্গসমাজ' ইত্যাদি। তার পরিবেশিত তথ্য থেকে সে যুগের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা এবং সময়ের সঙ্গে তার পরিবর্তন, উন্নতি ও বিকাশ সম্বন্ধে, বিশেষতঃ পত্রপত্রিকা ও মুদ্রণ সংক্রান্ত বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব।এর পরেই স্মরণীয় যে নামটি সেটি হল ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯১-১৮৫২)। সত্যানুসন্ধানী ও অসাধারণ অধ্যবসায়ী এই ইতিহাসবিদ পরম নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা সহকারে সাময়িক পত্রের যে পরিচয় গ্রন্থিত করে রেখে গিয়েছেন তা থেকেই আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর বেশ কিছু সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার সঙ্গে পরিচিত হতে পারি। তার অনুশীলন ছাড়া এ ধরণের বহু প্রকাশনার তথ্য ইতিহাস থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যেত। 'বাংলা সাময়িক পত্র' নামাঙ্কিত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে প্রায় ২৫০টি সংবাদ ও সাময়িকপত্রের বিশদ পরিচয় মেলে। ১৮১৮ থেকে ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বহু প্রকাশনার পরিচয় এতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে ৮৪২টি পত্রিকার নাম ও প্রকাশকাল, কিন্তু প্রথম খণ্ডের মত এতে পত্রিকার সম্বন্ধে অন্য কোন তথ্য বা আলোচনা পরিবেশিত হয় নি। এ কাজটি বা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দু'তিন দশকে প্রকাশিত পত্র পত্রিকার তথ্য সহ পরিচয় তিনি কেন গ্রন্থিত করে গেলেন না সেটা ভেবে দুঃখ হয়। ব্রজেন্দ্রনাথের সত্যনিষ্ঠা কিন্তু জানাতে ভোলে নি যে তার প্রদত্ত তালিকার বাইরেও কিছু পত্রিকা থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। তিনি উল্লেখ করেছেন –"আমাদের বিবরণে অসম্পূর্ণতা থাকা মোটেই বিচিত্র নহে।"

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (১৯০৫-১৯৯০) তার পত্রিকা গবেষণার ফল ধরে রেখেছেন

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে। এ ছাড়া রয়েছে একটি ৪২ পাতার ছোট বই 'শ্রীহট্টবাসী সম্পাদিত এবং শ্রীহট্ট ও কাছাড় হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র'।

সাময়িকপত্র চর্চার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম বিনয় ঘোষ। পাঁচ খণ্ডে রচিত তার 'সাময়িপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' গ্রন্থে সে কালের সমাজ ও সংস্কৃতির সামগ্রিক চিত্রটি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পরিবেশিত রচনা থেকেই আহরিত হয়েছে এই বিপুলাকার গ্রন্থের উপাদান।

বর্তমানে অনেকেই পুরানো সাময়িকপত্র সম্বন্ধে উৎসাহ দেখাচ্ছেন, বহু পরিশ্রম করে বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহে ব্রতী হয়েছেন। তাদের অধ্যবসায় ও গবেষণাকে সম্মান জনিয়েই বর্তমান ভূমিকাটি গীতা চট্টোপাধ্যায়ের নামোল্লেখ করেই শেষ করব। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় অসাধারণ পরিশ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জীর তিনটি খণ্ড প্রকাশ করেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ যেখানে ছেড়েছেন শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় সেখান থেকেই শুরু করে সুন্দর ভাবে কাজটি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। তার গ্রন্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হল কোন পত্রিকাটি কোন গ্রন্থাগারে বা ব্যক্তিগত সংগ্রহে লভ্য সেই তথ্য পরিবেশন। উৎসাহী ব্যক্তি অনায়াসেই পত্রিকাটির খোঁজ পেতে পারেন। এই তিনটি খণ্ডে মোট প্রায় ১৭৫০টি পত্রিকার হদিশ মেলে। অত্যন্ত দুঃখের কথা হল বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার বিপুল সংখ্যক লেখক-লেখিকাদের পরিচয় অজ্ঞাতই রয়ে গিয়েছে। প্রকাশনার সঙ্গে সঙ্গে রচয়িতাদের পরিচিতি প্রকাশিত হলে আজ এভাবে তাদের হারিয়ে যেতে হত না। সৃষ্ট রচনা রয়েছে কিন্তু স্রষ্টা চিরকালের জন্য অজ্ঞাতই থেকে যাবেন। এখন তথ্য সংরক্ষণের জন্য অনায়াসেই আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া যায়। কিন্তু সে যুগে হস্তাক্ষরে বা মুদ্রিত আকারে ধরে রাখা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। প্রতিলিপি তৈরী করার উপায় তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। লেখকদের অনেকে হয় ত এক সময়ে বেশ কিছু লিখেছেন কিন্তু পরে আর লেখেন নি। আবার অনেকে একটি দু'টি লেখার পর লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। এদের অনেকেরই খবর এখন আর কেউ রাখেন না। বিখ্যাত যারা হয়েছেন তারা রয়েছেন, অখ্যাতরা হারিয়ে গেছেন। সেকালে অবশ্য অনেকে লেখার সঙ্গে নিজেদের নাম প্রকাশ করতে কুণ্ঠা বোধ

করতেন। বর্তমানে বেশ কিছু পত্রিকার প্রতিলিপি সরকারী গ্রন্থাগার ও অন্য সংস্থার চেষ্টায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এই উদ্যম অবশ্যই প্রশংসনীয়। সম্প্রতি জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত কিছু পুরাণো সংবাদপত্র, পত্রিকা ও গ্রন্থের জন্যও একই রকম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে সাময়িক পত্র-পত্রিকার প্রচার সংখ্যা খুবই কম ছিল; এর একটি প্রধান কারণ, তখন বাংলা ভাষার পাঠকসংখ্যা ছিল নিতান্তই কম। শতাব্দীর শেষের দিকে এই সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে; বিশেষ করে কয়েকটি পত্রিকার ক্ষেত্রে। স্বপন বসুর লেখা থেকে জানা যায় – ১২৭৯ বঙ্গাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' ছাপা হত ১৫০০ কপি; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'ভারতী' ৮৫০ কপি; ১৮৯৭ সালে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর 'নব্যভারত' ছাপা হয়েছে ১৮০০ কপি; রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রদীপ' ৩০০০ কপি। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'নবজীবন'-এর প্রচার সংখ্যা ৫০০০, 'বঙ্গবাসী'র ১০০০০। তবে এগুলির জনপ্রিয়তা ছিল অনেক বেশি। সাধারণভাবে পত্রিকা ছাপা হত ৫০০ কপির কাছাকাছি। দ্বারকানাথের 'অবলাবান্ধব' পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ছিল মাত্র ২৫০, যদিও এটি চলেছিল দীর্ঘকাল। সাময়িক পত্রিকার ক্ষেত্রে এখনও হয়ত এই ধারাই বজায় আছে। কয়েকটি পত্রিকার প্রচারসংখ্যা বেশি হলেও বহু পত্রিকার চাহিদা নিতান্তই কম।

এবার একটু চোখ ফেরান যাক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদপত্রের দিকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে প্রকাশিত কয়েকটি পত্রিকার উল্লেখ ত আগেই করা হয়েছে। ১৯০৪ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' ছিল একটি সান্ধ্য পত্রিকা। এক পয়সা দামের এই পত্রিকাটিতে যুব সমাজকে সরাসরি আহ্বান জানান হয়েছিল সশস্ত্র বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ শাসন মুক্ত করতে অসহযোগ যে একটা পথ সেটা সম্ভবতঃ ব্রহ্মবান্ধবই প্রথম তুলে ধরেন। ১৯০৬ সালের ২১ নভেম্বর 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় তিনি লিখেছেন – "চৌকিদার এবং কনস্টেবল থেকে শুরু করে মুন্সেফ এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সহ সর্ব্বস্তরের সরকারী কর্ম্মচারীগণ যদি

সরকারি দায়িত্ব থেকে একযোগে পদত্যাগ করেন, তাহলে ফিরিঙ্গির শাসন একদিনে খতম হতে পারে। একটা গুলি ছোঁড়ারও দরকার হবে না ।"

১৯০৪ সালেই প্রকাশিত আর একটি পত্রিকা ছিল 'হিতবাদী'; সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। 'সন্ধ্যা' এবং 'হিতবাদী' দুটি পত্রিকাই বঙ্গ-ভঙ্গ ব্যর্থ করে আন্দোলন সংগঠিত করতে এগিয়ে এসেছিল। 'যুগান্তর' ছিল 'হিতবাদী'র মতই একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৩ সালে। অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন এর চালক শক্তি। ১৯১০ সালে বৃটিশ সরকারের চালু করা প্রেস আইনের কঠোরতার জন্য পত্রিকাগুলি যথাযথ সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা ও সত্য উদ্ঘাটনে পদে পদে বাধা পেয়েছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের মত নৃশংস হত্যাকান্ডও যথেষ্ট রেখে ঢেকে পরিবেশন করতে হয়েছে।

১৯১৪ সালের ৬ই আগস্ট 'দৈনিক বসুমতি'র জন্ম। উদ্যোক্তা ছিলেন উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। শিবরাম চক্রবর্তীও এক সময়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এই কাগজ বিক্রি করেছেন। বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত সেকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল পত্রিকাটি। ১৮৯৬ সালে উপেন্দ্রনাথ 'সাপ্তাহিক বসুমতী' বের করেন। পরে তার পুত্র সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় দৈনিক সংস্করণটি প্রকাশিত হয়।

৪.২-ভারতী পত্রিকা

রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলেও ঠাকুরবাড়িতে অন্যান্য যারা গড়ে উঠেছেন,তাদের অনেকেরই সাহিত্য, সঙ্গীত, অভিনয়, সমাজ সংস্কার ইত্যাদিতে গৌরবোজ্বল ভূমিকা রয়েছে। এই পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন সময়ে একাধিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এর দ্বারা সাধারণ পাঠকদের হাতে যেমন নানা ধরণের এবং বিষয়ের লেখা পৌঁছেছে,নতুন লেখক তৈরী করার ক্ষেত্রেও এইসব পত্রিকার অবদানের কথা অস্বীকার করা যায় না। এমনই একটি মাসিক পত্রিকা 'ভারতী'।জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহে 'ভারতী'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১২৮৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে (১৮৭৭

খৃষ্টাব্দ)। সম্পাদনায় ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর,মূল্য ছিল বার্ষিক তিন টাকা। দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রথমে পত্রিকাটির নাম দিয়েছিলেন 'সুপ্রভাত' কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সুপ্রভাত' নামটি পছন্দ না হওয়ায় পরিবর্তিত নাম হয় 'ভারতী'। এমন কি দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রচ্ছদ চিত্রণও অনেকের মনের মত না হওয়ায় কাঠে খোদাই করা ব্লকে প্রচ্ছদ তৈরী করে দেন ত্রৈলোক্যনাথ দেব। 'ভারতী'র পরিচিতি ছিল ঠাকুর বাড়ির পত্রিকা হিসাবে কারণ এর অধিকাংশ লেখাই ছিল ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা রচিত। 'ভারতী'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত ১০টি রচনার মধ্যে তিনটিই দ্বিজেন্দ্রনাথের লেখা ; রবীন্দ্রনাথও বাদ পড়েন নি। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন খুবই কম। 'ভারতী'তে তার নিজের লেখা সম্বন্ধে বক্তব্য - "এই সময়টাতেই বড়দাদাকে সম্পাদক করিয়া জ্যোতিদাদা ভারতী পত্রিকা বাহির করিবার সংকল্প করিলেন। এই আর-একটা আমাদের পরম উত্তেজনার বিষয় ছিল। আমার বয়স তখন ঠিক ষোলো। কিন্তু আমি ভারতীর সম্পাদকচক্রের বাইরে ছিলাম না। ইতিপূর্বেই আমি অল্পবয়সের স্পর্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস,কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীব্র হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম। এই দাম্ভিক সমালোচনাটা দিয়া আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম। এই প্রথম বৎসরের ভারতীতেই 'কবিকাহিনী' নামক একটি কাব্য বাহির করিয়াছিলাম ।" দ্বিজেন্দ্রনাথ,জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ত ছিলেনই কিন্তু সবাইকে একসঙ্গে বেঁধে রেখেছিলেন কাদম্বরী দেবী। শরৎকুমারীর ভাষায় কাদম্বরী ছিলেন 'ফুলের তোড়ার বাঁধন'। তার অভাব ভারতী প্রকাশের ক্ষেত্রে ভালভাবেই অনুভূত হয়েছিল,এছাড়া ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে পুলিশি হাঙ্গামা ত ছিলই। সব মিলে পত্রিকাটি বন্ধ হবার উপক্রম হয় এবং বন্ধ হবার খবর ঘোষণাও করা হয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র মাধ্যমে। এই দুর্দিনে এগিয়ে আসেন স্বর্ণকুমারী দেবী।

১২৯১ –এর বৈশাখ সংখ্যায় 'ভূমিকা'তে তিনি লিখেছেন – "আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দাদা মহাশয় বর্ত্তমান বৎসর

হইতে এই পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তাহার পরিবর্ত্তে আমরা উক্ত ভার গ্রহণ করিলাম।" অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি পত্রিকাটিকে উজ্জীবিত করে তোলেন। তিনি অবশ্য অকুণ্ঠিত সাহায্য পেয়েছেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তির কাছ থেকে।

স্বর্ণকুমারী ছিলেন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। ঐতিহাসিক ও সামাজিক দু'ধরণের রচনাতেই তিনি মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। তার রচিত কয়েকটি উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে 'ভারতী'তে। এরকম কয়েকটি উপন্যাস ও তার শুরুর সময় – 'ছিন্নমুকুল' (পৌষ ১২৮৫(, 'হুগলির ইমামবাড়ী' (পৌষ ১২৯১(, 'বিদ্রোহ' (ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৪(, 'স্নেহলতা' ('ভারতী ও বালক' বৈশাখ ১২৯৬(, 'ফুলের মালা' (ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯(, 'কাহাকে' (বৈশাখ ১৩০৩ (ইত্যাদি। পরে অবশ্য গ্রন্থাকারেও এগুলি প্রকাশিত হয়েছে। 'ভারতী ও বালক' ১২৯৭ বৈশাখ সংখ্যায় স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত 'পালিতা' নামক উপন্যাসের পাদটীকায় বিজ্ঞাপিত হয়েছে – "সম্প্রতি আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস হইতে "স্নেহলতা" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে ভারতী ও বালকে "স্নেহলতা" শীর্ষক যে উপন্যাসটি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে এই পুস্তকখানি সেই একই উপন্যাস। এটি তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। এই নব প্রকাশিত স্নেহলতা ও ভারতীর স্নেহলতা এক নহে এবং একজনের লেখাও নহে। এই গোলযোগের জন্য ভারতীর উপন্যাসটির নাম স্নেহলতার পরিবর্ত্তে "পালিতা" দেওয়া হইল।" এ ত গেল উপন্যাসের কথা। এ ছাড়াও স্বর্ণকুমারী 'ভারতী'তে বহু সংখ্যক গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেছেন। ১২৯১-এর বৈশাখ থেকে স্বর্ণকুমারী সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন; শ্রাবণ সংখ্যায় 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ' নামে কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়, সব গুলিই বিদেশের কোন কবি রচিত কবিতার অনুবাদ।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 'ভারতী'তে লেখা প্রকাশ করতেন। শিশুশিক্ষা ও নারীশিক্ষা বিষায়ে তার দুটি লেখা 'কিণ্টার গার্ডেন' ও 'স্ত্রীশিক্ষা'।

মন্তব্য

স্বর্ণকুমারী ‘ভারতী’র সম্পাদনা শুরু করার এক বছর পরেই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় ১২৯২-এর বৈশাখে ঠাকুরবাড়ি থেকে আত্মপ্রকাশ করে অর একটি মাসিক পত্রিকা ‘বালক’। রবীন্দ্রনাথ তার ‘জীবনস্মৃতি’তে লিখেছেন – “ বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করার জন্য মেজবউঠাকুরাণীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সুধীন্দ্র, বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র তাহাদের লেখায় চলিতে পারে না জানিয়া, তিনি সম্পাদক হইয়া আমাকেও রচনার ভার গ্রহণ করিতে বলেন।” কিন্তু নিতান্ত বালক বয়সেই ‘বালক’-এর মৃত্যু হয়। মাত্র এক বছর চলার পর ‘বালক’ ‘ভারতী’র সঙ্গে মিশে ‘ভারতী ও বালক’ নামে প্রকাশিত হতে থাকে। ১২৯৩ থেকে ১২৯৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত এই নামেই পত্রিকা বের হত। ১৩০০ বাংলা বছর থেকে পত্রিকাটি আবার পূর্ব নাম ‘ভারতী’তেই ফিরে আসে।

১৩০২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় স্বর্ণকুমারী দেবী তার সম্পাদকের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করেন। ‘অবসর গ্রহণ’ শীর্ষক একটি বিজ্ঞাপনে তিনি জানান – “এতদিন আমি আমার সাধ্যমত ভারতীর সম্পাদন –কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে শরীর অসুস্থ হওয়াতে আমার কন্যাদ্বয়ের প্রতি ভারতীর ভার সমর্পণ করিয়া বর্তমান বৎসর হইতে আমি অবসর গ্রহণ করিলাম।”

এই কাজের ভার এর পর ন্যস্ত হয় তার কন্যা হিরণ্ময়ী দেবীর উপর। অপর এক কন্যা সরলা দেবী তখন মহীশূরে শিক্ষকতা করছেন। হিরণ্ময়ী লিখেছেন –“ভাবিলাম একলার নাম না দিয়া যদি দুই ভগিনীর নামে ভারতী চালাই ত নিশ্চয়ই দেখাইবে ভাল। সরলাকে লেখায় তিনিও এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। আমি অনেকটা আরাম বোধ করিলাম।” এভাবে ছোট বোন সরলা দেবীর নামও যুক্ত হয় ; যুগ্ম-সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে থাকে; যদিও সম্পাদকের কাজ সম্পূর্ণভাবে হিরণ্ময়ী দেবীই দেখাশোনা করতেন।

হিরণ্ময়ী দেবীর ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথ ভারতীর সম্পাদনার কাজ দেখাশোনা করুন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে রাজি না হলেও পরে ভাগ্নীর সনির্বন্ধ অনুরোধ ফেলতে না পেরে রাজি হন। এ প্রসঙ্গে হিরণ্ময়ী লিখেছেন –"... এইরূপে তিন বৎসরকাল আমরা দুই ভগিনী ভারতীর সম্পাদক ছিলাম। আমি কিন্তু ইহার মধ্যে একদিনও মাতুল মহাশয়কে ভারতী গ্রহণের জন্য ভজাইতে ছাড়ি নাই। ক্রমাগত জল ঢালিলে পাথরও ক্ষয় হয় মামা মহাশয়েরও আমার প্রতি করুণার উদ্রেক হইল। তিনি ভারতীর সম্পাদন ভার গ্রহণ করিতে অর্থাৎ লিখিতে ও লেখা নির্বাচন করিতে সম্মত হইলেন। ... এইরূপে পুনরায় ভারতীকে যোগ্য হস্তে সমর্পণ করিয়া আমার সে কি আনন্দ। তবু মামাটির স্বভাব আমার জানা ছিল - বেশিদিন যে এ আনন্দ ভোগ করা আমার ভাগ্যে ঘটিবে না তাহা মনে মনে বুঝিতাম।" হিরণ্ময়ীর আশঙ্কা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক পদে ছিলেন মাত্র এক বছর।

'সাধনা' পত্রিকা সম্পাদনার অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'তে কাজে লাগান। তিনি এসে পত্রিকাটির আকারে পরিবর্তন আনেন ও নতুন কিছু বিভাগও সংযুক্ত করেন। বিশেষ করে 'গ্রন্থ সমালোচনা' বিভাগটি তার সুচিন্তিত ও মনোজ্ঞ সমালোচনার গুণে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। 'তার অনেক লেখাই 'ভারতী'তে বেরিয়েছে; কিন্তু তিনি সম্পাদকের পদে ছিলেন মাত্র এক বছর। লেখা যোগাড় করা, ছাপার কাজ তত্বাবধান করা, প্রুফ দেখা ইত্যাদি কাজ করতে গিয়ে তিনি হাঁপিয়ে ওঠেন। ১৩০৫-এর চৈত্র সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন – "সম্পাদক পদ পরিত্যাগ করিতেছি বলিয়াই যে সকল পক্ষপাতী পাঠক অপরাধ গ্রহণ করিবেন তাঁহারা প্রীতিগুণেই পুনশ্চ অবিলম্বে ক্ষমা করিবেন বলিয়া আমার নিশ্চয় বিশ্বাস আছে। এক্ষণে গত বর্ষ শেষে যে স্থান হইতে ভারতীর মহদ্ভার স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলাম বর্ষান্তে ঠিক সেই জায়গায় নামাইয়া ললাটের ঘর্ম মুছিয়া সকলকে নববর্ষের অভিবাদন জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।"

এক বছর সম্পাদনার পর রবীন্দ্রনাথ ত মুক্ত হলেন। তিনি সম্ভবত মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন 'বঙ্গদর্শন (নব পর্য্যায়)' প্রকাশের জন্য। ১৩০৮-এর বৈশাখে তারই সম্পাদনায় এটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে সরলা দেবী মহীশূর থেকে

ফিরে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথের পর তিনি এককভাবে 'ভারতী'র সম্পাদনা শুরু করেন; একটানা ন'বছর (১৩০৬-১৩১৪ বঙ্গাব্দ) তিনি এই কাজ করেছেন। 'ভারতী'কে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে সরলা দেবী প্রাণান্ত পরিশ্রম করেছেন। তিনি নিজেও নানা ধরনের লেখা ভারতীতে প্রকাশ করেছেন। সম্পাদনা সূত্রেই তিনি স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে পরিচিত হন। বাঙালী ছাড়াও কিছু অবাঙালী লেখকদেরও রচনা প্রকাশ করেছেন সরলা দেবী। মূল লেখকেরা ইংরাজিতে লিখে দিতেন সরলা সেটা বাংলায় অনুবাদ করে ছাপতেন। এরকম কয়েকটি লেখা – 'প্রত্যেক মা তার ছেলের জন্য কি করিতে পারে' (নিবেদিতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬); 'বঙ্গমাতার কর্ত্তব্য' (নিবেদিতা, শ্রাবণ ১৩০৬); 'পূর্ব্বকালের সমাজশাসন' (মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, শ্রাবণ ১৩০৭); 'দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতোপনিবেশ' (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, বৈশাখ ১৩০৯); 'জাপানের সনাতন আদর্শ' (শিতোকু হোরী, বৈশাখ ১৩১০)। নতুন লেখকদের ছাপার অনুপযুক্ত লেখাও অনেক সময় সম্পাদক ঘষে মেজে ঠিক করে নিতেন ছাপার উপযুক্ত করে, এতে লেখকদের উৎসাহ দান ও লেখক তৈরি, দু'টোই হত।

সরলা দেবী ১৩১২ সালে তেত্রিশ বছর বয়সে হিন্দুস্থান পত্রিকার সম্পাদক ও আইনজীবি রামভজ দত্ত চৌধুরীকে বিয়ে করে লাহোরে চলে যান এবং সেখান থেকেই 'ভারতী'র সম্পাদনার কাজ চালাতে থাকেন। অত দূরে বসে সম্পাদকের কাজ করার জন্য 'ভারতী'র প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে স্বর্ণকুমারী দেবী এগিয়ে এসে হাল ধরেন এবং 'ভারতী' আবার উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। এই পর্বে স্বর্ণকুমারী সম্পাদনা করেছেন ১৩১৫ থেকে ১৩২১ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত। কিন্তু এক সময়ে স্বর্ণকুমারীকে ছেড়ে দিতেই হয়।

১৩২২ বৈশাখ সংখ্যায় 'বিদায় গ্রহণ' শিরোনামে তিনি লেখেন – "..... সুরুচি সুশ্লীল সাহিত্যের মধ্য দিয়া জ্ঞানের ক্ষেত্র ও মনের প্রসারতা বৃদ্ধি করাই ভারতীর প্রধানতম কর্ত্তব্য ছিল; আর আনুষঙ্গিক একটি কর্ত্তব্য ছিল , নূতন লেখকদিগকে গড়িয়া তোলা। গুপ্ত প্রতিভাকে ফুটাইয়া তুলিতে ভারতী কোনদিন পরিশ্রম কাতর হয় নাই। যে লেখার

মধ্যেই কোন একটু সার পদার্থ মিলিয়াছে তাহাই মার্জিত সুশোভিত আকারে ভারতীর পত্রে স্থান লাভ করিয়াছে।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় দু'জনেই তখন তরুণ লেখক। তারা 'ভারতী'তে চিত্র যোগ করেন,তাদের সম্পাদনায় সচিত্র 'ভারতী' প্রকাশিত হতে থাকে। অনেক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তখন সাহিত্যিকদের নিয়মিত আড্ডা বসত; 'ভারতী'র ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,সুকুমার রায়,প্রেমাঙ্কুর আতর্থী,নরেন্দ্র দেব,হেমেন্দ্র কুমার রায়, নজরুল, অবনীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকদের সম্মিলনে সাহিত্যচক্র উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

১৩৩০ বঙ্গাব্দে স্বামী রামভজের মৃত্যু হলে শোকগ্রস্ত অবস্থায় সরলা দেবী কলকাতায় ফিরে আসেন এবং 'ভারতী' সম্পাদনার ভার নিজের হাতে তুলে নেন,হয় ত কিছুটা কাজের মাধ্যমে শোকের হাত থেকে রেহাই পেতে। ছবির প্রকাশ বন্ধ করে দিয়ে পত্রিকাটিকে চিত্র বর্জিত করেন তিনি এবং নানা ভাবে এটির মানোন্নয়নের চেষ্টা করেন। আপ্রাণ পরিশ্রম ও চেষ্টা করেও 'ভারতী' কিন্তু আর আগের জৌলুষ ফিরে পায় নি। ১৩৩৩-এর কার্তিক সংখ্যাই পত্রিকাটির শেষ সংখ্যা। 'ভারতী' অনেক লেখককে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছে। এমন কি রবীন্দ্রনাথ তার 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট','চিরকুমার সভা','নষ্টনীড়' ইত্যাদি 'ভারতী'তেই প্রকাশ করেছেন। শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' লেখাটি 'প্রবাসী' থেকে অমনোনীত হয়ে ফেরত এলে সরলা দেবী সেটি 'ভারতী'তে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। প্রথম কয়েকটি সংখায় লেখকের নাম না থাকায় লোকে এটিকে রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে ধরে নিয়েছিলেন। শেষের সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের নাম ছাপা হলে শক্তিশালী লেখক হিসাবে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' ভারতীর পরিবর্তে 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশ করায় রবীন্দ্রনাথের উপর সরলা দেবী যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ১২৮৪ থেকে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে একটানা প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতী'। তখনো পর্যন্ত এটিই ছিল সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী বাংলা পত্রিকা। পত্রিকাটির সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সমসাময়িক লেখিকারা পত্রিকাটিকে

মহিলাদের পত্রিকা হিসাবে অভিহিত করেন এবং স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলিও যথেষ্ট প্রশংসিত হয়। নতুন লেখক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পত্রিকাটির ভূমিকা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন। হেমেন্দ্র কুমার রায়ের ভাষায় " ভারতী আর বাঁচল না। এ দুঃখ আমার আজও যায় নি। কারণ প্রধানতঃ ভারতীকে অবলম্বন করেই সাহিত্যক্ষেত্রে আমি হয়েছিলুম পরিচিত "।

স্বর্ণকুমারী 'ভারতী' সম্পাদনা করেছেন প্রথম পর্যায়ে ১২৯১ থেকে ১৩০১ বঙ্গাব্দ (১৮৮৪-৯৪ খৃষ্টাব্দ) – মোট এগারো বছর এবং পরবর্তী পর্যায়ে ১৩১৫ থেকে ১৩২২ বঙ্গাব্দ (১৯০৮-১৫ খৃষ্টাব্দ) - আরও সাত বছর,মোট আঠারো বছর। বাংলা পত্রিকা সম্পাদনায় মহিলাদের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়।

'ভারতী'-র ১ম সংখ্যায় যে সব লেখা প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি হল - ভূমিকা; ভারতী (কবিতা); তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক; মেঘনাথ বধ কাব্য (মাইকেল মধুসূদন প্রণীত) [আলোচনা]; জ্ঞান, নীতি ও ইংরাজি সভ্যতা (বকল সাহেব-কৃত ইংলণ্ডীয় সভ্যতার ইতিহাস); বঙ্গ-সাহিত্য (শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি.এস. প্রণীত বঙ্গ-সাহিত্য) [আলোচনা ও সমালোচনা]; গঞ্জিকা অথবা তুরিতানন্দ বাবাজির আকড়া; ভিখারিণী; স্বাস্থ্য (ধারাবাহিক); সম্পাদকের বৈঠক।

'ভারতী' জীবিত ছিল দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর। যারা সম্পাদক ছিলেন তাদের এক নজরে দেখে নেওয়া যাক। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (শ্রাবণ ১২৮৪-১২৯০); স্বর্ণকুমারী দেবী (১২৯১-১৩০১); হিরণ্ময়ী দেবী, সরলা দেবী (১৩০২-১৩০৪); রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩০৫); সরলা দেবী (১৩০৬ - ১৩১৪); স্বর্ণকুমারী দেবী (১৩১৫-১৩২১); মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৩২২-১৩৩০); সরলা দেবী (১৩৩১-আশ্বিন ১৩৩৩)|

শেষ দিকে 'ভারতী'র আর্থিক সঙ্কট ঘনীভূত হয়। পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৩৩৩-এর বৈশাখ সংখ্যাটি জুবিলি সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় নতুন গ্রাহক হবার জন্য আবেদন বিজ্ঞাপিত হয়। সংকটের মধ্যেও আশ্বিন মাসে বেরোয় শারদীয় সংখ্যা। এটাই সম্ভবতঃ 'ভারতী'র শেষ সংখ্যা।

'ভারতী' প্রথমে ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা নামে পরিচিত হলেও ধীরে ধীরে সেটা কাটিয়ে ওঠে। সে সময়ের বহু লেখক ও কবি এগিয়ে এসেছেন তাদের রচনা সম্ভার নিয়ে নিয়ে। 'ভারতী'কে আশ্রয় করেই তাদের অনেকে সাহিত্য জগতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অজস্র প্রবন্ধ, গান, কবিতা সাধারণের কাছে পৌঁছেছে 'ভারতীর' মাধ্যমে। 'ভারতবর্ষ' ও 'প্রবাসী' ছাড়া আর কোন পত্রিকা এত দীর্ঘকাল সাহিত্যাকাশে স্থায়ী হয় নি। সাময়িক পত্রের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হ'ল নামী লেখকদের রচনা ও বিবিধ বিষয়ের লেখা প্রকাশের মাধ্যমে পাঠকদের সাহিত্যমনস্ক করা এবং তাদের জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করা, একই সঙ্গে নতুন লেখকদের সৃজন ক্ষমতাকে স্বীকৃতি জানিয়ে তাদের পরিণত হয়ে ওঠার সুযোগ করে দেওয়া। 'ভারতী' এই দুই ক্ষেত্রেই সসম্মানে উত্তীর্ণ।

৪.৩ রবীন্দ্রসমকালীন কবি যতীন্দ্রনাথের কবিতায় তৎকালীন সমাজ চিত্র

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে যে-সম্মানের জায়গাটি এখন দখল করে নিয়েছে, এতে সমস্ত বাঙালি জাতির অংশগ্রহণ ও অবদান রয়েছে। তবে সংস্কৃতির মুখাবয়বের সঙ্গে তুলনীয় বলে সাহিত্যিকদের অবদান বিশেষভাবেই অগ্রগণ্য। লোকসাহিত্য-স্রষ্টাদের কথা মাথায় রেখেও চর্যাপদ থেকে বাংলা সাহিত্যের যে-পর্যাবৃত্ত তাতে মুখ্য হয়ে ওঠে অনেক মুখ। তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রতিনিধিত্বশীল। বহুমাত্রিক সাহিত্যকেন্দ্রিক রচনাপুঞ্জের জন্য তো বটেই, এমনকি তাঁর জীবনচর্যা আর জীবনাদর্শের স্বকীয়তার জন্যও বটে। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কে ও তাঁর সাহিত্য রচনাকে স্মরণ করে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমরা কেবল আমাদের মনুষ্যত্বের দায়টাই মেটাতে পারি, ততোধিক কিছু নয়। প্রথমেই আমাদের সামনে একটি প্রশ্ন উত্থাপন হয়, কেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এর উত্তরের জন্য কয়েকটি বিষয় আমাদের পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার।

মন্তব্য

এক. রবীন্দ্র-সমকালীন সাহিত্য বিবেচনার ক্ষেত্রে অবচেতনগতভাবেই যেন আমরা ধরে নিই যে, ঈশ্বরগুপ্ত-মধুসূদন-বিহারীলাল অতিক্রম করে বাংলা সাহিত্য কেবলই রবীন্দ্রমন্দিরে পৌঁছেছে; রবীন্দ্র-সমকালীন সৃজনশীল প্রতিভারা রবীন্দ্রনাথের আড়ালে পড়ে যান। যদি জিজ্ঞেস করা হয়, রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী বা বয়সের কাছাকাছি কবি বা লেখক কারা – অনেক ক্ষেত্রেই এ-প্রশ্নের তাৎক্ষণিক জবাব পাওয়া যায় না। অন্তত আমদের অভিজ্ঞতা তা-ই। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রবীন্দ্র-সমকালীন মহৎ সাহিত্যিক-প্রতিভা।

দুই. রবীন্দ্রনাথের মতো যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ছিলেন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও চর্চা সংবলিত। তখনকার অর্থে বিত্ত-সম্পদ-প্রতিপত্তিসহই কোনো কোনো পরিবার বিদ্যা, সংগীত, নাট্য, সাময়িকপত্র ইত্যাদির চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। উনিশ শতকের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এই প্রবণতা থেকে যেমন মুক্ত নয় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি, তেমনি মুক্ত নয় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। উনিশ শতকের প্রবল প্রতিভাবানদের গমনাগমন ঘটেছে এই পরিবারে। কৃষ্ণনগরের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার একটি কেন্দ্র ছিল রায় পরিবার। ফলে যতীন্দ্রনাথের লেখায় উনিশ শতকীয় মননের বা সাংস্কৃতিক ইতিহাসের নিশানা মুদ্রিত থাকাটাই স্বাভাবিক।

তিন. বাঙালির লেখা ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলেও আমাদের যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সাহিত্যে উঁকি দিতে হবে। নদীয়া জেলা বোর্ড ও পরে কাশিমবাজার রাজ স্টেটে কাজ করার সময় তিনি প্রকাশ করেছিলেন তাঁর সাহিত্য প্রকাশ এর ইচ্ছা। নজর এড়ানো এই সাহিত্যের বিশ্লেষণ জরুরি তিন দিক থেকে : ১. বাঙালির ইংরেজি চর্চা, ২. ইংরেজিচর্চার মনস্তাত্ত্বিক দিক, ৩. ঔপনিবেশিক নন্দনতত্ত্ব ও কাব্যতাত্ত্বিক মূল্য।

চার. কাব্য বিষয়ে তাঁর অবদানের নির্মোহ বিচার হওয়া প্রয়োজন।তিনি চাকরি করা কালিন নিয়মিত কাব্য লিখেছেন, কাব্যের গুনগত মান সম্পর্কে জেনেছেন। এগুলোর প্রয়োগে কতটুকু মৌলিকত্ব প্রদর্শন করেছেন সেটি বিচার্য বিষয়। নাকি দুঃখীবাদি ঘেরাটোপে আটকে গেছেন।

পাঁচ. সর্বোপরি, আমাদের জেনে নেওয়া প্রয়োজন, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত-তাঁর সাহিত্য থেকে উৎপাদিত মতাদর্শ কী।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিতার উপজীব্যতার দিকে মনোযোগ দিলে কয়েকটি দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

হতাশা যন্ত্রণা প্রসঙ্গ : নিরাশা ও দুরাশার প্রাচুর্য লক্ষ করা যায় তাঁর কবিতা। কেবল ঐতিহ্যানুরাগের পরিচয়বহই নয় এ প্রবণতা, এসব উপাদানকে তিনি সমসাময়িক জীবনে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছেন অসাধারণ নৈপুণ্যে।

সামাজিক অসংগতি : ক. ইংয়বেঙ্গল ঘরানার কর্মকান্ডের বিরোধী, খ. বিলেতি কায়দাকেতা শিখে আসা ব্যক্তিবর্গের নিরর্থক বাগাড়ম্বর ও লোকদেখানো প্রগতিশীলতা, গ. সারবত্তাহীন অভিনবত্বের প্রতি ব্যঙ্গ, ঘ. ঘরকন্নার দায়িত্ব এড়িয়ে চলা কবিতায় ব্যঙ্গ (এই ক্ষেত্রে যতীন্দ্রনাথ কে রক্ষণশীল মনে হতে পারে, তবে বুঝতে হবে যে, পুরুষদের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণেরও তিনি তীব্র সমালোচক), ঙ. ভারতীয় ধর্ম ও জীবনদর্শনের ওপর ইউরোপীয় সাহিত্য, দর্শন ও চিন্তার প্রভাব, চ. স্ববিরোধী আচরণ এবং ছ. নাস্তিকতা।

প্রকৃতির যেসব উপকরণ বেশ রোমান্টিক হিসেবে স্বীকৃত ও বহুল ব্যবহৃত, সেগুলোর ব্যঙ্গাত্মক উপস্থাপন।তাঁর কাব্যভাষা পর্যবেক্ষণ করলে কয়েকটি বিশেষত্ব চোখে পড়ে :

এক. কোড-মিশ্রণ। ইংরেজিয়ানার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ করার ক্ষেত্রে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কোড মিশ্রণের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

দুই. অনেক কবিতায় কথ্য বাগভঙ্গি ব্যবহার করেছেন, যা তাঁর কবিতাকে অনেক বেশি লোকচিত্তগ্রাহ্য করে তুলেছিল,

তিন. নানা রকম সংলাপনির্ভর কবিতা রচনা করেছেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত । কাব্য ও নাট্যপ্রতিভার সংশ্লেষণ হয়েছে হয়তো এক্ষেত্রে, কিন্তু তা কবিতার শরীরে ও অন্তরে স্বতন্ত্র এক স্বাদ সঞ্চার করেছে। এই সংলাপের ধরনও

বিচিত্র। কারণ, আমরা বাংলা সংলাপের বিপরীতে ইংরেজি সংলাপ যেমন ব্যবহৃত হতে দেখি, তেমনই চমৎকৃত হই বাংলা শব্দের সঙ্গে ইংরেজি শব্দের অন্ত্যমিল ব্যবহারের নিপুণতায়।স্বদেশাত্মক ও স্বাধীনচেতা মনোভঙ্গির কারণে চাকরি-জীবন তাঁর সুখকর হয়ে ওঠেনি।

আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমবয়স্ক কবিদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালই একমাত্র কবি যিনি পূর্বাপর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল থাকতে পেরেছেন। অন্যরা কবিতা ছাড়া অন্য কোনো আঙ্গিকের চর্চায় মনোযোগীও ছিলেন না, উদ্যম বা উদ্যোগের অভাবে তাঁদের গ্রন্থও তেমন প্রকাশিত হয়নি। বীরিরহ্রসেকবিতা-রচনায় সমকালে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। দেশাত্মবোধ জাগরণে তাঁর কবিতা ভূমিকা ছিল অসাধারণ। তাঁর নাটকগুলি শিল্পোত্তীর্ণ, সাহিত্য হিসেবে পাঠযোগ্যতা উন্নতমানের। রবীন্দ্র-সমকালে রবীন্দ্রনাথের পরেই তাঁর অবিসংবাদিত স্থান।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবি হলেও কাব্যরুচিতে রবীন্দ্রানুগত ছিলেন না, অন্তমুর্খিতা নয়, সামাজিক বন্ধনের মতো বহির্মুখীনতা ছিল তাঁর কাব্যচৈতন্যের প্রধান প্রবণতা। কাব্য-রচনার শুরু থেকেই তিনি অবস্থান নিয়েছেন গতানুগতিকতার বাইরে। সামাজিক অনাচার ও অসংগতি, স্বার্থপরতা ও কূপমন্ডূকতার বিরুদ্ধে কলম চালনা করে গেছেন। সাহিত্যের বিবিধ শাখায় বিচরণ করেছেন, কবিতায়ও অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। কবিতায় নতুন ধারা, ছন্দ, ভাষা ও রীতি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। হাস্য-পরিহাস-রঙ্গব্যঙ্গময় কবিতা রচনায় ঝোঁক ছিল। গভীর দক্ষতা নিয়ে কবিতায় ছন্দ ব্যবহার করেছেন :

কাব্য নয়কো ছন্দোবদ্ধ মিষ্ট শব্দের কথার হার
কাব্যে কবির হৃদয় নেই যার তাহার কাব্য শব্দসার।

প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ছন্দে কবিতা রচনা করে, পরে ছন্দে নতুন কিছু সংযোজনের চেষ্টা করেছেন :

কিন্তু কবিবর বিনা অনুপ্রাসে

বিনা ছন্দের কোন দায়িত্বে,

যে কাব্য করেছ রচনা নাহি তা

সমগ্র বঙ্গসাহিত্যে।

কবিতায় তিনি তরঙ্গোচ্ছল একটা গতি সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। তবু প্রচলিত ছন্দেই বেশিরভাগ কবিতা রচিত। তাঁর ছন্দের মাধুর্য ও নৈরাশ্যের ইঙ্গিত কবিতাকে আরও মননশীল করে তুলত

আছে গো আছেও সুখ-

খদ্যোত বিনা দেখা যাবে কেন বনের আঁধার মুখ!

মাঝে মাঝে মৃগ তৃষ্ণিকা বিনা কে মাপে মরুর তৃষা!

আলেয়ার আলো নহিলে পান্থ কেমনে হারাবে দিশা!

বন্ধু, বন্ধু, হে কবি বন্ধু, উপমার ফাঁস গুনি'

আস্ল কথাটা চাপা দিতে ভাই কাব্যের জাল বুনি।

(কবির কাব্য)

সমকালীন সামাজিক অসংগতি তাঁকে বেদনাবিধুর করে তুললেও সেই অনুভূতি উপস্থাপন করতেন কৃত্তিম বস্তুর বেদনার মধ্যে দিয়ে সেই ব্যথায় মানব ব্যথার চিরকরুন তিব্রতাকে বুঝিয়েছেনঃ

ও ভাই কর্মকার

আমাদের পুড়িয়ে পিটানো ছাড়া কি নাহিক করমার?

কোন ভোরে সেই ধরেছ হাতুরি,রাত্রি গভীর হল,

ঝিল্লিমুখর স্তব্ধ পল্লী, তোল গো যন্ত্র তোল

ঠকা ঠাই ঠাই কাদিয়েছে নেহাই, আগুন ঢলছে ঘুমে

শ্রান্ত সাঁড়াশি ক্লান্ত ওষ্ঠে আল গোছে ছেনি চুমে।

দেখোগো হেথায় হাপ্র হাঁপায়, হাতুড়ি মাগিছে ছুটি;

রাত্রি দুপুরে মনে নাহি পড়ে কি ছিলাম আমি ভোরে,

ভাঙ্গিলে গড়িলে সিধা বাঁকা গোল লম্বা চৌকা করে;

কভু আতপ্ত, কভু লাল, কভু উজ্জ্বল রবিসম

কভু বা সলিলে করিলে শীতল অসহ্য দাহ মম।

অজালা দুজনে গ্লায়ে আগুনে জুড়িয়া মিতালে সাধ,

ধড় হতে কভু বাহুল্য বোধে মাথাকে কেটে দিলে বাদ।

ঘন ঘন ঘন পরিবর্তনে আপনা চিনিতে নারি,

স্থির হয়ে যাই ভাবিবারে ছাই,প্রে হাতুড়ির বাড়ি।

ও ভাই কর্মকার!

রাত্রি সাক্ষী, তোমার উপরে দিলাম ধর্মভার।-----

কহ গো বন্ধু কহ গো কানে কানে,আপনার প্রানে বুঝি,

আমি না থাকিলে মারা যেত কিনা তোমার দিনের রুজি?

তুমি না থাকিলে আমার বন্ধু কিবা হত তাহে ক্ষতি?

কৃতজ্ঞতা কি পাঠাইয়াছ তাই হাতুড়ির মারফতি।

কি খিছ ভাই, আমি হব তুমি এই প্রেম শি যদি?

পিটনের গুনে লোহা কবে হায় পায় কামারের গদি!

(লোহার ব্যাথা)

কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রতিভার যে-পরিচয় পাওয়া যায়, তা কেবল প্রশংসনীয়ই নয়, তা সময়োপযোগী এবং তাৎপর্যমন্ডিত। সমালোচকদের ভাষায়_ 'কাব্যসৃষ্টিতে তিনি যে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা অনস্বীকার্য। কবি হিসেবে তিনি রবীন্দ্রযুগে আর্বিভূত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তার কাব্যপ্রতিভা রবীন্দ্রনাথে আত্মসমর্পণ করেনি।'

তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী সেই সময়টা ছিল মানব চেতনা উন্মচনের যুগ। রবীন্দ্র-পরবর্তী কবি হিসেবে বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আগ্নেয় প্রতিভা স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে। উনিশ শতকে কাব্য-সাহিত্য সম্পদের একটি বিশিষ্ট শাখা বিরহ চেতনার দ্বারা বিকশিত হয়েছিল। যতীন্দ্রনাথই সমাজে কাব্য লিখনির বিশিষ্টতাকে আশ্চর্যভাবে বদলে দিয়েছিলেন, যদিও যতীন্দ্রনাথ এর রবীন্দ্রনাথের কবিতার নকল করে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা সমাজের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। আবার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতার প্রভাব তাঁর সমকালীন সমস্ত কবিতার ওপর অল্পবিস্তর লক্ষ করা যায়। যতীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রেমবিষয়ক, দেশপ্রীতিমূলক এবং পরিহাসভাবমূলক মানব জীবন যাত্রার ক্রমাগত অবক্ষয় মূলত এই চার ধরনের বিষয় আমরা লক্ষ করি। এর মধ্যে, প্রেমপ্রকাশের তুলনায় সমাজ বেদনা বোধক ও দুঃখীবাদমূলক কবিতা গুলির ভাষা-ছন্দ-সুরে যতীন্দ্রনাথ এমন একটি মৌলিকতা প্রকাশ করেছেন যা দুর্লভ। মনে করিয়ে দেয় তাঁর অন্ধকার কবিতাটিকে –

অন্ধকার, ওগো অন্ধকার!
আজি ভাদ্র অমনি নিশা যোগে
ক্ষুদ্র ঘরে বন্ধ ক্রি দ্বার
তোমারে করিব আহ্বান
তোমারে করিব নমস্কার!

অন্ধকার, ওগো অন্ধকার!
জ্যোতি রূপ এ বিশ্বের তুমি সুনিশ্চিত মহা ভবিষ্যৎ,

অজ্ঞাত গ্লে তব একদিন সমগ্র জগত

ছুটাইয়ে স্পত রশ্মির রথ

অন্ধবত হারাইবে পথ।

বিচিত্র আলোকচিত্র কবি একাকার

দিকে দিকে ব্যাপিবে তোমার

সর্বগ্রাসী স্থির কৃষ্ণ হাসি;

অন্ধকার, ও অন্ধকার

তোমার নিশূন্য গর্ভ হতে

রক্তালোক স্রতে

ভরি দিয়া ব্যোম

যে দিন প্রথম

জন্ম মাত্র শিশু বিশ্ব ক্রিল ক্রন্দন

ওম ওম ওম,-

তুমি মাতা মূর্ছাগতা কে করে সান্তন?

অদ্যাবধি তাই,

বিশ্ব হায়

কেঁদে কেঁদে ফিরে নিঃসহায়

কেঁদে ফিরি আমরা সবাই।

স্মমুখে আলোক খুঁজে যতটুকু পাই,

পিছনে ছায়ায়,

অনন্ত ব্যাপিনী তব ঘুমন্ত মায়ায়

দ্বিগুণ হারাই

জন্ম ক্ষনের সি আশান্ত ক্রন্দন

যুগে যুগে জীবে জীবে হল চিরন্তন।

দিশাহারা বিদেশী সবাই,

কেহ নাই,

ঘুচাইতে ভ্রমরের ভ্রম,

যত কাঁদি ত্ত জপি আদি আলোকের

ক্রন্দনের বীজ- ওম ওম ওম। .....

(অন্ধকার)

সামাজিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত কবিতা আমাদের তৎকালীন স্বদেশপ্রেমে ও জাতীয় ভাবোদ্দীপনার শোণিতকম্পনের ইতিহাস নিহিত রয়েছে। সেই কবিতার মধ্যবর্তী প্রেরণা ছিল রবীন্দ্রনাথের গান, তাছাড়া বাংলার দুই শ্রেষ্ঠ সংগীতরচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদের গানগুলিও এই সময়েই সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সংগীত যেমন বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনকে গতি দান করেছিল, তেমনি এই কবিতা গুলি বাংলার আন্দোলনকেও দিয়েছিল অসীম উদ্দীপনা, দীর্ঘস্থায়ী জনপ্রিয়তা, বৃহৎ বঙ্গব্যপ্ত প্রচার ও বঙ্গভাষীমাত্রের মনে কবিতার প্রতি অপার আগ্রহ।

বিশ শতকের কবিগণ কথা ও রুপকে অপূর্ব এক সমবায়ে বাংলা কবিতাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁদের আমরা পঞ্চকবি হিসেবে চিহ্নিত করি:
জীবনানন্দ,প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু,বিষ্ণু দে,ও অমিয় চক্রবর্তী।সেই পাঁচ কবি, যাঁদের প্রাতিস্বিক ও সমবায়ী প্রতিভায় বাংলা কবিতা মহিমাময় হয়ে উঠেছে।
বলাই বাহুল্য, বাংলা কাব্য ঐতিহ্য ও ধারা অনুসরণ করেই যতীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটেছিল, বিশ শতকীয় কাব্য ইতিহাস অস্বীকার করে নয় যতীন্দ্রনাথের কবিতা গুলি বাংলাদেশে একদা অমসৃণ প্রতিকূলতা লাভ করেছিল, এবং ডিএল রায় ছিলেন তাদের সর্বাধিক বিরুদ্ধাচারী –

কবিতা লিখতে গেলেই নব্য কবিগণ প্রেম লইয়া বসেন।... তাও যদি কবিরা দাম্পত্য প্রেম লইয়া কাব্য লেখেন, তাহাও সহ্য হয়। ইহাদের চাই – হয় বিলাতি courtship, নয়তো টপ্পার প্রেম। নহিলে প্রেম হয় না।...

ব্যক্তিগত জীবনের অনুভূতিকে কাব্যে হৃদ্য করে তোলা, এবং কাব্যমূল্যের নিঃসন্দিগ্ধ প্রতিষ্ঠা যতীন্দ্রনাথ ঘটিয়েছিলেন।তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে ঐতিহ্যকে রূপায়িত হতে দেখেছি আমরা আর এখন তিনি নিজেই পরিণত হয়েছেন আমাদের ঐতিহ্যে। বাঙালি সংস্কৃতির মর্মে মিশে আছে যতীন্দ্র প্রতিভা। তাঁকে অস্বীকার করা মানে আত্মহত্যার নামান্তর। ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশের শর্ত মেনে নিয়েও বলা যায়, যেকোনো সমাজের সাহিত্য যদি সেই সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চেতনার প্রতিনিধিত্ব না-করে, তাহলে সেই কবিতার আবেদন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। বিশেষ করে যে মধ্যবিত্ত-মন শব্দশিল্পের পাললিক ভূখণ্ড, বাংলাদেশে সেই মধ্যবিত্তের বিকাশও স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত নয়। ইংরেজ বণিকের মানদণ্ডের সংস্পর্শে যে মধ্যবিত্তের যাত্রা সূচিত হয়েছিল, প্রায় দু'শ বছরেও বাংলাভাষী ভূখণ্ডে সেই মধ্যবিত্তের শ্রেণিচরিত্র কোনো সুস্পষ্ট রূপ পায়নি। বরং সামন্তাদর্শ, কুসংস্কার, প্রচলিত মূল্যবোধ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে এ-দেশের মধ্যবিত্ত চরিত্র বিমিশ্র স্বভাব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিশেষ করে, বাংলাদেশ ভূখণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণিবিকাশের স্বতন্ত্র ও জটিল রূপ তার ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্যকে গোড়া থেকেই ভিন্নধারায় প্রবাহিত করেছে। দেশ বিভাগের আগে সেই ব্যক্তিসত্তায় যে দ্বন্দ্ব, অনিশ্চয়তাবোধ ও অস্থিরতার জন্ম হয়েছিল যতীন্দ্রনাথের কবিতা সেখানে নিয়ে এল মুক্তচেতনার পথ-নির্দেশনা। গণতন্ত্র, সাম্যবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রগতিশীল জীবনদৃষ্টি, রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের প্রশ্নে উচ্চকণ্ঠ আত্মপ্রকাশ আমাদের কবিতা,নাটক,উপন্যাস,গল্প ও প্রবন্ধে শিল্পিত অভিব্যক্তি পেয়েছে। এর ফলে সাহিত্যের চরিত্র যে রাজনৈতিক হয়ে উঠল তা বলা যাবে না। বরং রাজনীতি-সচেতনতা আমাদের অধিকাংশ লেখকের শিল্পব্যক্তিত্ব ও মানসগঠনকে করে তুলল পরিপক্ক ও স্বাবলম্বী।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কবিতার ইতিহাস থেকে আমরা জানি, একটি জাতির আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে প্রকৃত দিকনির্দেশনা দান কবিতার অন্যতম প্রধান ধর্ম। বিশেষ করে উনিশ ও বিশ শতকের পুঁজিবাদী বিশ্ব এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় জাগ্রত দেশগুলোর কবিতার চরিত্র আলাদা হয়ে গেছে। ইংল্যান্ডের কবি টিএস এলিয়ট যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলার সামনে দাঁড়িয়ে চরম হতাশায় লন্ডন ব্রিজের পতনদৃশ্যকে কবিতায় রূপ দিচ্ছেন, তখন সাম্রাজ্যবাদ-কবলিত এ-ভূখণ্ডের কবি কাজী নজরুল ইসলাম একই সময়ে (১৯২২) লিখেছেন, 'বল বীর, বল উন্নত মম শির'। যতীন্দ্রনাথের কবিতাও এ-কারণেই তীব্র অহংবোধ ও সমষ্টিচেতনার বহুমুখী অভিব্যক্তিতে এবং ব্যক্তিসত্তার সমাজলগ্ন আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণের ঐকান্তিকতায় নবতর চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য লাভ করল।সংস্কৃতির সীমা যেমন বহুবিচিত্র তেমনি এর শক্তি-উৎস এবং প্রেরণাদায়ী ক্ষমতাও অপরিসীম। এই শক্তির ব্যাপকতা ও গভীরতা নির্ভর করে কোনো জাতির ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্যের চরিত্র অনুসারে। ইউরোপীয় রেনেসাঁস, ফরাসি বিপ্লব ও রুশ বিপ্লবের ভিত্তি ও কার্যকারণ সৃষ্টিতে ঐসব ভাষা ও সাহিত্য মহাশক্তিধর ভূমিকা পালন করেছিল। সমাজ ও রাজনীতির বস্তুগত পরিবর্তনের ঘনত্ব এইসব ভূমিকার গুরুত্বকে কখনো সামনে নিয়ে আসেনি। বিশেষ করে রেনেসাঁসের যুক্তি ও তত্ত্ব এবং ফরাসি বিপ্লবের সাহিত্যিক প্রেক্ষাপট ও ঘোষণার (Declaration of Rights) ভাষাচরিত্র এমন বিপ্লবাত্মক ও যুগান্তকারী ছিল যে ইউরোপ থেকে শুরু করে সমগ্র সচেতন বিশ্বকে তা প্রবলভাবে নাড়া দিতে সক্ষম হয়। এ থেকেই বোঝা যায়, প্রতিটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতির গভীরে থাকে অবিনাশী বিপ্লবী শক্তি। এই শক্তি পারে যুগান্তর সাধন করতে কিংবা সংগ্রামের কার্যকর চালক হয়ে উঠতে। বাঙালি জীবনের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের তীব্র দুঃখ বাদি কবিতা গুলির প্রভাব সুদূরপ্রসারী। স্বাধীনতা-উত্তর বিগত চার যুগের বাংলাদেশের কবিতা কেবল সামাজিক-রাজনৈতিক বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই বিকাশ লাভ করেনি। ব্যক্তিসত্তা বিকাশের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলোর উন্মোচন, মানব অস্তিত্বের বহুমুখী সংকট আবিষ্কার, নব্য ঔপনিবেশিকতা ও পুঁজিবাদী বিশ্বের ছদ্মবেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শিল্প প্রতিরোধ

রচনা এবং গণতন্ত্র ও মুক্তচেতনা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিগত তিন যুগে আমাদের কবিরা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তার তাৎপর্য অপরিসীম। কাব্যভাষার ব্যক্তিত্বচিহ্নিত প্রয়োগ কবির আত্মপ্রকাশকে করেছে স্বাবলম্বী।ব্যক্তির অহং ও আত্মকেন্দ্রিকতার শব্দরূপ নির্মাণে আমাদের কবি যতীন্দ্রনাথ আত্মনিয়োগ করেছেন। কিন্তু তাঁর কবিতাকে বার বার ফিরে আসতে হয়েছে সমষ্টিজীবনের দুঃখের আঙিনায়।তাঁর কবিতায় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক করুন বাস্তবতাই প্রতিনিয়ত অনিবার্য করে তুলেছে আত্মসন্ধান ও সত্তাসন্ধানের প্রাসঙ্গিকতা। বিগত পঞ্চাশ বছরের কবিতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বাংলাদেশের কবিতার যে মূল লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো সামূহিক জীবনজিজ্ঞাসা। প্রত্যাশা, ব্যর্থতা কিংবা যন্ত্রণাও এখানে সমষ্টিলগ্ন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বাধীনতা-উত্তর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বহুমুখী ভাঙা-গড়া, উত্থান-পতন।অভিজ্ঞতা প্রকাশের স্মারক হিসেবে গ্রহণ করেই প্রথম তিনি কাব্যচর্চা শুরু করেছিলেন। তার-ই ধারাবাহিকতায় আজকের কবি শব্দকে বক্তব্য প্রকাশের বাহন হিসেবে করে তুলেছেন। তিনি যে সব অনুষঙ্গ ব্যবহার করছেন তার সঙ্গে বস্তুর রূপ-রস-গন্ধ-ধর্মের বৈচিত্র্য বর্ণনাই শেষ নয়; যোগ হয়েছে সমকালীন রাজনীতি, সমাজ, সমাজ ব্যবস্থা, সমাজের কাঠামো ও রুচিগত পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের মনোবৈকল্য আধুনিক কবিতার অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। কবিতায় ভৌগলিকচেতনা জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতির বিপুল পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের আচরণে স্বাভাবিক পরিবর্তনের মানচিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি সংশয় প্রকাশ করেননি। হাজার বছরের বাংলা কবিতার ইতিহাসে আধুনিক বাংলা কবিতার যে তাৎপর্যপূর্ণ অহঙ্কার, সমকালীন বাংলা কবিতা সে ক্রমবিবর্তনের একটি মর্যাদাপূর্ণ শাণিত অধ্যায়। যে অধ্যায় কবিতা থেকে অলৌকিতার সব মোহকে বিচ্ছিন্ন করেছে। একইসঙ্গে এঁকেছে বস্তুগত সৌন্দর্য ও ভাববাদের সমন্বিত রূপরেখা। এভাবে যতীন্দ্রনাথের কবিতা হয়ে উঠেছে বহুরৈখিক ও বহুবর্ণিল। কেবল বৃন্তচ্যুত কুঁড়ির সুখ প্রবণতাই কবিতার মৌল প্রেরণা কিংবা বৈশিষ্ট্য নয়। শুধু বিচ্যুতি ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ও ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার বিকৃতি কবির মানস গঠনে ভূমিকা পালন করেনি; সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক উত্থান-পতনের প্রভাব এবং

ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক অনুষঙ্গও ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর কবিতা ভূঁইফোড় কিংবা বায়বীয় কোন বিষয় নয় যে, এ বস্তু প্রথম দর্শনেই পাঠককে সহসা সচকিত করে তুলবে।সেই সময়ের কবিতার শব্দসমবায় বিচারে এবং নির্বিচারে দেশি-বিদেশি শব্দের মিথষ্ক্রিয়ায় ঋদ্ধ হয়ে ওঠে। শব্দকে অতিগীতল স্বভাব ও অতিগদ্যধর্মিতা থেকে মুক্তি দিয়ে প্রাঞ্জলরূপে উপস্থাপন করার যে শৈলী কবি আত্মস্থ করেছেন তাতে কবিতার সঙ্গে গদ্যের ভেদরেখা মুছে দেওয়ার পক্ষে অনেকটা দায়ী।

ভাবালুতা রোমান্টিক কবিদের উদ্বেল করলেওতাঁর মত আধুনিক কবির রুচিকে ধারণ করার মতো কোনো যৌক্তিক প্রপঞ্চ হয়ে উঠতে পারেনি। তার কারণ হয়তো এই আধুনিক মানুষের জীবন অনেকটাই যান্ত্রিক ও নৈরাশ্য গতির। এই যন্ত্রশাসিত গতির যুগে সময়ের সংক্ষিপ্ততম অবসরে ক্রন্দনহীন বিলাপের গুরুত্ব মানুষের কাছে ক্লিশে হয়ে আসে। যতীন্দ্রনাথের মনে কোনো সংবেদ জাগাতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর কবিতার ভাবালুতা উপেক্ষিত। বিশুদ্ধ ভাবাবেগ ও চিন্তার বৈদগ্ধ্য সাদরে গৃহিত হতে থাকে। সে হিসেবে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিতাকে অভিজ্ঞতার স্মারক হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করলেও সেখানে নিরঙ্কুশ বস্তু আনন্দের জয়গান গাননি, সঙ্গে কল্পনাকেও বস্তু সত্যের সামীপ্যে গ্রহণ করার আকাক্সক্ষা পোষণ করেছেন।বাঙালির মানসিকতা মূলত ঔপনিবেশিকতার। দুই একজন যে জ্বলে ওঠননি হঠাৎ দাবানলের মতো তাও নয়। কোনো-কোনো শক্তিমান কবি সার্বভৌম চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কবিতা লিখেছিলেন, জাতির দুর্দিনে অভয় বাণী শোনাতে চেয়েছিলেন। বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক শাসনের পতন হলেও কাল্পনিক প্রতিপক্ষের প্রতি কটাক্ষমূলক বাকচাতুর্যসর্বস্ব শ্লোগান ধর্মী রচনার সাময়িক হিড়িক পড়েছিল। তার পুরোটাই যে বায়বীয় ছিল তা নয়; শাসকবর্গের সীমাহীন দুর্নীতি ও প্রতিক্রিয়াশীলদের পুনরুত্থানে জাতীয় জীবনে বিভ্রান্তির মেঘাবরণ সাময়িকভাবে হলেও পড়েছিল। স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে কবিরা সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন আপন-আপন স্বভাবের স্বাতন্ত্র্যে। তবে বহু কবি রাজনীতিশ্লিষ্ট বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে কবিতা থেকে স্লোগানকে পৃথক করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।যতীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম তদুপরি তাঁর কাছে প্রগতিশীল ও

প্রতিক্রিয়াশীল চেতনার আদর্শিক দ্বন্দ্ব ও বড় হয়ে উঠেছিল। মননশীলতা ও সৃজনশীলতার অঞ্চলগুলো দ্বিধাবিভক্ত হতে শুরু করে। তার রেশ আজকের কবিতায়ও প্রবহমান। কবি ঔপনিবেশিক মনস্তত্বের মূলে কুড়াল মেরে বিশ্বায়নের যুগে নিজেকে বিশ্ব নাগরিক হিসেবে আত্ম উন্মচনের দ্বার উন্মুক্ত করার পক্ষে। ফলে আজকের কবিতায় প্রগতিশীল-প্রতিক্রিয়াশীল চেতনার চর্বিত চর্বনের চেয়ে বড় হয়ে উঠে সার্বভৌম চেতনাকে বৈশ্বিক চেতনায় উন্নীত করার চিন্তা ও চেতনার নিরন্তর পরিচর্যার প্রক্রিয়া।

সমকালীন বিশ্ব রাজনীতি, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, যুদ্ধবিগ্রহসহ নানা ঘটনার ফলে কবি মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কে তাৎক্ষণিক অনুভূতি প্রকাশের তাড়নায় কাতর হয়ে সঙ্গতকারণে ব্যতিক্রম কোনো প্রকরণ বা আঙ্গিকের উপস্থাপনায় পাঠককে চমকে দেওয়ার জন্য ব্যকুল হয়ে ওঠেন। তাই সস্তা জনপ্রিয়তার মোহ কবিকে আচ্ছন্ন না করে পারে না। ফলে কবিতার তন্বী-তরুণীর মনের সংবাদ জানার আগেই রূপের দ্যুতি দেখেই কবি বিস্ময় বিস্ফরিত হয়ে তাকিয়ে থাকেন। অন্যকেও সে দৃশ্য দেখানোর চেষ্টা করে।মানুষের অসহায়তা, ক্ষণিক আনন্দের বিভ্রম, বিরহের অনলসুখ, অথর্ব মানুষের মোড়লীপনা, মানবিক প্রেম, মনোবৈকল্য, হ্লেপ্রবণতা, কাম ও কামশীতলতা, প্রকৃতির খেয়ালিপনা, নিষ্ঠুরতা ও নান্দনিক রূপরাশির চিত্র অঙ্কন করার পাশাপাশি নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা স্বাক্ষর রয়েছে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায়। সে সঙ্গে উপমার প্রাতিস্বিকতা এবং চিত্রকল্পের নৈপুণ্য কবিতাকে ব্যঞ্জনাঋদ্ধ করেছে। কবি শব্দ নির্বাচন ও শব্দ গঠনে স্বতস্ফূর্ত, কিন্তু পরিশ্রমী; নিটোল চিত্রকল্প নির্মাণে সিদ্ধহস্ত। প্রথাগত ধারণা ও চিত্রকল্পের বিপরীতে স্বতন্ত্র ও মৌলিক চিন্তার দ্যুতি প্রকাশ এবং চিত্রকল্প নির্মাণে তিনি সচেতন। সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও প্রগতির-ইতিহাস দিয়ে শুরু করে তিনি নিজের জন্য একটি শক্ত অবস্থান নির্মাণ করেছেন সহজে। কেরামান কাতেবিনকে দ্রাবিড়ীয় লিপিকারেই পরিণত করেছেন কোনো-কোনো কবি। ধর্মীয় বিশ্বাস বিতর্কে অধিকাংশ কবি নিস্পৃহ। কোনো অযাচিত বিতর্কে জড়ানোর উদ্দেশ্য তাদের নেই। বাক-সংহতি তাদের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তালিকা প্রধান কবিতা কিংবা বিবরণ

ধর্মিতাকে তারা এড়িয়ে চলেন। স্বদেশের জলবায়ু, প্রকৃতি, নিসর্গকে কেন্দ্রে রেখে প্রান্তে বিশ্ব চরাচরের নানা প্রপঞ্চকে মূর্ত করে তোলার আকাঙ্ক্ষা তাদের করোটিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।অন্যদিকে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তেরকবিতা আপামর জনরুচির পক্ষে সহায়ক না হলেও বোদ্ধা ও দীক্ষিত পাঠক শ্রেণীকে প্রাণিত করে। কবিতা কোনো সংকট মোকাবিলা করে না; করে না সমাধানও। কবিতার উদ্দেশ্য নিয়ে দুর্ভাবনায় সময় ব্যয় করাও অবান্তর। সৎ কবিতা স্থান-কাল-নৈতিকতা নিরপেক্ষ প্রপঞ্চ; তাই এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলাও সঙ্গত নয়। কালের প্রধান অসুখ নৈতিক অবক্ষয় ও ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার অবস্থান্তরের প্রভাব কবির মনোভূমিকে আচ্ছন্ন না করে পারে না। সমাজের বিভিন্ন পরিবর্তন তার লেখায় ফুটে ওঠে অনিবার্য পরিণতির মতোই।কেবল সমাজ ও সমাজস্থ মানুষের বাহ্যিক আচরণ ও সংস্কৃতিই নয়; সঙ্গে মনস্তাত্বিক পটভূমিও কবির হৃদয়কে আন্দোলিত করে। কবি বিস্ময়-বিস্ফরিত চোখে দেখেন প্রকৃতির সমস্ত লীলা, সঙ্গতি-অসঙ্গতি। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রচলিত অর্থে দুখিবাদি কবি কার্যত বিষণ্ণতা তাঁর কাছে ধ্রুবসত্য কারন অসংখ্য বিভ্রান্ত মানুষ সময়ের নিষ্ঠুরতার কাছে হার মেনে জীবনকে অন্যতর দৃষ্টিকোন থেকে পর্যবেক্ষণের কথা ভাবছেন আর তিনিও তাঁদের মধ্যে একজন যাত্রী।

৪.৪ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১- ভারতী পত্রিকা কবে প্রকাশিত হয়?

ভারতী পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ (১২৮৪ বঙ্গাব্দে) (১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে)

২- ভারতী পত্রিকা টি কে সম্পাদনা করেন?

ভারতী পত্রিকা টি প্রথম সম্পাদনা করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩- ভারতী পত্রিকা টির অন্যতম উল্লেখ যোগ্য কীর্তি কি?

মন্তব্য

ভারতী পত্রিকা টির অন্যতম উল্লেখ যোগ্য কীর্তি হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা প্রথম ছোট গল্প ‘ভিখারিণী’ এই পত্রিকায় প্রকাশ পায়।

৪.৫ অনুশীলনী প্রশ্ন

১- ভারতী পত্রিকার সম্পাদনার কাহিনী ও ভারতী পত্রিকার ইতিহাস সংক্ষিপ্ত রূপে আলোচনা কর।

২- বাংলা সাহিত্যে ভারতী পত্রিকার অবদান উল্লেখ কর।

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জী

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এর শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন- বি.সরকার,

বাংলা কাব্য সাহিত্যের বিচার- সুস্মিতা দে।

একক-৫ জীবনানন্দ দাশ -কাব্য যাত্রা(১৮৯৯ – ১৯৫৪)

বিন্যাস ক্রম

৫.১ ভূমিকা

৫.২ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

৫.৩ অনুশীলনী প্রশ্ন

৫.৪ গ্রন্থপঞ্জী

৫.১ ভূমিকা

বিশ শতকের জটিল মনের আশ্চর্য প্রতীক জীবনানন্দ দাশ। রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল বিশ্বাস আশাবাদ জীবনানন্দের ছিলনা ,থাকার কথাও নয়। তিনি যে যুগের মানুষ সে যুগে'' যক্ষ্মায় ধুঁকে মরে মানুষের মন''। তাই রবীন্দ্র যুগে বসে তিনি একটি নিজের জগত গড়তে চেয়েছেন আর পেরেছেনও। রবীন্দ্রানুসারি কবি সমাজ তাঁর কাছে উৎসবের কবি। অন্যদিকে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নেতিমূলক জীবনা দর্শন তাঁর কাছে গ্রহণীয় নয়। আবার তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্রের মত বলতে চান না যে'' আমি কবি ইতরের''। কিংবা বুদ্ধদেব বসুর মত নারীর প্রতি অনুরাগ বিরাগ নিয়ে কাব্য রচনা করতে পারেন না ,কেননা তাঁর-

"মাথার ভিতরে

স্বপ্ন নয় -প্রেম নয় -কোন এক বোধ কাজ করে''।

তিনি বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ছায়া থেকে বেরিয়ে আসা প্রধানতম কবি।তিনি কলকাতায় এক ট্রাম দুর্ঘটনায় যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন তাঁর বয়স ৫৫ বছর। তাঁর

এই নাতিদীর্ঘ জীবনের শেষ বছরটি ছাড়া একটা ভদ্রোজনোচিত কর্মসংস্থানের জন্য তিনি তাঁর শিক্ষা-পরবর্তী জীবনের বিশাল একটা অংশ পার করেছেন বেকারত্বের এবং দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে। জীবদ্দশায় তাঁর কাব্য প্রতিভার পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন হয়নি, যতটুকু মূল্যায়ন হয়েছে বুদ্ধদেব বসু প্রমুখদের দ্বারা, তার চেয়ে ঢের বেশি হয়েছে বিরূপ সমালোচনা ও তাচ্ছিল্য। এই সঠিক মূল্যায়নের কিছুটা আস্বাদ তিনি লাভ করতে শুরু করেছিলেন মৃত্যুর মাত্র কয়েক বছর আগে থেকে। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে নিয়তি তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছিল, তিনি পেয়েছিলেন একটা ভদ্রোচিত জীবিকার সন্ধান, পাঠক ও সম্পাদক মহলে পেয়েছিলেন সমাদর ও স্বীকৃতি। নিভৃতচারী এবং 'নির্জনতম' এই কবির যে বিপুল অপ্রকাশিত রচনা তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে আবিষ্কৃত হয়, তাতে তাঁর প্রচারবিমুখতা প্রমাণিত হয় বটে, কিন্তু তাঁকে পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নের অবকাশও পাওয়া যায় তাঁর রচনার সমগ্রতা থেকে।

জীবনানন্দ মানসিক গঠনে মুখচোরা ও লাজুক স্বভাবের হলেও আমাদের স্মরণে রাখতে হবে— তাঁর মা কুসুমকুমারী দাশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খুব সামান্য হলেও তিনি ছিলেন কবি। তাঁর পিতা সত্যানন্দ দাশ কবি না হলেও ছিলেন স্কুলশিক্ষক ও ধর্মযাজক (ব্রাহ্ম)। জীবনানন্দ তাঁর পিতা সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'প্রায় রোজ শেষ রাতে বিশেষত হেমন্ত ও শীতকালে উপনিষদের শ্লোক আওড়াতে আওড়াতে তিনি আমাদের অপরূপ সূর্যচেতনার প্রভাতে নিয়ে আসতেন।' মা-বাবার এ গুণের যুগলবন্ধনে জীবনানন্দের ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল। তাঁদের পরিবারেও ছিল সাহিত্যচর্চার উপযুক্ত পরিবেশ। ফলে জীবনানন্দ খুব অল্প বয়স থেকেই কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন। সেসব অপক্ক কবিতা কখনই পাওয়া যায়নি। তবে ছোট ভাই অশোকানন্দ স্মৃতি থেকে তাঁর কিশোর অগ্রজের কাব্যপ্রয়াসের প্রমাণ দিয়েছেন একটা কবিতার দুটো লাইন উদ্ধৃত করে: 'এল বুঝি বৃষ্টি এল/ পায়রাগুলো উড়ে যায় কার্নিশের দিকে এলোমেলো।' কিশোর জীবনানন্দের বাগান করার শখও ছিল প্রবল। এখনকার সময়ের মতো তখন বরিশালে এত নার্সারি ছিল না হয়তো। তাই তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়ি থেকে ফুলের বীজ বা চারা জোগাড় করে আনতেন। কখনো কাউকে দিয়ে কলকাতা থেকেও বীজ আনাতেন তিনি। স্কুলে

পড়ার সময় তিনি যে কবিতা চর্চা শুরু করেছিলেন, সেটি কলেজে গিয়েও অব্যাহত রেখেছিলেন। সে সময় ইংরেজিতেও কবিতা লিখতেন তিনি। একই সঙ্গে কিছু গানও রচনা করেছিলেন। জীবনানন্দের প্রথম জীবনীকার গোপালচন্দ্র রায়ের তথ্যসূত্রে জানা যায়, স্কুলের উপরের ক্লাসে থাকতেই ছবি আঁকতে শুরু করেছিলেন তিনি, তবে সেগুলোর সবই পেন্সিল স্কেচ। এ প্রসঙ্গে তাঁর ছোট বোন সুচরিতা দাশ লিখেছেন, 'তাঁর ছবি আঁকার নেশা ছিল, আলতো পেনসিলের মৃদু চঞ্চলতার অস্ফুট আলোছায়াময় কতই না ছবি ফুটে উঠত।' তাঁর সেই সময়ের কবিতা, গান বা চিত্রকর্ম— কিছুই পরবর্তী সময়ে আর পাওয়া যায়নি। তবে এটুকু নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে, ছাপার অক্ষরে তাঁর প্রথম কবিতা ছিল 'বর্ষ-আবাহন', এটি ছাপা হয়েছিল বরিশালের ব্রাহ্ম সমাজ থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা ব্রহ্মবাদীর ১৩২৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায়। মজার বিষয়, কবিতাটি জীবনানন্দের নামে ছাপা হয়নি, রচয়িতার নামের জায়গায় কেবল ছিল 'শ্রী...।' বছর শেষে সারা বছরের লেখকদের যে সূচি ছাপা হয়, তাতেই দেখা যায় কবিতাটির রচয়িতা ছিলেন তিনি।

জীবনানন্দের প্রকাশিত প্রথম কাব্যপ্রয়াসে ছদ্মনামের ব্যবহার আমাদের আবার স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁর লাজুক স্বভাবের কথা, কিংবা হতে পারে কবিতাটি নিয়ে তাঁর সংশয় ছিল। এমনো হতে পারে কবিতাটি কারো অনুরোধ বা নির্দেশে লিখেছিলেন বলে তিনি নিজের নামটা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। এসব ধারণার সঙ্গে গোপালচন্দ্র রায়ের অভিমত, 'যেহেতু ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মদের পত্রিকা এবং জীবনানন্দ নিজে ব্রাহ্ম হলেও ব্রাহ্মদের আচার অনুষ্ঠান, এমনকি সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানই এড়িয়ে চলতে ভালবাসতেন, সেই জন্যই হয়ত ঐ পত্রিকায় নাম প্রকাশ করতে চাননি।'

জীবনের প্রথম প্রকাশিত কবিতাটিতে নিজেকে অপ্রকাশ্য রাখার যে চেষ্টা দেখা গেল, সেটি কেবল বিভিন্নজনের ভাষ্য অনুযায়ী তাঁর অমিশুক নিভৃতচারী স্বভাবের সঙ্গেই সমিল নয়, মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে আবিষ্কৃত তাঁর বিপুল অপ্রকাশিত রচনাসম্ভার লোকচক্ষুর আড়ালে রেখে দেয়ার বিষয়টিকেও তার সঙ্গে সম্পর্কিত করা যায়। তাঁর

গোপনে সংরক্ষিত লেখাগুলো নিয়ে কি তবে তাঁর সংশয় ছিল কিংবা ছিল কি কোনো অতৃপ্তি? তা না হলে তাঁর জীবদ্দশায় সেসব প্রকাশের কোনো ব্যবস্থা কিংবা কোনো তাগিদ অনুভব করেননি কেন তিনি? এসব প্রশ্নের জবাব আর কখনই পাওয়া যাবে না।

সকলে জানি, জীবনানন্দ ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স পাস করেছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে। এ ফলাফল নিশ্চয়ই তাঁর কাম্য ছিল না। তবে এ উপলক্ষে সর্বানন্দ দাশের দৌহিত্র ও দৌহিত্রীরা বিএ, বিএসসি ও এমএ পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে সর্বানন্দ ভবনে এক বিশেষ ব্রাহ্ম ধ্যানানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। তিনি যখন এমএ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন অসুখে পড়েন, সে কারণে তাঁর প্রস্তুতি ভালো ছিল না। জীবনানন্দ চেয়েছিলেন সে বছর পরীক্ষাটা না দিয়ে পরের বছর আরো ভালো প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষায় বসতে, যাতে প্রথম শ্রেণী নিশ্চিত হয়। কিন্তু তাঁর বাবা ছেলের একটি বছর সময় নষ্ট করার পক্ষপাতী ছিলেন না, তাই ছেলেকে তিনি উপদেশ দেন যাতে সে বছরই পরীক্ষাটা দিয়ে ফেলেন। ভালো প্রস্তুতি না থাকায় এমএ-তেও জীবনানন্দ দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস করেন। জীবনানন্দের চরিত্রের এ দিকটি লক্ষণীয়, কারণ একজন প্রাপ্তবয়স্ক যুবক শিক্ষাজীবনের শেষে এসেও পিতার উপদেশ শিরোধার্য করে জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বদলে দিচ্ছে। পিতার উপদেশ মেনে নিতে গিয়ে কাঙ্ক্ষিত ফল থেকে বঞ্চিত হওয়া নিয়ে তাঁর খেদ ছিল কিনা আমরা জানি না, কিন্তু একটি প্রথম শ্রেণী না থাকায় তিনি কোথাও শিক্ষকতার চাকরি জোটাতে পারছিলেন না। একাধিকবার কলেজ ও সংবাদপত্রের (স্বরাজ) চাকরি থেকে পদচ্যুত হওয়ার পর দারিদ্র্য তাঁর পিছু ছাড়ছিল না। সেই দুর্বিষহ বেকার জীবনে তাঁকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যেকোনো ধরনের কাজ করতে হয়েছে, এমনকি ইন্স্যুরেন্সের দালালির মতো চরম অসম্মানজনক কাজও করেছিলেন তিনি। সেই বেকারত্ব, প্রথম শ্রেণী না পাওয়ার আক্ষেপ এবং অর্থকষ্ট তাঁকে তাড়া করে ফিরেছে আমৃত্যু। তাঁর সে সময়কার হীনম্মন্যতা ও মানসিক অবস্থার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় অশোক মিত্রের লেখায়, "জীবনানন্দের সঙ্গেও কলকাতায় এলে নিয়মিত

দেখা হতো, তিনি ক্রমশ উদভ্রান্ত, ক্রমশ আত্মবিশ্বাসরহিত। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্র, যেমন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সচ্ছলতার মুখ দেখেছেন... অথচ তিনি নিজে একটি ভদ্রগোছের অধ্যাপনার কাজ পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারছেন না। পরিচিত এঁকে-তাঁকে ধরেও কোনো ফল হচ্ছে না, আমরা যাঁরা তাঁর ভক্ত শুভানুধ্যায়ী, তাঁরাও কিছু করে উঠতে পারছি না। একদিন, বর্ষার এক সন্ধ্যা, রাসবিহারী এভিনিউর প্রায় মোড়ে, ল্যান্সডাইন রোডের গলিতে তাঁর একতলার ফ্ল্যাটের বহির্দুয়ার দিয়ে ঢুকেছি, হঠাত্ আমাকে টেনে এক কোণে, নিচু নিমগাছের ডালের আড়ালে নিয়ে গেলেন, কানে-কানে তাঁর অস্ফুট প্রশ্ন: 'আচ্ছা, আপনি কি জানেন, বুদ্ধদেব বাবুর নাকি পঞ্চাশ হাজার টাকার ফিক্সড আছে?' ('আপিলা চাপিলা', আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা)।"

একজন ইংরেজির অধ্যাপনা চাকরিপ্রার্থী প্রথম শ্রেণীবঞ্চিত মানুষের এই যন্ত্রণা, হতাশা ও আক্ষেপ প্রতিফলিত হয়েছে জীবনানন্দের 'জলপাইহাটি' উপন্যাসে। উল্লেখ্য, 'মাল্যবান' কিংবা 'জলপাইহাটি' উপন্যাসদ্বয়কে যেমন জীবনানন্দের আত্মজীবনীমূলক বলে সহজে চিহ্নিত করা যায়, 'সুতীর্থ'-কে শুরুতে তেমনটি মনে হলেও পরে সেই ধারণা আর থাকে না। তবে উপন্যাসটির শুরুতে পেশাগত জীবনের চাপে এবং সময়ের অভাবে একজন কবি যে লেখা ছেড়ে দিয়েছেন, সে ইঙ্গিত আছে। এমনকি তাঁর নিকটতম দোসর দারিদ্র্যই যে কবিতা লেখা ছেড়ে দেয়ার মূল কারণ, সে কথাও আছে এভাবে, "... নিজে অনেক দিন থেকে কিছু লিখছে না বটে কিন্তু সেটা অক্ষমতার জন্যে নয়, অবসরের অভাবে। অর্থের সচ্ছলতা নেই। এই নিরেট পৃথিবীতে টাকা রোজগার করতে গিয়ে মূর্খ ও বেকুবদের সঙ্গে দিন-রাত গা ঘেঁষাঘেঁষি করে মনের শান্তিসমতা যায় নষ্ট হয়ে।'

আমরা জীবনানন্দের জীবনসমগ্র যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাই, কৈশোরে কবিতা লেখা, ফুলের বাগান করা, ছবি আঁকার চেষ্টা করা, তারুণ্যে ও যৌবনে কবিতার চর্চা করা একজন মানুষ কেবল পেশাগত অনিশ্চয়তা এবং আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে হীনম্মন্য হয়ে যাচ্ছেন তা নয়। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া বিভিন্নজনের ভাষ্যে জানা যায়,

তিনি ছিলেন কিছুটা খাপছাড়া, যথেষ্ট মুখচোরা এবং সবার্থে আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন একজন মানুষ। তাঁর খাপছাড়া চরিত্রের আভাস মেলে সর্বশেষ কর্মস্থল হাওড়া গার্লস কলেজ থেকে আচমকা উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনায়। তাঁর আগের কর্মস্থল থেকে নানা ছুতোয় অনুপস্থিত থাকার বহু কারণ ছিল, কিন্তু বহুদিন বেকার থাকার পর তাঁর পছন্দসই একটা চাকরি জোটার পরও তিনি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিক কিংবা মৌখিক অনুমোদন না নিয়ে হাওড়া থেকে দিল্লির মতো দূরত্বে চলে যাওয়ার ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থে বাস্তবরহিত খাপছাড়া এক কবি। এমনকি জীবনানন্দের প্রথম জীবনীকার গোপালচন্দ্র রায়ের মতে, হাওড়া গার্লস কলেজের চাকরির জন্য তিনি প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করতেও অনিচ্ছুক ছিলেন এবং দেখা করেনওনি। পরে জীবনানন্দ যখন প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করেন, তিনি তাঁকে শুধু একটা দরখাস্ত পূরণ করতে বলে জানিয়ে দেন যে তাঁকে নিয়োগ দেয়া হবে। তাঁর কবিখ্যাতির কারণেই বোধকরি খুব দ্রুত চার-পাঁচজনকে ডিঙিয়ে বিভাগীয় প্রধান করে দেয়া হয় তাঁকে। ভাইস প্রিন্সিপাল করার কথাও বিবেচনা করা হচ্ছিল একসময়। গোপালচন্দ্র জানান, এ প্রস্তাবে জীবনানন্দ রাজি না হয়ে বরং বলেছিলেন, ‘আর না, বেশ আছি।’জীবনানন্দ দাশ কবি ও সাহিত্য সমালোচকের জন্য ইংরেজি শেখার আবশ্যকতা অনুভব করেছিলেন। ‘দেশ কাল ও কবিতা’ শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি এ ব্যাপারে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। বাংলা কবিতার মঙ্গলার্থে ইংরেজি জানার ওপর জোর দিয়েছিলেন। তবে তিনি বিশ্বাস করেন নি, ইংরেজি কবিতা জগতের উৎকৃষ্ট। তার ভাবনা ছিল, ইংরেজি বিশ্বভাষা হওয়ার সুবাদে অন্য ভাষার মহৎ সাহিত্যও এ ভাষার মাধ্যমে জানা সম্ভব। পঠন ও পাঠদানের ক্ষেত্রে ইংরেজিয়ানা তাকে প্রাত্যহিক মানব সমাজের সঙ্গে যুক্ত করেছিল।বড় মানুষের জীবন ও কর্ম নিয়ে আমরা সব সময় নির্ভয় হয়ে বলতে পারি না। সত্যের পাশাপাশি একটি প্রক্ষিপ্ত চরিতও তাদের আচ্ছন্ন করে রাখে। অলস পাঠকের ক্ষেত্রে, শ্রুতি মুগ্ধকের ক্ষেত্রে সেটিই একমাত্র আশ্রয়। বুদ্ধদেব বসু জীবনের শুরুতেই জীবনানন্দ দাশকে ‘নির্জনতার কবি’ বলে জনসমাজ কে জানিয়ে দিয়েছিলেন। যার কপি বাঙালি পাঠক বগলদাবা করে ঘুরছেন। জাতি

হিসেবে আসল বইয়ের চেয়ে নোটের কদর বাঙালির কাছে কিছুটা বেশি। তবে বুদ্ধদেব বসু ছিলেন একজন সৎ সমালোচক। জীবনানন্দ দাশকে পাঠকের সামনে এনে দেয়ার প্রথম সাহসী কাজটি তিনি করেছিলেন।ধূসর পান্ডুলিপি গ্রন্থ আকারে প্রকাশের আগেই বুদ্ধদেব বসু 'প্রগতি' পত্রিকায় জীবনানন্দের নতুনত্বের সপক্ষে কলম ধরেছিলেন। জীবনানন্দ মৃত্যুর বহু বছর পরেও উপেক্ষিত ছিলেন, তার প্রমাণ মিলবে ১৯৭২ সালে ভারতে আকাদেমির আয়োজনে বাঙালি কবিদের একটি হিন্দি সংস্করণে। জীবনানন্দের দুই দশক পরের কবিরাও সেখানে ঠাঁই পেয়েছিলেন কিন্তু জীবনানন্দ ছাড়া। এমনকি কবিগুরুর সবার প্রতি অবারিত আশীর্বাদও জীবনানন্দের জন্য অবিমিশ্র ছিল না। একটু বিরক্ত হয়েই যেন বলেছিলেন— 'তোমার কবিত্বশক্তি আছে তাতে সন্দেহমাত্র নাই। — কিন্তু ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এত জবরদস্তি করো কেন বুঝতে পারিনে।'

অথচ ভাষা নিয়ে জবরদস্তি ও তাকে বশ মানাতে পারাই তো বড় কবির কাজ। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমাপের হওয়া সত্ত্বেও কোথায় যেন বিশেষ করে ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার মধ্যে কিছুটা রক্ষণশীলতা কাজ করেছে। সম্ভবত বাংলা ভাষার শক্তি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কিছুটা সংশয়ও ছিল; নিজের কৃতিত্বে নোবেল পাওয়া সত্ত্বেও বাংলা সর্বভারতীয় ভাষার দাবিদার হওয়ার ব্যাপারে তিনি দ্বিধাহীন হতে পারেন নি। জীবনানন্দ কিন্তু অবলীলায় বলেছিলেন :

"বাংলা যে রকম ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র ভাষার স্থান স্বভাবতই প্রাপ্য"।

জীবনানন্দকে উপেক্ষার কারণ সম্ভবত—তিনি অন্য কারো মতো নন—বাংলা কবিতায় অপ্রচলিতের প্রবর্তক তিনি। হয়তো কবিমাত্রই অবজ্ঞার শিকার—বিখ্যাত না হলে সেই সব শীতলতা আমাদের অজানা থেকে যায়। মাইকেল রবীন্দ্রনাথ নজরুলের মতো জীবনানন্দও ছিলেন প্রাতিস্বিক—আপন বৈশিষ্ট্যে আলাদা। তাদের জীবন-যাপন ধর্ম ও বিশ্বাস; তাদের রচনার বিষয় ও আঙ্গিক তাদের নিজেদের। বাংলা কবিতার এই চার

প্রধান পুরোহিত প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে আসেন নি। গভীর অর্থে এই চারজনই বিদ্রোহী ও বৃত্তবিরোধী—চেতনায় ও প্রকরণে।

তবে অসতর্ক প্রচারণায় ক্ষতি যা হওয়ার তাই হয়েছে। বলা হয়েছে, জীবনানন্দ দাশ পরিচিত মানুষের সঙ্গে দেখা হওয়ার ভয়ে কিছুটা রাস্তা ঘুরে আসতেও ইতস্তত করতেন না। অতিথির কথা না ভেবেই ঘরে রাখা একটিমাত্র চেয়ারে বসে পড়তেন। রাত জেগে শিশিরের শব্দ শুনতেন। এসবই হয়তো সত্য—তবে এই এলিয়টভক্ত রবীন্দ্রপূজকের পক্ষে সর্বৈব সত্য হওয়া কি সম্ভব? তাছাড়া জীবনানন্দের সমকালীন কিংবা তার পরবর্তী বিশ্বের কবিরা যখন রাষ্ট্রদূত থেকে শৈল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরছেন তখন জীবনানন্দ দাশ কেবলই কবি, তাই বা কতখানি আদরণীয়? মিরোস্লাব হোলুবের ডাক্তারি, নেরুদার কূটনীতি, নিকানোর পাররার পদার্থবিজ্ঞান—সমকালে প্রচারিত ছিল। অথচ জীবনানন্দ জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন—সেই সত্য মানতে আমাদের কষ্ট হয়। কবিপত্নী লাবণ্য দাশ জীবনানন্দ দাশের এই নিস্ক্রিয়-মূর্তির বিরোধিতা করেছিলেন—'অনেকে বলেন, তিনি নিপাট ভালো মানুষ—কোনো দিকে তার দৃষ্টি ছিল না ইত্যাদি। এ সব যখন শুনি, বা পড়ি, তখন আমার খানিকটা অদ্ভুত লাগে। কারণ ওই ছবিতে আমি যেন আমার অচেনা ব্যক্তিত্বহীন একজন সাজানো সৌখিন কবির তৈরি করা ছবি দেখতে পাই। আমি ওই ব্যক্তিত্বহীন জীবনানন্দকে সত্যিই চিনি না।'

জীবনানন্দ দাশের বিচিত্র ও বিশাল সাহিত্যকর্মের সবটুকু এখনো আমাদের কাছে এসে পৌঁছে নি। আবদুল মান্নান সৈয়দ কিংবা ভূমেন্দ্র গুহ সহ দু-একজন পরিশ্রমী সাহিত্য সমালোচকের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যে সব তথ্য এসে পৌঁছেছে তার আলোকে বলা যায়, জীবনানন্দের হৃদয় সংবেদ সমকালীন অপরাপর কবির চেয়ে সূক্ষ্ম ও গভীর। কিন্তু কবি হিসেবে তার যিশুভাবমূর্তি আমাদের হতাশ করে। এটি বিচার করে দেখার সময় এসেছে। যিশুকে নিয়ে 'লাস্ট টেম্পটেশন অফ ক্রাইস্ট' ছবিতে কিন্তু বাম গালে চড় খেয়ে ডান গাল পেতে দিতে দেখা যায় নি। রীতিমতো

বিদ্রোহী—তা না হলে ইহুদি যাজকদের ক্ষমা ডাকাত বারাব্বাকে ছুঁয়ে গেলেও শুঁকে অস্পর্শ রেখে দেয়! যে ক্রুশে তাকে বিদ্ধ করা হয় তাতে 'সিডিশন' লেখা ছিল।

জীবনানন্দের আত্মসম্মানবোধ কেমন প্রখর ছিল, সে প্রসঙ্গে গোপালচন্দ্র রায়ের লেখা থেকে জানা যায়, জীবনানন্দ যখন বরিশাল বিএম কলেজের অধ্যাপক, তখন সেখানে এসডিও হয়ে এসেছিলেন অবনীমোহন কুশারী। তিনি ছিলেন জীবনানন্দের কবিতার একজন একনিষ্ঠ ভক্ত। অবনীমোহন একবার তাঁর দাফতরিক কাজে কয়েক দিনের জন্য সরকারি বোটে যাত্রা করেছিলেন বিভিন্ন এলাকা সফরে, সঙ্গে নিয়েছিলেন জীবনানন্দ এবং তাঁর সহকর্মী হেরম্ব চক্রবর্তীকে। সেই ভ্রমণের সুবাদে কবি উপভোগ করেছিলেন বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। কিন্তু অবনীমোহন যতই তাঁর কবিতার অনুরাগী হন না কেন, তাঁদের যাত্রাবিরতির সময় স্থানীয় মানুষ স্বভাবতই এসডিওর মতো একজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ হতে চাইবেন, সে সময় এসডিওর সঙ্গে থাকা মানুষদের অবস্থান তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র দেখায়। এ বিষয়ে হেরম্ব চক্রবর্তীর মনোভাব জানা না গেলেও জীবনানন্দ অবনীমোহনের তুলনায় তাঁর খাটো অবস্থানটা মেনে নিতে পারেননি, তাই পুরো সফরসূচি শেষ না করে ফিরতি লঞ্চে বরিশাল ফিরে এসেছিলেন তিনি।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সবচেয়ে নির্জন, সবচেয়ে স্বতন্ত্র।' বুদ্ধদেব বসুর এ কথায় জীবনানন্দ একদিন তাঁর সহকর্মী অধ্যাপক নিরঞ্জন চৌধুরীকে বলেছিলেন, 'নির্জন কবি, নির্জন কবি বলে বুদ্ধদেব বসু আমার সম্বন্ধে একটা লিজেন্ড খাড়া করেছেন, যেটা আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঠিক নয়।' অথচ জীবনানন্দের সঙ্গে মিশেছেন এমন অনেকের ভাষ্যে জানা যায়, তিনি কোনো অর্থেই সামাজিক ও মিশুক প্রকৃতির ছিলেন না। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'সে যেন এই সংগ্রাম-সংকুল সংসারের জন্য নয়, সে সংসার-পলাতক।... যেখানে অনাহূত ধ্বনি ও অলিখিত রং জীবনানন্দের আড্ডা সেইখানে (কল্লোল যুগ)।' এ মন্তব্যের সূত্র ধরেই হয়তো জীবনানন্দের ছোট বোন সুচরিতা দাশ

তাঁর মৃত্যুর পর লিখেছিলেন, ‘দাদার সম্পর্কে অনেক জনশ্রুতি প্রচলিত। তিনি জীবন থেকে পালিয়েছেন। তিনি মানুষের সখ্য সহ্য করতে পারেন না। তিনি নির্জন, তিনি নিরিবিলি। সব কোলাহল থেকে দূরে। এসব বাক্য গঠনের সত্য-সত্যতা কতটুকু তা আমার বিবেচ্য নয়, যদিও এসবের অনেকগুলোই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে হয়ত এতদিন।’

সবার কাছ দূরে থাকার মনোভাবটি জীবনানন্দ পোষণ করতেন আত্মসম্মানবোধ থেকে, তাঁর ধারণা ছিল অনেকের সাথে মিশতে গেলে আত্মসম্মানের বিষয়টি কোনো কোনো সময় উপেক্ষা করতে হয়, এটি তিনি মেনে নিতে পারতেন না। তাই তিনি হয়ে উঠেছিলেন সবার থেকে স্বতন্ত্র, একাকী ও নিভৃতচারী। তাঁর এই স্বভাব তাঁকে কী দিয়েছিল কেউ জানে না, কিন্তু বাংলা কবিতাকে দিয়েছিল নতুন মাত্রার সন্ধান। তাই তিনি লিখতে পারেন, ‘প্রকৃতির আবিল কিছু, তবু মানুষের প্রয়োজন মতো তাতে নির্মলতা আছে।তাঁর কাব্য যাত্রায় উল্লেখ যোগ্য কাব্য গ্রন্থ্য গুলি হল‘‘ -ঝরা পালক ’’)১৯২৭‘‘ ,(ধূসর পাণ্ডুলিপি) ’’১৯৩৬‘‘ ,(রূপসী বাংলা) ’’১৯৫৭‘‘ ,(বনলতা সেন ’’)১৯৪২(। তিনি কাব্য জগতের স্থির আদর্শ ও প্রত্যয় নিয়ে যতটা না নিজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তাঁর থেকে অনেক বেশি পরবর্তী কাল কে প্রবাহিত করেছেন। এই প্রভাব এসেছে দুই দিক থেকে এক -ইতিহাস চেতনাকে আশ্রয় করে ও দুই -শিল্পের আঙ্গিক ও প্রকরন থেকে। জীবনানন্দ ও জীবনানন্দ উত্তর কবি দের মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে। তিনি বিদেশী কবি গণের থেকে আধুনিক মনের প্রেরনা লাভ করেছেন ,ফরাসি প্রতীকী কবি ইংরেজি কবি ইয়েটস ,এলিয়ট এর কাছ থেকে হৃদয়ের টান আনুভব করেছেন কিন্তু আধুনিক কবিদের মত ঐতিহ্য বিচ্যুত নন। বিশেষত রবীন্দ্র কাব্যের ওপর তাঁর বিশেষ নির্ভরতা আছে। এই নির্ভরতা তাঁকে নিয়ে গেছে প্রকৃতি চেতনার অন্তরে ইন্দ্রায়নুভুতির স্তর পার হয়ে বোধের গভীরে। সেখানে বনলতা সেন ,ধানসিঁড়ি নদী ,সুরঞ্জনা চিরকালীন দীপ্তি নিয়ে ভাস্বর হয়ে আছে। মুহূর্তের আনন্দময় অনুভূতি যেন সুখ নয়। ওট প্রপঞ্চ, ইল্যুশন। দুঃখবোধ প্রকৃত প্রস্তাবে বিষাদময় করে তোলে মানবজীবন। যেমনটি ঘটেছিল জীবনানন্দ দাশ-এর জীবনে। প্রহেলিকার মতন দেখা

দেয়া কিছু সুন্দর সময় বিপরীতে সুদীর্ঘ বিষাদময় অভিজ্ঞতা তাঁকে কখনোই স্বস্তিদায়ক কোনো পরিস্থিতির নিশ্চয়তা দেয়নি কিন্তু ঘটনাটিতে বাংলাসাহিত্য, সর্বোপরি বিশ্বসাহিত্য পেয়েছিল এমন এক নিভৃত কবিকে, এমন এক সুরেলা কবিকে, যার কবিতা না পড়লে অজানা থেকে যেত অনেক কিছু। জীবনানন্দই লিখেছিলেন, 'আমার মতন কেউ নেই আর।' দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পংক্তিটিকে প্রতিধ্বনির মতো করে বলেছেন, 'রচনার বহিঃশায়ী জীবনকে তিনি উপেক্ষা করেছেন অন্তঃসারকে বৃহৎ মহত্বে পরিণত করার জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন, অথবা সংবরণ করেছেন সামাজিক দিনচর্যা।' এই অন্তঃসার আর বহিঃসারের যৌথতার তুলনারহিত উদাহরণ ছিলেন জীবনানন্দ দাশ যিনি একবার একটি চিঠির খসড়ায় লিখেছিলেন, 'আমি বিশিষ্ট বাঙালিদের মধ্যে পড়ি না; আমার বিশ্বাস জীবিত মহত্তর বাঙালিদের প্রশ্রয় পাওয়ার মতনও কেউ নই আমি। কিন্তু আমি সেই মানুষ, যে প্রচুর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও প্রতিটি দ্রব্যকে সোনা বানিয়ে তুলতে চায় অথবা মহৎ কিছু– যা শেষ বিচারে কোনও একটা জিনিসের-মতন-জিনিস– কিন্তু ভাগ্য এমনই যে তার খাদ্য জুটছে না। কিন্তু আশা করি, ভবিষ্যতে খাঁটি মূল্যের যথার্থ ও উপযুক্ত বিচার হবে; আমার ভয় হয়, সেই ভালো দিন দেখতে আমি বেঁচে থাকব না।' চিঠিটি হুমায়ুন কবিরকে লেখার জন্য তৈরি করা। জীবনানন্দ দৃশ্য কল্পনা করতেন জানতেন, জানতেন তুলির আঁচড়ে তার চিত্ররূপ দিতে। তিনি বাংলা কবিতাকে এমন এক উচ্চমাত্রায় নিয়ে গিয়ে অবসরে গিয়েছেন মনে হয় যেন কবিতায় আর কারো কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এই উপলব্ধি সবারই ঘটেছিল। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র কী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পাশাপাশি দেখলে রবীন্দ্রনাথকে ঔপন্যাসিক হিসেবে অত্যন্ত নিষ্প্রভ লাগে। তারাশঙ্কর বা বিভূতিভূষণেরও তদবস্থা। আর কবি হিসেবে জীবনানন্দ যে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক অনেক গুণে গুণী– ঢের বেশি ঈশ্বরপ্রেরিত বুদ্ধিমান –সে তো বলার অপেক্ষা রাখে না।' কারো কাছে এসব কথাকে বাড়াবাড়ি মনে হবে। কথাগুলি উড়িয়ে দিতে মন চাইবে। কিন্তু জীবনানন্দ দাশকে অস্বীকার করলে আসলে বাংলা কবিতার হৃদপিণ্ডকেই বাদ দিতে হয়। আর জানি তো, হৃদপিন্ড না থাকলে

আসলে ছালবাকল ছাড়া আর-কিছুই,থাকেনা।

কবি শামসুর রাহমান *ধূসর পাণ্ডুলিপি*'পড়ে লিখেছিলেন– 'এক মোহন ভূতগ্রস্ততায় সারারাত জেগে পড়লাম ধূসর পাণ্ডুলিপি। কবিতার পংক্তিমালা আমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে একা কথা বলতে লাগলো, একটানা অনেকক্ষণ। আমার চেতনায় জীবনানন্দীয় ঝরণাধারা বয়ে গেলো, যা অত্যন্ত নির্জন এবং মায়াবী। রাতে এক ফোঁটা ঘুম হলো না; আমার স্নায়ুতন্ত্রী একটি বাদ্যযন্ত্রের মতো সঙ্গীতমুখর ছিলো সারারাত।'হুমায়ুন আজাদ লিখেছিলেন–

'রাষ্ট্রের কাছে কবিতার কোনো মূল্য নেই– রাষ্ট্র কোথাও কবির জন্য কোনো পদ রাখে না, কিন্তু দশতলা দালান খুবই মূল্যবান; তবে একটি দশতলা দালানের মালিক হওয়ার থেকে অনেক কঠিন 'অবসরের গান' লেখা। জীবনানন্দ অবশ্য ওই কবিতাটির বদলে একটি একতলা দালান বানাতে পারলে টামলাইনের পাশে একটু সাবধানে হাঁটতেন। তবে জীবনানন্দ ছাড়া কেউ ওই কবিতাটি লিখতে পারতেন না; দশতলার মালিক অনেকেই হ'তে পারেন, যাঁদের ঠিক যোগাযোগটি আছে, কিন্তু কোনো যোগাযোগের ফলেই ওটি লেখা সম্ভব নয়। কে মূল্যবান– জীবনানন্দ না রাষ্ট্রপতি?'

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন–

'আমি পাগলের মতন জীবনানন্দ দাশের ভক্ত হয়ে গেলাম। ভক্ত কিংবা ক্রীতদাসও বলা যেতে পারে। প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনের রেলিং-এর পুরনো বইয়ের দোকান থেকে একদিন মাত্র চার আনায় এক কপি *ধূসর পাণ্ডুলিপি*কিনে মনে হয়েছিল যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছি।'

জীবনানন্দ'র কবিতা পাঠ করলে এরকম ভেসে যেতে হয়, ডুবতে ডুবতে যতটা সম্ভব তল খুঁজতে খুঁজতে চলাই নিয়তি হয়ে দাঁড়ায়। জীবনানন্দ এতটাই শক্তিধর, এতটাই সমর্থ...! কাউকে ক্রীতদাস বানিয়ে নেন, কাউকে ভূতগ্রস্ত করে তুলতে পারেন, কা'রো মনে হয় জীবনানন্দ রাষ্ট্রপতি'র মতো মূল্যবান, না– তার'চে বেশি? আর কারো মনে হয় কবি হিসেবে জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক অনেক গুণে গুণী– ঢের বেশি ঈশ্বরপ্রেরিত বুদ্ধিমান।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় আরেক কাঠি সরেস। তিনি জীবনানন্দ দাশকে সেয়ানা পাগল বলেছেন, যিনি অন্য সব সুস্থ স্বাভাবিক মানুষকে পাগল করে দিতে পারেন। লেখাটির শিরোনাম– 'যতই পড়ি, ততই ভুল বুঝি– এমন কবি জীবনানন্দ।' সেখানে তিনি লিখেছেন, 'জীবনানন্দ কী বদ্ধ পাগল ছিলেন? নাকি অল্পবিস্তর পাগল ছিলেন, পরে সম্পূর্ণ পাগল হয়ে যান?' তিনি লিখেছেন, 'ছবিতে তাঁর চোখ দুটো দেখেছেন ভালো করে?'

জীবনানন্দের চোখ আসলেই গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখার মতো। এই চোখে কেমন একটা ধরা পড়ে যাওয়ার ভাব আছে। কেমন একটা দ্বিধা। কেমন একটা লাজুক ভয়। জীবনানন্দকে ভালোবেসে পাগল বলে শরৎকুমার লিখেছেন, 'তাহলে বোঝা যাচ্ছে, এই পাগল মানুষটি এমন সেয়ানা যে, অন্য সব সুস্থ স্বাভাবিক মানুষকে পাগল করে দিতে পারেন! তা যদি হয় তবে তিনি বিরল প্রতিভা।'

কবিতায় চিত্ররূপের কথা বলতে হলে তাঁর লেখা অসংখ্য কবিতার উদাহরণ টানা যায়। একটি কবিতা 'শীত রাত।' কবিতাটি এমন:

এই সব শীতের রাতে আমার হৃদয়ে মৃত্যু আসে;

বাইরে হয়তো শিশির ঝরছে, কিংবা পাতা,

কিংবা পেঁচার গান; সে-ও শিশিরের মতো, হলুদ পাতার মতো।

শহর ও গ্রামের দূর মোহনায় সিংহের হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে-

সার্কাসের ব্যথিত সিংহের।

বেদনা এক দিন বসন্ত ফিরবে ব'লে-?

কোনও এক দিন বসন্ত ছিল, তারই পিপাসিত প্রচার?

তুমি স্থবির কোকিল নও? কত কোকিলকে স্থবির হয়ে যেতে দেখেছি, তারা কিশোর নয়,

কিশোরী নয় আর;

কোকিলের গান ব্যবহৃত হয়ে গেছে।

সিংহ হুঙ্কার ক'রে উঠছে :

সার্কাসের ব্যথিত সিংহ,

স্থবির সিংহ এক– আফিমের সিংহ– অন্ধ-অন্ধকার।

চার দিককার আবছায়া-সমুদ্রের ভিতর জীবনকে স্মরণ করতে গিয়ে

মৃত মাছের পুচ্ছের শৈবালে, অন্ধকার জলে, কুয়াশার পঞ্জরে হারিয়ে যায় সব।

সিংহ অরণ্যকে পাবে না আর

পাবে না আর

পাবে না আর।

কোকিলের গান

বিবর্ণ এঞ্জিনের মতো খ'সে-খ'সে

চুম্বক-পাহাড়ে নিস্তব্ধ।

হে পৃথিবী,

হে বিপাশা-মদির নাগপাশ, তুমি

পাশ ফিরে শোও

কোনও দিন কিছু খুঁজে পাবে না আর।

কোনো কোনো শীতের রাতে জীবনানন্দের হৃদয়ে মৃত্যু আসতো। মনে রাখতে হবে, সব শীতের রাতে নয়। যখন মৃত্যুর মত অনুভূতি তাঁর ওপর ভর করতো, মানে তিনি আক্রান্ত হতেন, তখন! তখন, তাঁর মনে হতো, বাইরে শিশির ঝরছে, কিংবা পাতা ঝরছে, অথবা তিনি শুনতে পেতেন পেঁচার গান। সে-গান আবার শিশির ঝরার মত অথবা পাতা ঝরার মত। এ-রকম রাতে শহর আর গ্রামের কোথাও তিনি সিংহের হুঙ্কার শুনতে পেতেন। সে সিংহ বনের বীর বিক্রম সিংহ নয়, সেটি সার্কাসের বন্দি প্রাণী, সে অসহায় নিরীহ সিংহের হুঙ্কার শুনতে পেতেন তিনি। সিংহটি দুঃখী আর ব্যথিত ছিল। সিংহের পরে তিনি কোকিলের কথা টানেন। কোকিলের বেদনা যেন শীত পার হয়ে একদিন বসন্ত আসবে এরকম। এরকম ভাবনা তাড়িত। কোকিল অভিজ্ঞ, সে বসন্ত পার করেছিল। কোকিলের শীতের রাতের ডাক যেন বসন্তের জন্য পিপাসা-কাতর থাকা। কবি এত সব দেখে কোকিলকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, এত পিপাসা

তোমার, এত কুহু ডাক ডেকে চলেছ, কিন্তু জেনে রাখো বহু কোকিলকে আমি স্থবির হয়ে যেতে দেখেছি, সেই কোকিলরা কিশোর কিশোরী নয়, এবং জেনে রাখো, কোকিলের গান অশ্রুত নয় আর। এবং ব্যবহৃতও। তার পর তিনি সিংহের কথা বলেন, সেই সিংহ, যে হুঙ্কার করছিল ব্যথিত চিত্তে, সে-ও কোকিলের মত স্থবির এবং কবি বলছেন সে সিংহ আফিম খাওয়া, চোখে দেখতে পায় না সে, আর অন্ধকার। জীবনানন্দ অন্ধকারকে উপলব্ধিতে রেখে নানামুখী পংক্তি লিখেছেন। অন্ধ সিংহ দেখতে পাচ্ছে না, তাই অন্ধকার এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক। এরপর তিনি তাৎপর্যময় কিছু কথা বলেন। তিনি বলেন, চতুর্দিকের আবছায়া সমুদ্রের মতো অবস্থার মধ্যে থেকে জীবনকে অনুভব করতে গিয়ে, মরা মাছের লেজের শৈবালে, জলের অন্ধকারে, কুয়াশার ঘেরাটোপে সবকিছু হারিয়ে যায়। কাদের? নিশ্চয়ই প্রাণীর। আরো বেশি ঘন করে বললে, মানুষের। ব্যথিত সিংহ তো সার্কাসের খেলায় বন্দি, জীবনানন্দ বলেন, অরণ্যের সিংহ অরণ্যকে আর ফিরে পাবে না। পাবে না আর পাবে না আর পাবে না আর। আর সেই কোকিল? তার গান বিবর্ণ এঞ্জিনের মতো ঝরে পড়ছে, পাহাড়ে চুম্বকের মত আটকে আছে, নিস্তব্ধ। সিংহ, কোকিলের পরিণতি জানিয়ে শেষে এসে জীবনানন্দ পৃথিবীকে তাঁর রায় দিতে চান। তিনি বলেন, শোনো, পৃথিবী। বিপাশা মদির নাগপাশ, তুমি এবার পাশ ফিরে শুতে পারো। উদগ্র বাসনা হৃদয়ে ঝুলিয়ে রেখে কাজ নেই। জেনে রাখো... আর কোনও দিন তুমি কিছু খুঁজে পাবে না।

জীবনানন্দ একবার সুরজিৎ দাশগুপ্তকে বলেছিলেন, ‘চাষের জন্য জমি বানাতে হয়, বানিয়ে একবার শুধু চারা পুঁতে দিলেই হয় না, জল দিতে হয় সার দিতে হয়, নিড়োতে হয়, তেমনই কবিতা লেখার মনটাকে তৈরি করতে হয়, কবিতার সত্যকে ভাবতে হয়, পড়তে হয়, পড়ার অভিজ্ঞতাকে নিজের অভিজ্ঞতা করে নিতে হয়।’

ফ্রানৎস কাফকাকে বলা হয় লেখকদের লেখক। আমরা জেনেছি, কাফকা কথা বলার সময় মুখমণ্ডলের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করতেন। তাঁর লেখায় এর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। কাফকা গল্প আর উপন্যাসে ঘটনার কিংবা দৃশ্যপটের এমন বর্ণনা দিতেন সেটি অভাবনীয় ছিল। ঘটনাকে অণুতে অণুতে বিভক্ত করে তার বর্ণনা করার দক্ষতা তিনি

দেখিয়েছিলেন। ঘটনার সময় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সমস্ত কিছুর স্বতন্ত্র পরিচয় আর অবস্থান নিয়ে প্রকাশিত হয়েছেন। জীবনানন্দের আলোচনায় কাফকা প্রাসঙ্গিক হন এই কারণে যে গদ্যসাহিত্যে কাফকা যেমন কবিতায় জীবনানন্দ তেমন। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় জীবনানন্দের উপন্যাস নিয়ে এক লেখায় তাঁকে কাফকার সঙ্গে মিলিয়ে কথা বলেছেন। আমরা জেনেছি, জীবনানন্দ তাঁর গদ্যরচনাগুলোকে বাক্সবন্দি করে রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেগুলো প্রকাশিত হয়। কাফকাও তাঁর রচনাগুলোকে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সন্দীপন জীবনানন্দের লেখা উপন্যাস *মাল্যবান* সম্পর্কে বলেন 'ইওরোপে যার নাম *ট্রায়াল*, এখানে সেটাই *মাল্যবান*, বই হয়ে বেরুলো ৩০ বছর পরে; সবার আগে যে, সে দেখা দিল সবার পরে। সন্দীপন খুব বেশি ভুল বলেন নি। প্রকৃত প্রস্তাবে কাফকার *মেটামরফোসিস* কিংবা *দ্য ট্রায়াল* পড়লে মনে হবে, এসব সৃষ্টি তাদের স্রষ্টার চাইতেও বেশি শক্তিমান। আর সম্ভবত ভূমেন্দ্র গুহর সঙ্গে সাক্ষাৎ না ঘটলে জীবনানন্দ এক-রকম রহস্যই থেকে যেতেন আমাদের কাছে। তাঁর বিপুল রচনাকর্মের অনেক কিছুই থেকে যেত অন্ধকারে। জীবনানন্দর জটিল মনোজগতের অভ্যন্তরে তাঁর লেখা ভেদ করে প্রবেশ করার দুঃসাহস যেসব অনিসন্ধিৎসু পাঠক প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছেন সে তো ঐ ভূমেন্দ্র গুহর কারণেই।

কাফকার জন্য যেমন ম্যাক্স ব্রড জীবনানন্দর জন্য এই ডাক্তার বাবুটি। তিনি লিখেছিলেন: 'তখন কতই-বা বয়েস, কুড়ি-একুশ হবে, জীবনানন্দ'র মৃত্যুর ঠিক পরে-পরেই পাকেচক্রে তাঁর পাণ্ডুলিপি-ভরতি কালো অতি-সাধারণ ধরনের টিনের কালো ট্রাঙ্কগুলির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গেল। ভারি ট্রাঙ্কগুলির মধ্যে কী যে সব গর্ভবদ্ধ হয়ে আছে, তা তাঁর আত্মীয়পরিজনরা স্পষ্ট ক'রে জানতেন না, সে-সময়ে সে-সব বিষয়ে মনোনিবেশ করার মতো মানসিক অবস্থা ও সময়ও হয়তো তাঁদের ছিল না, তাঁরা সব ভারী কাজকর্ম করতেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অথবা সরকারি অফিসে, আর আমিও তাঁর কনিষ্ঠ ভগ্নী সুচরিতা দাশ'এর স্নেহানুকূল্যে তখন বছর দুয়েক হল তাঁদের পরিবারটির আশেপাশে প্রায় সম্মোহিতের মতো ঘোরঘুরি করছি, সুতরাং বাক্সগুলির

প্রত্নখননের দায় তাঁর বোন এবং আমার উপরেই প্রাথমিক ভাবে বর্তেছিল, বলা যায়।'

ভূমেন্দ্র গুহ'র কারণেই গল্প-উপন্যাসগুলো পাঠকের পড়ার সৌভাগ্য হয়। নয়তো জীবনানন্দকে পৃথিবী চিনতো একজন ব্যতিক্রমধর্মী কবি হিসেবেই। কাফকার ডায়েরি সরল, সহজভাবেই পড়া যায়। জীবনানন্দের ডায়েরি কোডেড ভাষায় ইংরেজিতে লেখা। নানান কসরত করে সেটি বুঝতে চেষ্টা করা হয়। জীবদ্দশায় সবার অবহেলা, অনাদর সয়ে দারিদ্র আর বিরুদ্ধ পরিবেশের মুখোমুখি হয়ে অনেকের দয়ায় মোটামুটি একটা জীবন কাটিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। প্রেমিকার অবহেলা ছিল। প্রেমিকা শোভনা জীবনানন্দের বিয়েতে এসে হাসিখুশী ভাবে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। পাণ্ডুলিপির অনেক গল্পে সেই হৃদয়বিদারক মুহূর্তগুলির বিষাদ জীবনানন্দ কৌশলে লিখে দিয়েছিলেন। অশোক মিত্র তাঁর আত্মজীবনীগ্রন্থ 'আপিলা চাপিলা'য় লিখেছেন 'জীবনানন্দের সঙ্গেও কলকাতায় এলে নিয়মিত দেখা হতো, তিনি ক্রমশ আত্মবিশ্বাসরহিত। তাঁর ঘনিষ্টবন্ধুরা, যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্র, যেমন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সচ্ছলতার মুখ দেখেছেন, তাঁর ধারণা বুদ্ধদেব বসু-বিষ্ণু দে প্রভৃতিও দেখেছেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রসঙ্গ না হয় উহ্যই রইলো, অথচ তিনি নিজে একটি ভদ্রগোছের অধ্যাপনার কাজ পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারছেন না। পরিচিত এঁকে-তাঁকে ধরেও কোনও ফল হচ্ছে না, আমরা যাঁরা তাঁর অনুরক্ত শুভানুধ্যায়ী তাঁরাও কিছু করে উঠতে পারছি না। একদিন, বর্ষার ম্লান সন্ধ্যা, রাসবিহারী এভিনিউর প্রায় মোড়ে ল্যান্সডাউন রোডের গলিতে তাঁর একতলার ফ্ল্যাটের বহির্দুয়ার দিয়ে সদ্য ঢুকেছি, হঠাৎ আমাকে টেনে এক কোণে, নিচু নিমগাছের ডালের আড়ালে, নিয়ে গেলেন, কানে-কানে তাঁর অস্ফুট প্রশ্ন : 'আচ্ছা, আপনি কি জানেন বুদ্ধদেব বাবুর নাকি পঞ্চাশ হাজার টাকার ফিক্সড ডিপোজিট আছে?' বুদ্ধদেবের আর্থিক অবস্থা তখন কিন্তু আদৌ ভালো নয়, কিন্তু জীবনানন্দ এতটাই তিমিরে অবগাহিত, যে অলিক লোকপ্রবাদও তাঁর কাছে ধ্রুব সত্য বলে প্রতিভাত। যেখানে তিনি নিজে কোনওদিন পৌঁছাতে পারবেন না, সেখানে তাঁর বন্ধু ও পরিচিতরা কীরকম অমোঘ নিয়মে পৌঁছে গেছেন; তখনকার নিরিখে কোনও সাহিত্যিকের পক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকার সঞ্চয় অবশ্যই বিস্ময়ে অবাক করার মতো।' জীবনানন্দ এরকম

ভাবতেন। ভাবতেন বুদ্ধদেব বসু'র সঞ্চয় পঞ্চাশ হাজার টাকা। লিখে টাকা কামাই করার এরকম চিন্তা বা কল্পনা তিনি অনাথের মাধ্যমে এখানে নিবিড়ভাবে তুলে ধরেছেন। অনাথ সম্পর্কে উত্তম পুরুষে তিনি লিখেছেন:

'বইয়ের বিক্রির থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা যা হাতে আসবে তার, তা-ই দিয়ে বালিগঞ্জের দিকে ছোট-খাটো একটা নিরিবিলি বাড়ি তৈরি করবে–সারাটা জীবন নিজেও বিড়ি ফুঁকে কাটাবে (চুরুট-সিগারেটের চেয়ে সে বেশি ভালোবাসে বিড়ি)।'

আবার উত্তম পুরুষে লেখেন:

'কিন্তু গল্প লিখতে ব রে'ক লক্ষ আমি যেত ভুলে কথা উদ্দেশ্যের সব-এ অনাথ সে' টাকাও-কাম্য তার ছিল ই-লেখা সত্যিই ,দেখেছিলামনয়, সম্মান প্রতিপত্তিও নয়।'

জীবনানন্দ ব্যক্তি জীবনে এরকমই ছিলেন।

তারপর উত্তম পুরুষে আবার বলেন:

'এ-জন্য অনাথকে শ্রদ্ধা করতাম; মনে হত, লেখকের প্রতিভা তার ভেতর না থাক, এক জন ভালো লেখকের অবহিতি-সমাহিতি ভাব তার আছে। একটা গল্পকে মনের মতো ক'রে দাঁড় করাবার জন্য সে অনেক কিছু সুখের ও আরামের জিনিস ত্যাগ করতে রাজি আছে।'

লেখক বলছেন 'বন্ধু সুধামাধব অনাথকে বলত: তা হলে তোমার জীবনটা যাতনা-বিশেষ অনাথ।''

১৯৬০ সালে জীবনানন্দ দাশ-এর পারিবারিক বাড়িটি যেটি বরিশালের বগুড়া রোডে 'সর্বানন্দ ভবন' নামে পরিচিত ছিল বিক্রি হয়ে যায়। জনৈক আবদুর রাজ্জাক বাড়িটি কিনে নেন এবং পরে কবির সম্মানে একে 'ধানসিড়ি' নামকরণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকার আবদুর রাজ্জাকের পরিবারের কাছ থেকে কিছু জমি অধিগ্রহণ করে সেখানে 'জীবনানন্দ স্মৃতি পাঠাগার' স্থাপন করেছে। মধ্যখানে ধানসিড়ি, ডানে স্মৃতি পাঠাগার, আর বাঁয়ে আরেকজন মালিকের বাড়ি। জীবনানন্দ বর্ণিত বাড়িটির কিছুই এখানে আর দৃশ্যমান নয়। তিনি গল্পে লিখেছিলেন, 'চার বিঘে জমি নিয়ে বাড়িতে দু'খানা ঘর পশ্চিম পোতায় আর দক্ষিণ পোতায়, ইলেকট্রিক কানেকশন আসে নি। দক্ষিণ পোতার

বাড়িটা পাকা নয়, মেঝেটা মাটির মেঝে, শাল সুন্দরী গরাণের খুঁটি, আসাম থেকে আনানো হয়েছিল, এক কাকা এনেছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় নি তখন।' এর পর জীবনানন্দের কবিতায় বর্ণিত ধানসিড়ি কথায়। নদীটির অবস্থান ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলায়। ঝালকাঠি একসময় বৃহত্তর বরিশালের অধীনে ছিল, বর্তমানে এটি একটি স্বতন্ত্র্য জেলা। বরিশাল থেকে রাজাপুরের দূরত্ব চৌত্রিশ কিলোমিটারের কাছাকাছি। রাজাপুরের বামনকাঠি গ্রামেই ধানসিড়ি নদীর অবস্থান। অদূরে গাবখান সেতু। নীচে প্রমত্তা গাবখান নদী। এর একটি শাখা চলে গেছে পুবে। পুব থেকে পশ্চিমের সরু নদীটি ধানসিড়ি। বামনকাঠি থেকে হাঁটতে হাঁটতে সড়কের বিভাজন মাড়িয়ে হঠাৎ দক্ষিণ দিকে চলে গেছে চুনসুরকির রাস্তা। সেটি ধরে এগোতে থাকলে শান্ত, নীরব, নিথর ধানসিড়ি নদীটির দেখা মেলে। নদীতে কোনো বাঁক নেই, টলটলে কালো জল, নদীর দুকূল ঘিরে মাঠ আর জমি। 'নদী' নামের জীবনানন্দের একটি কবিতা রয়েছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে রয়েছে কবিতাটি। সেখানে লেখা রাইসর্ষের খেতের পাশে নদী। ধানসিড়ির পাশে ফসলের মাঠ। একদম লাগোয়া। অদিগন্ত খোলা মাঠের দিকে তাকালে শরীর অবশ হয়ে আসে। কবিতায় যেভাবে আশপাশের বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তিনি সেসব এখানে দাঁড়ালে হুবহু মিলে যায়। কবিতাটির শুরুর কয়েকটি লাইন:

রাইসর্ষের খেত সকালে উজ্জ্বল হ'ল–দুপুরে বিবর্ণ হয়ে গেল
তারই পাশে নদী;
নদী, তুমি কোন কথা কও?

এর পর কিছু দূর গেলে লেখা আছে:

এক-পাল মাছরাঙা নদীর বুকের রামধনু
বকের ডানার সারি সাদা পদ্ম–নিস্তব্ধ পদ্মের দ্বীপ নদীর ভিতরে
মানুষেরা সেই সব দেখে নাই।

মন্তব্য

১৯৯৬ সালের নির্বাচন পরিদর্শনে এলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বরিশাল-ঝালকাঠি অঞ্চল নিয়ে একটি চমৎকার ভ্রমণ কাহিনী লিখেছিলেন। ধানসিড়ি নদী নিয়ে অপূর্ব বর্ণনা জীবনানন্দ দাশের অনুরাগী হিসেবে সুনীল মোহনীয়ভাবেই সম্পন্ন করতে পারবেন এ-তো অনুমেয়। সেটিই হয়েছিল।

জীবনানন্দের বরিশালে বগুড়া রোডের বাড়ি নিয়ে, সেটি ছেড়ে আসা নিয়ে তাঁর স্মৃতির মুখোমুখি হতে একটি কবিতা পড়া যাক।

এই কবিতাটি বিশেষ ধরনের। তাঁর অনেক কবিতাতেই তিনি কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে ক্রমশ দূরবর্তী কোনো পথের, দূরবর্তী কোনো নিশানার মাধ্যমে জীবনের একটি সামগ্রিক রূপের সন্ধান দিতে চাইতেন। এটিও তেমন।

কবিতাটি *মহাপৃথিবী* কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

‘বলিল অশথ সেই’

বলিল অশ্বত্থ ধীরে : ‘কোন্ দিকে যাবে বলো–
তোমরা কোথায় যেতে চাও?
এত দিন পাশাপাশি ছিলে, আহা, ছিলে কত কাছে;
ম্লান খোড়ো ঘরগুলো– আজও তো দাঁড়ায়ে তারা আছে;
এই সব গৃহ মাঠ ছেড়ে দিয়ে কোন্ দিকে কোন্ পথে ফের
তোমরা যেতেছ চ’লে পাই না ক’ টের!
বোঁচকা বেঁধেছ ঢের– ভোলো নাই ভাঙা বাটি ফুটা ঘটিটাও;
আবার কোথায় যেতে চাও?

পঞ্চাশ বছরও, হায়, হয় নি ক’– এই তো সে-দিন
তোমাদের পিতামহ, বাবা, খুড়ো, জেঠামহাশয়
আজও, আহা, তাহাদের কথা মনে হয় ! —
এখানে মাঠের পারে জমি কিনে খোড়ো ঘর তুলে
এই দেশে এই পথে এই সব ঘাস ধান নিম জামরুলে
জীবনের ক্লান্তি ক্ষুধা আকাঙ্ক্ষার বেদনার শুধেছিল ঋণ;

দাঁড়ায়ে-দাঁড়ায়ে সব দেখেছি যে, মনে হয় যেন সেই দিন!

এখানে তোমরা তবু থাকিবে না? যাবে চ'লে তবে কোন্ পথে?

সেই পথে আরও শান্তি — আরও বুঝি সাধ?

আরও বুঝি জীবনের গভীর আস্বাদ?

তোমরা সেখানে গিয়ে তাই বুঝি বেঁধে র'বে আকাক্সক্ষার ঘর!..

যেখানেই যাও চ'লে, হয় না ক' জীবনের কোনো রূপান্তর;

এক ক্ষুধা এক স্বপ্ন এক ব্যথা বিচ্ছেদের কাহিনি ধূসর

ম্লান চুলে দেখা দেবে যেখানেই বাঁধো গিয়ে আকাক্সক্ষার ঘর!'

বলিল অশ্বত্থ সেই ন'ড়ে-ন'ড়ে অন্ধকারে মাথার উপর।

অশথ গাছটি যেন বুড়ো ভদ্রলোক, সে কোনো বালকের সঙ্গে গল্প করছে। বালকদের পরিবারের লোকজন পূর্বপুরুষের ভিটে ছেড়ে চলে যেতে চাইছে সে মুহূর্তে গল্পচ্ছলে বুড়ো অশথ বালককে কখনো ভর্ৎসনার, কখনো উপদেশ এর ভঙ্গিতে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাইছে।

বলিল অশ্বত্থ ধীরে : 'কোন্ দিকে যাবে বলো–

তোমরা কোথায় যেতে চাও?

এত দিন পাশাপাশি ছিলে, আহা, ছিলে কত কাছে;

ম্লা◌ান খোড়ো ঘরগুলো– আজও তো দাঁড়ায়ে তারা আছে;

এই সব গৃহ মাঠ ছেড়ে দিয়ে কোন্ দিকে কোন্ পথে ফের

তোমরা যেতেছ চ'লে পাই না ক' টের!

বোঁচকা বেঁধেছ ঢের– ভোলো নাই ভাঙা বাটি ফুটা ঘটিটাও;

আবার কোথায় যেতে চাও?

অশথ গাছটি বালককে বলছে, তোমরা নাকি চলে যাচ্ছ? তা কোথায় যাবে? এতদিন তো এখানে কাছাকাছি ছিলে, আমার কাছাকাছি। তোমাদের ভিটেতে তোমাদের ঘর তা যত নড়বড়ে হোক, ম্লান হোক- ছিল তো! এখনো দ্যাখো ঘরগুলি দাঁড়িয়ে আছে। তা

মন্তব্য

তোমরা এইসব ঘর-দোর ছেড়ে যে চুপি চুপি চলে যাচ্ছো, দেখি সব নিয়েই চলে যাচ্ছ, ঘটি বাটি কিছুই তো ফেলে যাচ্ছ না। বুঝেছি! তল্পিতল্পা গুটিয়েই যাচ্ছ!

পঞ্চাশ বছরও, হায়, হয় নি ক'–এই তো সে-দিন

তোমাদের পিতামহ, বাবা, খুড়ো, জেঠামহাশয়

আজও, আহা, তাহাদের কথা মনে হয় !

এখানে মাঠের পারে জমি কিনে খোড়ো ঘর তুলে

এই দেশে এই পথে এই সব ঘাস ধান নিম জামরুলে

জীবনের ক্লান্তি ক্ষুধা আকাঙ্ক্ষার বেদনার শুধেছিল ঋণ;

দাঁড়ায়ে-দাঁড়ায়ে সব দেখেছি-যে, মনে হয় যেন সেই দিন!

এখানে তোমরা তবু থাকিবে না? যাবে চ'লে তবে কোন্ পথে?

সেই পথে আরও শান্তি আরও বুঝি সাধ?

আরও বুঝি জীবনের গভীর আস্বাদ?

তোমরা সেখানে গিয়ে তাই বুঝি বেঁধে র'বে আকাঙ্ক্ষার ঘর!..

১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত বরিশালের বগুড়া রোডের 'সর্বানন্দ ভবন' ছেড়ে 'বালকে'র পরিবার যখন চলে যাচ্ছে তখন তো বাড়িটির বয়স পঞ্চাশ বছরও হয় নি। এই বাড়িতেই তার পিতামহ, পিতাসহ নিকটজনদের বসতি ছিল। অশথ গাছটির চোখের সামনেই এসব দৃশ্য রচিত হয়েছে। তাই বগুড়া রোডের মাঠের পাশে জমি কিনে বাড়ি তুলে এখানের ঘাস নিম জামরুলের যে গন্ধ বালক সহ পরিবার ধারন করেছে, সেসবতো বেশি দিনের কথা নয়। অশথ অবিশ্বাসভরা কণ্ঠে বলছে: এখানে তোমরা আর থাকবে না? সত্যি চলে যাবে! গেলে কোন পথে যাবে? সেখানে বুঝি অনেক শান্তি? অনেক সাধ-অস্বাদ মেটাবার রাস্তা আছে বুঝি?

ম্লান চুলে দেখা দেবে যেখানেই বাঁধো গিয়ে আকাঙক্ষার ঘর!'

বলিল অশ্বত্থ সেই ন'ড়ে-ন'ড়ে অন্ধকারে মাথার উপর।

অশথ বালককে কৌতুকভরে বলছে, যেখানে যাচ্ছ হয়ত মনে হচ্ছে স্বাদ আর আকাঙ্ক্ষা খুব মেটানো যাবে, কিন্তু জেনে রাখো যেখানেই যাও না কেন জীবনের কোনো পরিবর্তন বা রূপান্তর কোনো কিছুই হয় না। ঠিকানা ছেড়ে মানুষ স্থান থেকে স্থানান্তরিত হয় কিন্তু নিজ শরীর থেকে তো কেউ বিচ্যুত হতে পারে না! তার ক্ষুধা চলে পাশে, তার স্বপ্ন, তার ব্যথা-বেদনারা, তার সমস্ত বিচ্ছেদের যাতনা...। অশথ বলে, চলে গিয়ে যেখানেই থিতু হবে সেখানেই এইসব গাঢ় বেদনা তোমার সঙ্গেই বসত গড়বে।

বসত তো করেছিল। জীবনানন্দ'র অপরিসীম বেদনার জীবন তাকে ছেড়ে যায় নি। কলকাতার ভাড়াবাড়িতে বরং গ্লানি আর ক্লান্তি তাঁকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছিল, জড়িয়ে ধরেছিল গভীর আলিঙ্গনে। শেষ-মেষ তিনি চলে গিয়েছিলেন জীবনের অন্যপারে, যেখানে গেলে আর ফিরে আসা যায় না, কবিতা লেখা যায় না, সেখানে জীবনের আর কিছু নেই, রয়েছে শূন্যতা আর মৃত্যু নামের হাহাকার।

তাঁর সমালোচকের অভাব ছিল না। স্থায়ী সমালোচক সজনীকান্ত তো ছিলেনই, কারণে-অকারণে ফরমায়েশেও লোকে তাঁর সমালোচনা করতো। জীবনানন্দ-জন্ম-শত-বর্ষের অনুষ্ঠান-মঞ্চে দাঁড়িয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'সাহিত্য অকাদেমির কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে, তাঁরা আমায় সভার মঞ্চে বসার সুযোগ দিয়েছেন। পুরনো পরিচিতরা জানেন কেন আমার কাছে এই মঞ্চ কিছুটা কাঠগড়ার সামিল। আকৈশোর জীবনানন্দের অন্ধভক্ত হয়েও একটা সময় সংকীর্ণ মতবাদের মাদকতায় আমি ছোটমুখে বড় কথা বলার স্পর্ধা দেখিয়েছিলাম। এ সত্ত্বেও তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হইনি। আমার দূর্ভাগ্য যে, পরে নিজের ভুল স্বীকার করে যে-একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে যাঁকে দিয়েছিলাম, তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমার সেই পাণ্ডুলিপিও নিখোঁজ হয়ে যায়। সুধীন্দ্রনাথের ভাষায় নিজেকে এই বলে আজ স্তোক দিই : ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কি লাভ বল/মনস্তাপেও লাগবে না তাতে জোড়া।' সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নিজের অন্তরের উপলব্ধিকে চাপা দিয়ে পার্টির দাদাদের শেখানো বুলি উচ্চারণ করার প্রয়োজন পড়েছিল।

জীবনানন্দ'র জীবদ্দশায় *বনলতা সেন* বইটা পুরস্কার পেলে সুভাষ মুখোপাধ্যায় পরিচয় পত্রিকায় লিখেছিলেন, " **.....**"খাঁটি রসবোদ্ধা" সেই "হীন ভগ্নাংশ" যে শেষ-পর্যন্ত পেছনের বেঞ্চির থেকে দাঁড়িয়ে "প্রেজেন্ট স্যার" বলতে পেরেছেন, তার জন্য আশা করা যায় 'বনলতা সেন' এর কবি তাঁদের ধন্যবাদ দেবেন।' এসব দেখে সে-সময় জীবনানন্দ একবার বলেছিলেন, 'সুভাষের ধারনা বদলাত ও যদি আমার শেষ বই 'সাতটি তারার তিমির পড়ত।' কিন্তু পড়ে বা বুঝে কি সবাই সবকিছু বলে!

বর্তমান সময়েও অবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন হয়েছে বলা যাবে না। এদেশের বেশিরভাগ কবি/লেখক নিজের বিবেক-বুদ্ধি কোনো না কোনো জায়গায় বর্গা দিয়ে লেখালেখির হালচাষ করে থাকেন। কলম চালানোর প্রেষণা আসে এই জায়গা থেকে লেখাটি দ্বারা আমার কোনো স্বার্থ উদ্ধার হবে তো? গোষ্ঠীপ্রেম, বন্ধুস্বার্থ উদ্ধার করতে গিয়ে জীবনানন্দর মত কত লেখক-কবি সাহিত্যযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন সে হিসেব করে কূল পাওয়া যাবে না। মৃতের স্মরণসভায় মন রাখা কথা বলা, মৃত ব্যক্তির লেখালেখি নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রদর্শন কিংবা সান্তনা বাক্য যতই নির্গত হোক পূর্বদিনের হিংসার বিষবাষ্প কখনো নির্বাপিত হয় বলে মনে হয় না।

একদম নিজের মত জীবন যাপন করতেন জীবনানন্দ দাশ। সামাজিক মেলামেশা ছিল না বললেই চলে। বেশভূষাও ছিল সাধারণ। তাঁর স্ত্রী লাবণ্য দাশ *মানুষ জীবনানন্দ* গ্রন্থে লিখেছেন, 'তিনি মিলের মোটা ধুতি ছাড়া পরতেন না, এবং একটু উঁচু করেই পরতেন। আমি একদিন একখানা ভাল ধুতি কিনে কবিকে বললাম- 'কী যে তুমি মোটা মোটা ধুতি হাঁটুর উপরে পরে রাস্তা দিয়ে হাঁট লোকে হাসে না?' কথাটা বলেই ধুতিখানা তাঁর দিকে এগিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম। তিনি তখন কি একটা লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ধুতিখানা ধরেও দেখলেন না। তাঁর মুখে সামান্য বিরক্তির ভাবও প্রকাশ পেল না। শুধু লেখাটা থামিয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "দেখ, তুমি যে ভাবে খুশি সাজ-পোশাক কর, তোমার সে ইচ্ছেয় আমি কোনদিনই বাধা দেব না। কিন্তু আমাকে এ বিষয়ে তোমার ইচ্ছামত চালাতে বৃথা চেষ্টা কোরো না ! যতদিন তিনি পৃথিবীতে ছিলেন, আমার মুখ থেকে এরকম কথা আর

কোনদিনই বের হয়নি। যেদিন তিনি চিরদিনের মতই যাত্রা করলেন, সেই ধুতিখানাই পরিয়ে দিয়েছিলাম। সেখানা বছরের পর বছর আমার বাক্সে রাখা ছিল।"

'মানুষের সঙ্গে মেশেন না কেন?'

'ভালো লাগে না!'

মানুষের সঙ্গ তাঁর অসহ্য লাগত। সাহিত্যিক আলাপ আলোচনার মধ্যে অন্যেরা যদি হাজার হাজার কথা বলতেন, জীবনানন্দের মুখ থেকে বেরুতো দু-একটি নিস্পৃহ মন্তব্য। নিজের মধ্যে ডুবে থাকাই ছিল এই নিঃসঙ্গতা প্রিয় কবির স্বধর্ম। তাই রবীন্দ্রনাথের পর অদ্বিতীয় কাব্যপ্রতিভার অধিকারী হয়েও জীবনানন্দ একাকীত্বের নির্মম অহঙ্কারে এই প্রাণবন্ত প্রগতিশীল যুগবিভুতির গৌরব-টিকা ললাটে ধারণ করার যোগ্যতা অর্জন করত পারেন নি।"জীবনানন্দর ললাটে শেষাবধি কী জুটেছে আজ মন্মথনাথ বেঁচে থাকলে দেখতে পেতেন। তখন তিনি এ লেখা ফিরে পড়ে দুটো নতুন লাইন যোগ করতেন হয়ত;

'তাই রবীন্দ্রনাথের পর অদ্বিতীয় কাব্যপ্রতিভার অধিকারী হয়েও জীবনানন্দ একাকীত্বের নির্মম অহঙ্কারে এই প্রাণবন্ত প্রগতিশীল যুগবিভুতির গৌরব-টিকা ললাটে ধারণ করার যোগ্যতা অর্জন করত পারেন নি"- বলে যে ভ্রম আমিসহ অনেকের মধ্যে তৈরি হয়েছিল সেটি ভ্রান্ত, কারণ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সজনীকান্তসহ অনেকেই প্রথমে জীবনানন্দকে অস্বীকার করে কবির মৃত্যুর পর জিভ কেটেছিলেন। আমরাও জিভ কাটলাম। আর স্বীকার করলাম, রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করতে কেবল ঐ এক জীবনানন্দই পেরেছিলেন। হইচই করলেই কেবল কবি-লেখক হওয়া যায় না, নীরব থেকেও সমুদ্রকে তরঙ্গায়িত করা যায়। তিনি জীবদ্দশায় 'কবি' তকমা পেলেও ততোটা জনগণ সমক্ষে উঠে আসতে পারেননি, যতটা বর্তমান তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে ভবিষত্-এর কাছে পরিচিতির পরিসর তৈরী করতে উদ্যত হয়েছে। কেননা সেসময় সমগ্র বাংলা সাহিত্য ছিল একমুখী, রবীন্দ্র-নির্ভর। ফলে রবীন্দ্র-সাহিত্যধারাকে বর্জন করে নতুন কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব, তা মেনে নিতে পারেননি তত্কালীন অনেক কবি-সাহিত্যিকরাই। কিন্তু যে নিয়ম ভাঙার দল সূচনা করলেন রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য

এবং যাঁরা মেনে নিলেন তাঁদের সাহিত্যকর্ম, তাঁরা খুঁজে পেলেন এক নতুন পথ; এক নতুন যুগ, 'রেঁনেসাস' এল বাংলা সাহিত্যে, সূচনা হল 'আধুনিক যুগ'-এর।

'আধুনিকতাবাদ' কোনো বাঙালির মৌলিক চিন্তাশক্তির ফসল নয়; পাশ্চাত্যের কতগুলো সাহিত্যান্দোলনের সামষ্টিক রূপমাত্র। বাস্তবতাবাদ, প্রতীকবাদ, চিত্রকল্পবাদ, পরাবাস্তববাদ, অস্তিবাদ, ইন্দ্রজাল বাস্তবতা, বাস্তবরূপবাদ, আকৃতিবিন্যাসবাদ ও অন্যান্য, 'আধুনিকতাবাদ' থেকেই আমরা পাই; মূলত এর সবই পশ্চিমের কোনো না কোনো সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি এবং যথাযথভাবে যা আন্দোলনে রূপলাভ করেছিল ঐ সময়ে। এদিকে সেই আন্দোলনই অনুঘটক হয়ে বাংলা সাহিত্যে ঢুকে পড়েছিল প্রকট আকারে। প্রায় বিশ শতকের আরম্ভ থেকে পরবর্তী ত্রিশ দশক পর্যন্ত ইংরেজি সাহিত্যে চলতে থাকে নানা নতুন আন্দোলন। জন্ম নিতে থাকে নতুন তত্ত্ব, নতুন ধারা। আর এসব কিছুর প্রতিফলন দেখা যায় কবিতা, চিত্রকলা, নাটক-এ। প্রাচীনকালের কবিতা, মধ্যযুগের কবিতা এবং রেনেসাঁস ও পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী, সমস্ত উল্লেখ্য-অনুল্লেখ্য কাব্যকালের মধ্যে গভীরতর পার্থক্য ও যোজন-যোজন ব্যবধান সৃষ্টি করে আধুনিক কবিতা। অষ্টাদশ শতকের রোমান্টিকতা এক অন্যরূপ লাভ করে বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতায়।

আর এর প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল জীবনানন্দ দাশ ও তাঁর সমকালের অন্য আধুনিক কবিগণ। যাঁরা নিজস্ব মেধা ও প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন বাংলায় প্রচলিত কবিতার। এক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয়, তা হল: 'কল্লোল' এর পাঁচ প্রধান আধুনিক কবি, যাঁদেরকে পঞ্চপাণ্ডব বলা হয়, তাঁরা প্রত্যেকেই ইংরেজি সাহিত্যের মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং যেহেতু 'আধুনিকতাবাদ' পাশ্চাত্য থেকে আগত, তাই তাঁদের পক্ষে এই নতুন ধারাকে গ্রহণ করা দুঃসাধ্য ছিল না। সাহিত্যের বিভিন্ন রাস্তায় না হাঁটলে, বিশ্বসাহিত্যের সাম্প্রতিক বিষয়াবলি না জানলে আধুনিকতা বোঝা কষ্টকর ছিল শুধু সেসময়েই নয়, বরং একই ভাবে আজও। ফলে তত্কালীন সনাতনপন্থীরা যেমন আধুনিক কবিতা বা 'আধুনিকতাবাদ'কে গ্রহণ করতে পারেননি সঠিকভাবে, ঠিক

সেইভাবেই আজও পারেননা বর্তমানের সনাতনপন্থীরাও, তারা তাঁদের 'সনাতনী'পতাকা
উড়িয়ে চলেছেন আজও। তাই এখনও জীবদ্দশায় নয়, হয়ত ভবিষ্যত্-এ এভাবেই
মৃত্যুপরবর্তী সম্ভাষণে মুখরিত হবে কোনও না কোনো শিল্পী-স্রষ্টা-কবি-লেখকের আত্মার
পাণ্ডুলিপি, জমে উঠবে কবি-আসর, আর জীবনানন্দেরা একক পরিধিস্থ বৃত্তের মধ্যে
হারিয়ে গিয়ে মৃদু হেসে হেমন্তের উদ্দেশ্যে বলে যাবেন,

'সময়ের কাছে এসে সাক্ষ্য দিয়ে চ'লে যেতে হয়
কী কাজ করেছি আর কী কথা ভেবেছি।
সেই সব একদিন হয়তো বা কোনো এক সমুদ্রের পারে
আজকের পরিচিত কোনো নীল আভার পাহাড়ে
অন্ধকারে হাড়কঙ্করের মতো শুয়ে
নিজের আয়ুর দিন তবুও গণনা ক'রে যায় চিরদিন;
নীলিমার কাছ থেকে ঢের দূরে স'রে গিয়ে,
সূর্যের আলোর থেকে অন্তর্হিত হ'য়েঃ
পেপিরাসে- সেদিন প্রিন্টিং প্রেসে কিছু নেই আর;
প্রাচীন চীনের শেষে নবতম শতাব্দীর চীন
সেদিন হারিয়ে গেছে।

মানুষেরা বার-বার পৃথিবীর আয়ুতে জন্মেছে;
নব নব ইতিহাস-সৈকতে ভিড়েছে;
তবুও কোথাও সেই অনির্বচনীয়
স্বপনের সফলতা- নবীনতা- শুভ্র মানবিকতার ভোর?
নচিকেতা জরাথ্রুস্ট্র লাওত্-সে এঞ্জেলো রুশো লেনিনের মনের পৃথিবী
হানা দিয়ে আমাদের স্মরণীয় শতক এনেছে?
অন্ধকারে ইতিহাসপুরুষের সপ্রতিভ আঘাতের মতো মনে হয়
যতই শান্তিতে স্থির হ'য়ে যেতে চাই;

কোথাও আঘাত ছাড়া- তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসরসূর্যালোক নেই।

হে কালপুরুষ তারা, অনন্ত দ্বন্দের কোলে উঠে যেতে হবে

কেবলি গতির গুণগান গেয়ে- সৈকত ছেড়েছি এই স্বচ্ছন্দ উত্সবে;

নতুন তরঙ্গে রৌদ্রে বিপ্লবে মিলনসূর্যে মানবিক রণ

ক্রমেই নিস্তেজ হয় ক্রমেই গভীর হয় মানবিক জাতীয় মিলন?

নব-নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক'রে মানুষের চেতনার দিন

অমেয় চিন্তায় খ্যাত হ'য়ে তবু ইতিহাসভুবনে নবীন

হবে না কি মানবকে চিনে- তবু প্রতিটি ব্যক্তির ষাট বসন্তের তরে!

সেই সুনিবিড় উদ্বোধনে- 'আছে আছে আছে, এই বোধির ভিতরে

চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয়;

জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়।'

দূর্ঘটনায় পড়ে হাসপাতালের শেষের দিনগুলোতে কোনো স্বস্তি ছিল না। এই দুম জ্বর, এই ব্যথার আর্তনাদ। কত কী ইচ্ছে করে, কত কী মনে আসে। কখনো বলেন, ‘এখানে ভালো লাগছে না। একটা কমলালেবু খেতে পারব?’ সঞ্জয় ভট্টাচার্য’র কাছে চেয়েছিলেন। ভূমেন গুহ’কে জিজ্ঞেস করেন, ‘তুমি এখানে কেন, এই রাতের বেলা, খুকি তো নেই দেখছি, আমি কোথায় আছি বলো তো।’ তিনি কোথায় আছেন! কোনো আলাদা কক্ষ মেলে নি, বারোয়ারী ওয়ার্ডে আসামী আর পোড়া রোগীর সান্নিধ্যে ব্যথায়, কষ্টে কেটেছিল শেষ দিনগুলি। পরে সেই ওয়ার্ডটিতেই কিছুটা ভদ্রমতো করে আড়াল করার ব্যবস্থা হয়েছিল। আরেক দিন বলেছিলেন, ‘লিখে রাখ আজকের তারিখটা, আজ থেকে গত এক বছর খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়। এখন ভোর, না সন্ধ্যে? আমি কী দেখতে পাচ্ছি জান? বনলতা সেন এর পাণ্ডুলিপির রং।’

সেদিন পাশে শুয়ে ছিল না বধুটি, শিশুটিও নয়, ততদিনে প্রেম-আশা মিটে গিয়েছিল জীবনের! ক্লান্তিটা বেশিই ভর করেছিল। ক্লান্তি ফুরায় একমাত্র মৃত্যুতে? এরকমটাই তাঁর কবিতায় তিনি লিখেছিলেন। অনেক দিনের কল্পনার লাশ কাটা ঘরে টেবিলের পরে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকবার গলিত ইচ্ছে বাস্তবের দৃশ্য হতে প্ররোচিত করেছিল

হয়ত। প্রকৃতি ঘটনার দিন বেছে নিয়েছিল ১৪ অক্টোবর ১৯৫৪'র একটি অভিশপ্ত অপরাহ্নকে। দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। জীবনানন্দের জীবনীকার প্রভাতকুমার দাস ঘটনাটির কথা এভাবে লিখেছেন, রাসবিহারী এভিনিউ এবং ল্যান্সডাউন রোডের সংযোগস্থলে অকুস্থলে ছিল দুটো দোকান, 'জলখাবার' ও 'জুয়েল হাউস'- এর সামনে দিয়ে রাস্তা পেরোতে গিয়ে জীবনানন্দ দাশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। কিছুটা দূরে যে একটা ট্রাম, অবিরাম ঘণ্টা বাজিয়ে এগিয়ে আসছে সেদিকে খেয়াল নেই, হয়তো ডায়াবেটিসের জন্য সামান্য মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। গাড়ি যখন থামল, তখন তাঁর দেহ ক্যাচারের ভেতর ঢুকে গেছে। রক্তাপ্লুত অচৈতন্য দেহ উদ্ধারের কাজে এগিয়ে এলেন সেলি ক্যাফের মালিক চুনিলাল। জীবনানন্দকে ভর্তি করানো হয় শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে। তাঁর আরেক জীবনীকার ক্লিন্টন বি সিলি লিখেছেন, ট্যাক্সিতে করে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে দেখা যায় দূর্ঘটনায় তাঁর বুকের পাজর ভেঙে গেছে, চিড় ধরা কণ্ঠাস্থি এবং চূর্ণবিচুর্ণ হয়ে পড়েছে পা।

১৪ তারিখ গড়াতে গড়াতে চলে গেল ২২ তারিখ রাত্রি সাড়ে এগারটার দিকে। হাসপাতালে উপস্থিত প্রিয়জনদের অনেকেই চোখের সামনে। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাঙালি কবিদের মধ্যে অগ্রগণ্য, সাহিত্য জগতের অসম্ভব প্রতিভাসম্পন্ন কবি জীবনানন্দ দাশ পৃথিবীতে একসময় তাঁর শেষ নিঃশ্বাসটি ত্যাগ করলেন। পরের নিঃশ্বাসটি আর গ্রহণ করতে পারলেন না। রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কাব্য কে বলেছেন'' চিত্ররূপময়''। উপমা কবিতা নয় ,কিন্তু উপমা কবিতা কে ঐশ্বর্য মণ্ডিত করে। জীবনানন্দ রবীন্দ্র প্রতিভার যুগে রবীন্দ্র-গোত্রের বাইরে এক আসাধারন জীবন-বোধ সৃষ্টি করেন এবং তা চিরস্মরণীয়।

৫.২ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১ -জীবনানন্দ দাশ জন্ম ও মৃত্যু তারিখ কত?

জীবনানন্দ দাশের জন্ম ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৯ সাল এবং মৃত্যু ২২ অক্টোবর ১৯৫৪ সালে।

মন্তব্য

২- বিপন্ন মানবতার নীল কণ্ঠ কবি বলা হয় কাকে?

বিপন্ন মানবতার নীল কণ্ঠ কবি বলা হয় জীবনানন্দ দাশকে।

৩- জীবনানন্দ দাশের প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কি?

জীবনানন্দ দাশের প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম‘ ঝরা পালক’।

৫.৩-অনুশীলনী প্রশ্ন

১ -কবি জীবনানন্দ দাশের জীবনী ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

২ -ধার্মিক মনোভাব কে আশ্রয় করে জীবনানন্দ দাশ কি ভাবে তাঁর কবিতায় প্রকৃতি চেতনা কে ফুটিয়ে তুলেছিলেন?

৫.৪-গ্রন্থপঞ্জী

জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন,

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- দেবেশ কুমার আচার্য্য।

একক-৬ জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা

বিন্যাস ক্রম

৬.১- ভূমিকা

৬.২-সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

৬.৩-অনুশীলনী প্রশ্ন

৬.৪-গ্রন্থপঞ্জী

৬.১ ভূমিকা

রবীন্দ্র যুগের অন্যতম কবি জীবনানন্দ দাশ। রবীন্দ্রনাথ এবং আধুনিক কবি গোষ্ঠী উভয় দিক হতে প্রায় সমদূরত্বে অবস্থান করে তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার সম্পূর্ণ এক অভিনব বৈশিষ্ট্য অঙ্কন করেছেন। আশ্চর্য স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। সর্বক্ষেত্রেই তিনি নিজেকে রবীন্দ্র পরিমণ্ডল এবং সমকালীন কবিদের কাছ থেকে অনেক দূরে রাখার চেষ্টা করলেও সর্বক্ষেত্রে যে সাফল্য লাভ করতে পেরেছেন তা নয়। রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার তার কবি কর্মে প্রেরনা পেয়েছিলেন। জীবনানন্দ প্রেমের উল্লেখযোগ্য কবি। তার সমস্ত চেতনার মর্মমূলে রয়েছে এক হারানো প্রেমের স্বপ্ন ও স্মৃতি। কবির প্রেম চেতনা কোন ব্যক্তি প্রেমের বিশ্লেষের উৎস মূল থেকে উৎসারিত হয়ে থাকতে পারে। কবি মানসের এই বিপ্রলম্ভ প্রেমচেতনাই কবিকে বিশ্বমুখি করেছে।তার ত্রিভুবন তার প্রেম চেতনায় তন্ময় হয়েছিল। তার সমগ্র কাব্য সাধনার মধ্যে রয়েছে তিনটি স্তর। প্রথম স্তরে – নিসর্গের আধিপত্য, দ্বিতীয় স্তরে- প্রেমের, তৃতীয় স্তরে- মানব সভ্যতার ইতিহাসের। অবশ্য কোথাও এই আধিপত্য সর্বগ্রাসী সর্বব্যপ্ত নয়। অর্থাৎ নিসর্গের আধিপত্যের স্তরে প্রেম ও ইতিহাস চেতনা নিসর্গকে

জীবন্ত ও অন্তরঙ্গ করে তুলেছে। প্রেমের আধিপত্যের স্তরে নিসর্গ ইতিহাস প্রেমের মুখচ্ছবির প্রে আলোছায়ার বর্ণালি আলিম্পন এঁকে দিয়েছে। মানব সভ্যতার ইতিহাসের আধিপত্যের স্তরে নিসর্গ ও প্রেম ইতিহাসের গ্লানি মালিন্য অপসৃতের কাজে নিয়োজিত হয়েছে।

তার কবিতায় বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। ছন্দরূপ, বিন্যাস, অলঙ্করণ, মাত্রা এবং উৎপ্রেক্ষার ক্ষেত্রে নান্দনিক ছন্দোবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করে; যা কবিতা পাঠে মিষ্টি শিহরণ, আবেগের বিহ্বলতা, ঔদার্য ও প্রেমসিক্ত আবেগ মথিত হয়ে উদাস গগনে বলাকাসম দিগন্তজুড়ে পাখনা মেলে দেয়ার বিশাল গতি চেতনা সৃষ্টি করে। যা সহজে অন্য কোনো কবির কবিতা পাঠে তেমন কোনো ভাবোন্মাদনা সৃষ্টি করে না। কবি তার কাব্যসমগ্রে এমনই ভাবের সরল গতি ব্যবহার করেছেন যা সহজে যেকোনো পাঠককে আবেগে আপ্লুত করে। এভাবে অনেক কবিতারই উদাহরণ দেয়া যাবে। সরলবোধ এবং শান্তশীতল ধীরলয়ের কবিতা রচনা তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জীবনকে যেভাবে সরলীকরণ করা যায় সে ক্ষেত্রে তিনি কখনো কার্পণ্য করেননি তা প্রকাশে। জীবন যেখানে স্থবির এবং দহন জ্বালায় ও তিক্ত স্বাদে ভরপুর, সেখানে কবি মিষ্টি স্রোতের সরোবর সৃষ্টিতে তেমনি তৎপর।

জীবনে চলার পথে অবিশ্রান্ত হয়ে পরম সুখের জন্য আর কোথাও তাকে সান্ত্বনা খুঁজে দিতে পারেনি। তাইতো নিজের একান্ত প্রশান্ত চিত্তের চিরচেনা একটি প্রত্যাশার জায়গায় পরম সুখ এনে দেয়, তার ‘বনলতা সেন’ কবিতায় এভাবেই তুলে এনেছেন-

আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারি দিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু’দণ্ড শান্তি দিয়েছিল/ নাটোরের বনলতা সেন।

কবি পৃথিবীর প্রতিপ্রান্তরে ঘুরেফিরেও ‘ধান সিঁড়িটির তীরে’ আজন্ম সুখকে খুঁজে পেতে চেয়েছেন। এমনকি তার ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে মৃত্যুপরবর্তী জীবনেও। এ যেন কবির চিরন্তন কামনা। কোনো প্রতারণা বা অবিশ্বাসের লেশমাত্রকেও প্রশ্রয় দেননি। এ তার পরম কাঙ্ক্ষিত মাতৃভূমি এবং স্বদেশ প্রকৃতির প্রেমকেই বিশ্বাসের উচ্ছ্বাসকে প্রকট করে তুলেছেন।

কবির চোখে বিশ্ব মোহমায়ায় আবিষ্ট করলেও অন্তরের তৃপ্তি দানকারী মৃত্তিকার আবাসন শুধুমাত্র এই বাংলার চিরায়ত রূপেই বিদ্যমান বলে কবি তার আর্তি প্রকাশ করেছেন। যেমন, ধনরূপে গর্বিত এ বাংলাকে তার চির ঠাঁইয়ের একমাত্র ঠিকানা বলেও উল্লেখ করেছেন। এবং বাংলার রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রে আপ্লুত কণ্ঠে গেয়েছেন-

'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি। তাই আমি পৃথিবীর রূপ/ খুঁজিতে যাই না আর।'

হৃদয় গহিনে কবির প্রেমিকাসম মানুষটিকে যখন অতলান্তিকে হারিয়ে ফেলেন, তারই খোঁজে তিনি তাকে ফিরে পেতে চান এভাবে- কোন হ্রদে/ কোথাও নদীর ঢেউয়ে/ কোন এক সমুদ্রের জলে/ পরস্পরের সাথে দু'দণ্ড জলের মতো মিশে/ সেই এক ভোরবেলা শতাব্দীর সূর্যের নিকটে/ আমাদের জীবনের আলোড়ন-/

.....জীবিত বা মৃত রমণীর মতো ভেবে অন্ধকারে মহানগরীর মৃগনাভি ভালোবাসি। তিমির হননের তবু অগ্রসর হয়ে/ আমরা কি তিমির বিলাসী?/ আমরা তো তিমির বিনাশ হতে চাই/ আমরা তো তিমির বিনাশী। কবি এখানে হতাশার অন্ধকারে হাতড়ে না মরে প্রত্যাশার প্রেমালোকে ফিরে পেতে চান অনির্বচনীয় দৃপ্ত বিশ্বাসে এবং কোনোভাবেই পরাস্ত হতে চান না। সূর্যালোকের মতো দীপ্তিমান হতে চান সাধনার প্রেমিকাবৎ রমণীর অভিসারিণীর আকর্ষণ ভূমে। তিমির বিনাশ করতে চান সূর্যালোকের বেলাভূমিতে উজ্জ্বল হাসিতে।

কবির চিন্তা চেতনায় ছিল মনোমুগ্ধকর জীবনের গতি সঞ্চালনার অপূর্ব প্রেম ও কাব্য সাধনার স্রোতস্বিনীর মতো অবিরল ধারা; যা পত্রপল্লবে পুষ্পিত কুসুমরাজির মোহনীয় রূপ ধরা দিয়েছে সুন্দর পৃথবীতে। তাই তিনি পাতায় ও ফুলে উচ্ছল কল্লোলিত জীবনের শুধু মোহন রূপই দেখেননি, বিনম্র ভালোবাসার মাটির সোঁদা গন্ধে বাংলাকে পেয়েছিলেন স্বর্গীয় সৌরভের অতীন্দ্রিয় প্রেমালোকের জ্যোৎস্নালোকিত স্বপ্নিল রাজ্য। শুধু বাংলাকে ঘিরেই ছিল কবিতার আবেদনকারী সুর সঙ্গীতের লহরী; যা তার কাব্যের মৌমি উপত্যকার মতো সুরভিত হয় নানা ফুল্লকুঞ্জে। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থপঞ্জিগুলোর মধ্যে ছিল (জীবদ্দশায়) ঝরাপালক (১৯২৭), মহাপৃথিবী (১৯৪৪), সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮), জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৫৪) এবং মৃত্যুপরবর্তী প্রকাশিত গ্রন্থের

মধ্যে ছিল রূপসী বাংলা (১৯৫৭), বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১), সুদর্শনা (১৯৭৪), মনবিঙ্গম আলো পৃথিবী (১৯৮১) এবং জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ (১৯৯৩) প্রভৃতি। রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ সত্যিই কবি প্রেমিকদের পিপাসা বাড়িয়ে দিয়েছেন কাব্য ধারার অজস্র স্রোতের নন্দন নৃত্যালোকে। এই বাংলার প্রকৃতিতে চোখ ফেরালেই কবির মতো আমরাও গেয়ে দেখি- বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর : অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে ব'সে আছে
ভোরের দোয়েল পাখি- চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশ্বত্থের ক'রে আছে চুপ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ
দেখেছিলো; বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে-
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়-
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিলো- একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিলো পায়।

জীবনানন্দ এক `মহাপৃথিবী'। তাঁর বিভিন্ন লেখায় তাঁরা বারবার রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধানত হতে দেখলেও তিনি রবীন্দ্রনাথের বিপরীত মেরুবর্তী। চূড়ান্ত বিশ্বাসের স্থিরভূমি তাঁর ছিল না। তাঁর কাব্যের সত্য আপেক্ষিক। এই দ্বন্দ্বপীড়িত ও মানবতাবাদী কবির সত্যি কোনো জীবনদেবতা ছিল না। সে অর্থে তিনিই প্রথম আধুনিক। ধূসর পাণ্ডুলিপির `বোধ', বনলতা সেনের `অন্ধকার', মহাপৃথিবীর `আট বছর আগের

একদিন'- বাংলা কবিতার জগতে শিকড় ওপড়ানোর মতে রাবীন্দ্রিকতার অবসান ঘটিয়ে নতুন বীজ বুনে দেয়।

জীবনানন্দ ছিলেন একজন কালসচেতন ও ইতিহাসচেতন কবি। তিনি ইতিহাসচেতনা দিয়ে অতীত ও বর্তমানকে অচ্ছেদ্য সম্পর্কসূত্রে বেঁধেছেন। তাঁর কবিস্বভাব ছিল অন্তর্মুখী, দৃষ্টিতে ছিল চেতনা থেকে নিশ্চেতনা ও পরাচেতনার শব্দরূপ আবিষ্কারের লক্ষ্য। এ সূত্রে তিনি ব্যবহার করেছেন ইম্প্রেশনিস্টিক রীতি, পরাবাস্তবতা, ইন্দ্রিয়বিপর্যাস ও রঙের অত্যাশ্চর্য টেকনিক। আধুনিক কাব্যকলার বিচিত্র ইজম প্রয়োগ ও শব্দনিরীক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁর অনন্যতা বিস্ময়কর। বিশেষত, কবিতায় উপমা প্রয়োগে জীবনানন্দের নৈপুণ্য তুলনাহীন। কবিতাকে তিনি মুক্ত আঙ্গিকে উত্তীর্ণ করে গদ্যের স্পন্দনযুক্ত করেন, যা পরবর্তী কবিদের প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। উপমা প্রয়োগের নৈপুণ্য দেখা যায় তাঁর `বনতলা সেন' কবিতায় -

"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতি দূর
সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে নাবিক-হারায়েছে দিশা.."

কিংবা `বুনো হাঁস' কবিতায় -

"পেঁচার ধূসর পাখা উড়ে যায় নক্ষত্রের পানে-
জলা মাঠ ছেড়ে দিয়ে চাঁদের আহ্বানে."

পাশ্চাত্যের মডার্নিজম ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বঙ্গীয় সমাজের বিদগ্ধ মধ্যবিত্তের মনন ও চৈতন্যের সমন্বয় ঘটে ওই কাব্যান্দোলনে।এখনো বাংলার রোম্যান্টিক মন বনলতা সেনের সন্ধান করে।

নতুন আলোকে জীবনানন্দের বনলতা সেন গ্রন্থটির একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত এই আলোচনার অন্যতম আলোচ্য বিষয়। তাঁর বইটিতে জীবনানন্দ কবিতা রচনা করেছেল তার অন্তরের আবেগ ‘চাবিকাঠির’ সহায়তায়। ‘এ চাবিকাঠি হচ্ছে

তাঁর আপাত-দুর্বোধ্য কবিতায় ব্যবহৃত দুই-একটি বিশেষ শব্দ। এসব শব্দ হচ্ছে সাংকেতিক বার্তায় দুর্বোধ্যতার সমাধান'। জীবনানন্দের বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতাটির অর্থ খোঁজার ক্ষেত্রেও তিনি চাবিকাঠি হিসেবে নির্বাচন করেছেন কবিতায় ব্যবহৃত 'নাটোরের বনলতা সেন', 'দুদন্ড শান্তি', 'অন্ধকার', 'হাজার বছর ধরে পথ হাঁটিতেছি', 'বিদিশার নিশা' ইত্যাদি শব্দ বা শব্দসমষ্টিকে ।কবিতাটির 'নিবিড় বিশ্লেষণে' যা দেখা যায় তা থেকে দুটি স্বতন্ত্র বিষয়কে প্রশ্নরূপে চিহ্নিত করা যায় : প্রথমত, কবি বনলতা সেন নামটি কোথা থেকে পেয়েছেন? দ্বিতীয়ত, কবিতাটিতে জীবনানন্দ বনলতা সেনকে নারী চরিত্র হিসেবে কীভাবে কল্পনা করেছেন? কবিতার বক্তা বা নায়কের সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে জীবনানন্দের ভাবনা কী ছিল? আপাতদৃষ্টিতে প্রশ্নদুটি স্বতন্ত্র যদিও তাদের মধ্যে সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নয়।

প্রথম প্রশ্নটির কোনো সুনির্দিষ্ট উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। এ-প্রসঙ্গে বিভিন্ন সম্ভাবনা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, নামটি কবি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন তা জানা সম্ভব নয়। তিনি দ্বিতীয় প্রশ্নটির যে উত্তর পাওয়া যায় সেটি হল, চাবিকাঠিগুলো সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, কবিতার বনলতা সেনকে কবি চিহ্নিত করেছেন এক প্রেম রূপে।

জীবনানন্দ কোন অনুষঙ্গে নামটি পেয়েছিলেন সে-সম্বন্ধে আমি একটি তথ্য জানতে পারি অশোক মিত্রের একটি প্রবন্ধ থেকে। 'বনলতা সেন' কবিতাটির প্রথম প্রকাশের পর ৭৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়া উপলক্ষে ২১ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় 'রাজশাহি জেলে বন্দি ছিলেন এক বনলতা সেন' শিরোনামে অশোক মিত্রের যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় তা থেকে উদ্ধৃত তুলে ধরা হল-

এক নিভৃত সন্ধ্যায় জীবনানন্দের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম, বনলতা সেন নামটি কবিতায় ব্যবহারের জন্য তাঁর কী করে মনে এলো; সেইসঙ্গে এটা জিজ্ঞেস করেছিলাম, কবিতাটির অন্তঃস্থিত অন্ধকারের প্রসঙ্গ তাঁর কি আগে থেকেই

ভাবা ছিল, নাকি বনলতা সেন নামটি বেছে নেওয়ার পর কবিতাটি নিজের নিয়তি নির্ধারণ করেছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের কোনো জবাব পাইনি। জীবনানন্দ শুধু জানিয়েছিলেন, সেই সময় আনন্দবাজার পত্রিকায় মাঝে মাঝে নিবর্তক আইনে বন্দিরা কে কোন কারাগারে আছেন, বা কোন জেল থেকে কোন জেলে স্থানান্তরিত হলেন, সে-সমস্ত খবর বেরোত। হয়তো ১৯৩২ সাল হবে, নয়তো তার পরের বছর, বনলতা সেন নাম্নী এক রাজবন্দি রাজশাহি জেলে আছেন, খবরটা তাঁর চোখে পড়েছিল, রাজশাহি থেকে নাটোর তো একচিলতে পথ। ইতিবৃত্তের এখানেই শেষ। প্রাকস্বাধীনতা যুগে রাজবন্দিনী সেই মহিলা পরে গণিতের অধ্যাপিকা হয়েছিলেন, কলকাতার কলেজেও পড়িয়েছেন। বিবাহোত্তর পর্বে অন্য পদবী ব্যবহার করতেন, তাঁর সঙ্গে সামান্য আলাপ হয়েছিল। ভব্যতাবশতই জিজ্ঞেস করা হয়নি তিনি কবিতাটির সঙ্গে আদৌ পরিচিত কিনা। কিছু কিছু রহস্যকে অন্ধকারে ঢেকে রাখাই সম্ভবত শ্রেয়।

এই প্রবন্ধটি পরে অশোক মিত্রের বিক্ষিপ্ত অর্ধশতক (আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০১৪) নামে প্রবন্ধ সংকলনে ‘বনলতা সেন’ নামে অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কবিতার প্রথম বছরের দ্বিতীয় সংখ্যায়, ১৩৪২ বঙ্গাব্দের পৌষ, ‘বনলতা সেন’ কবিতার প্রথম প্রকাশ। জীবনানন্দ এবং তাঁর পরিবারকে অশোক মিত্র ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন। বাংলার বাইরে পাঠরত এবং কর্মরত থাকার সময় ছুটিতে তিনি যখন কলকাতায় বাবা-মার কাছে যেতেন, তখন তাঁদের বাসা থেকে অনতিদূরবর্তী জীবনানন্দের বাসাতেও তাঁর যাতায়াত ছিল। তিনি সাম্প্রতিককালের বাংলা ভাষার শক্তিমান প্রাবন্ধিকদের অন্যতম। এ-বিষয়ে একমাত্র প্রয়োজনীয় তথ্য এই যে, জীবনানন্দ ১৯৩২ বা ১৯৩৩ সালে রাজশাহী জেলে আটক এক বন্দিনীর নামকে একটি বিমূর্ত নাম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, বাস্তব নামধারিণী সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণা বা আগ্রহ ছিল না। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, বাস্তবের বনলতা সেন/ চক্রবর্তী নিজেও সম্ভবত এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাঁর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এমন একাধিক

ব্যক্তি উল্লেখ করেছেন যে, বাংলা ভাষার একটি মহৎ কবিতা তাঁর নামাঙ্কিত এ-বিষয়ে তিনি নির্লিপ্ত ছিলেন, কখনো কোনোরকমের শ্লাঘা প্রকাশ করতেন না।মহৎ কবিতার বৈশিষ্ট্য এই যে তা বিভিন্ন পাঠককে, বিভিন্ন কালের পাঠককে, বিভিন্ন উপলব্ধিতে অনুপ্রাণিত।তা হলেও জীবনানন্দের যন্ত্রণাকাতরতার সমাপ্তি নেই, যে-রহস্য কবিকে কুরে খাচ্ছে, তা ঘোচবার নয়, অন্ধকার অপরাজেয়। সন্ধ্যা নামে। পৃথিবীর দেনা-পাওনার নিবৃত্তি, সব পাখি ঘরে ফিরে আসে, পুঞ্জীভূত অন্ধকার, সেই রহস্যলগ্নার সঙ্গে মুখোমুখি। তবু স্রেফ দুদন্ড শান্তি কেন, সেই আশ্রয়দাত্রীর ভূমিকা কেন চিরন্তন নয়? কবি নিজেও উত্তর জানেন না। সন্ধ্যা নামলে সব পাখি ঘরে ফেরে, কিন্তু সব নদী? অন্ধকার জমাট হয়ে অবতরণ করলে নদীদের গন্তব্যের তো হেরফের হয় না। নদীদের উৎসে ফেরার উপায় নেই, তাদের মহাসমুদ্রের গভীরতর অন্ধকারের দিকে অভিযাত্রা অব্যাহত। ক্ষণিক মুহূর্তের শান্তি বিতরণের বেশি কিছু দিতে তাই নাটোরের বনলতা সেন অপারগ। ফের হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে না হেঁটে পরিব্রাজকের পরিত্রাণ নেই, ইতিহাসের অন্ধকার তাকে গ্রাস করতেই থাকবে।এবং তখন বনলতা সেন চিরকালীন আবেগ হয়ে থাকবে পাঠকের মনে।

জীবনানন্দ দাশের কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করা জটিল এবং দুরূহ। এ কারণেই যে, কবিতা আলোচনার পূর্বে নিদেনপক্ষে কবি-মানস সম্পর্কে একটি স্পষ্টত ধারণা লাভের প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে, জীবনানন্দের কবি-মানস একটু ভিন্নতর, কারণ, তাঁর কাব্য-বেশিষ্ট্য, চেতনাজগৎ, বোধ ও উপলব্ধি, আবেগ-অনুভব কিংবা তাঁর শব্দ-অনুষঙ্গ, শব্দের বহুমাত্রাবিধ অর্থদ্যোতনা বা ভাষার তীর্যকতা, প্রকাশ-শৈলী ইত্যাদি তাঁর কবিতাকে এমন মহিমান্বিত করেছে, যা তাঁর সময়ের বা পূর্ববর্তীদের থেকে ভিন্নতর এবং স্বকীয় বেশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এতসব বিষয় সম্পর্কে অবগত না হলে জীবনানন্দের কবিতা আলোচনা নিতান্তই জলো হবে, বলা বাহুল্য। কারণ, জীবনানন্দের কবিতা

মন্তব্য

আলোচনা মানে আধুনিকতার আলোচনা, যুগযন্ত্রণা, আধুনিক জীবন দর্শন প্রজ্ঞা ও চেতনার আলোচনা। তো, একটি সুবিধে থাকে, মোটা অর্থে, যদি গোটা কয়েক কবিতার আলোচনা করা হয়। কিন্তু, যদি হয় সুনির্দিষ্ট একটি কবিতা তাহলে জটিল তো বটেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কবিতা আলোচনা বা কবিতার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রায়শ কবিতার মর্মার্থ উদ্ধারে ইতিবাচক হলেও, তা কবিত্ব বা কবিতার দ্যোতনাকে আবিস্কারের জন্য কতটুকু ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখে, তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। কেননা, কবিতায় অন্তর্নিহিত দ্যোতনাকে উপলব্ধি করতে হয়। ফলে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবিত্বকে, কবিতার দ্যোতনাকে উপলব্ধি করতে হয়। আর গভীর উপলব্ধি ব্যাখ্যাতীত, বলা বাহুল্য।

মানুষের আকাঙ্খা তবু দুর্নিবার। নিত্য নতুন অভিজ্ঞানের পথে তার যাত্রা ধাবমান। আবিষ্কারের নেশা মানুষের আদিমতা প্রবৃত্তি। অধরাকে স্পর্শ করার স্পৃহা মানুষকে, সভ্যতা ও সমাজকে ক্রমাগত অগ্রসর করেছে। আর এমন অনুশীলনের ফলেই মানুষের চেতনা ও উপলব্ধিতে যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রা। আলোচনা-পর্যালোচনা আর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। কারণ, লুক্কায়িত অগ্নির স্ফুরণকে, গলিত লাভার আবরণকে কেবল চোখে দেখে আস্বাদ লাভ করা যায় না, তা আরো আরো পেতে গেলে প্রয়োজন হয় নানা মাত্রায়, বিভিন্ন প্রকরণে দেখে নেয়া। আর বিশেষ করে, কবিতার ক্ষেত্রে তো তা অত্যান্ত আবশ্যক। যেহেতু, কবিতা কেবল কবিতা নয়, এর বাইরেও অনেক কিছু, ফলে, একে আবিষ্কার করার জন্য বিশ্লেষণ জরুরি। আর এ বিশ্লেষণের দায় সমালোচকের। একজন পাঠক হয়তো কোনো কবিতার স্বাভাবিক স্বাদ নিতে পারে, কবিতা তার উপলব্ধিতে যোগ করতে পারে নতুন মাত্রা, ঝলসে দিতে পারে ব্যঞ্জনাময়, তদুপরি।এই ভূমিকার অবতারণা জীবনানন্দ দাশের ‘মৃত্যুর আগে’ কবিতার আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই অন্তত দু’টি সীমাবদ্ধতার কথা পাঠককে জানান দেয়া যায়। ফলে, ‘মৃত্যুর আগে’র বিশ্লেষণে কোনো সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ নয়, কবিতাটির উপর আলোকপাতের একটি প্রয়াস মাত্র। ‘মৃত্যুর আগে’ কবিতার

উপর আলোকসম্পাতও কেবল এই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর। এতে করে, সীমাবদ্ধতা থাকাই স্বাভাবিক।আলোচনার পূর্বে পড়ে নেয়া নেয়া যাক কবিতাটি।

আমার হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউস সন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার ; কবেকার পাড়াগাঁর মেয়েদের মতো যেন হায়
তারা সব ; আমরা দেখেছি যারা অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল
জোনাকিতে ভরে গেছে; যে-মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে
চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ- কোনো সাধ নাই তার ফসলের তরে;

আমরা বেসেছি যারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীত রাত্রিটিরে ভালো,
খড়ের চালের 'পরে শুনিয়াছি মুগ্ধ রাতে ডানার সঞ্চার;
পুরোনো পেঁচার ঘ্রাণ;- অন্ধকারে সে আবার কোথায় হারালো?
বুঝেছি শীতের রাত অপরূপ-মাঠে-মাঠে ডানা ভাসাবার
গভীর আহ্লাদে ভরা; অশথের ডালে-ডালে ডাকিয়াছে বক;
আমরা বুঝেছি যারা জীবনের এই সব নিভৃত কুহক;

আমরা দেখেছি যারা বুনোহাঁস শিকারীর গুলীর আঘাত
এড়ায়ে উড়িয়া যায় দিগন্তের নম্র নীল জ্যোৎস্নার ভিতরে
আমরা রেখেছি যারা ভালবেসে ধানের গুচ্ছের 'পরে হাত,
সন্ধার কাকের মতো আকাক্সক্ষায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে;
শিশুর মুখের গন্ধ ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ
আমরা পেয়েছি যারা ঘুরে-ফিরে ইহাদের চিহ্ন বারোমাস;

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,

ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,

চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু-বেলা

নির্জন মাছের চোখে;- পুকুরের 'পারে হাঁস সন্ধার আঁধারে

পেয়েছে, ঘুমের ঘ্রাণ- মেয়েলি হাতেতর স্পর্শ ল'য়ে গেছে তারে;

মিনারের মতো মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,

বেতের লতায় চড়–য়ের ডিম যেন নীল হ'য়ে আছে,

নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বারবার তীরটিরে মাখে,

খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে;

বাতাস ঝিঁঝির গন্ধ- বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে;

নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাক্সক্ষায় নেমে আসে;

আমরা দেখেছি যারা নিবিড় বটের নিচে লাল-লাল ফল

প'ড়ে আছে; নির্জন মাঠের ভিড় মুখ দেখে নদীর ভিতরে,

যত নীল আকাশেরা র'য়ে গেছে খুঁজে ফেরে আরো নীল আকাশেল তল;

পথে-পথে দেখিয়াছি মৃদু চোখ ছায়া ফেলে পৃথিবীর 'পরে;

আমরা দেখেছি যারা শুপুরির সারি বেয়ে সন্ধ্যা আসে রোজ,

প্রতিদিন ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ;

আমরা বুঝেছি যারা বহুদিন মাস ঋতু শেষ হ'লে পর

পৃথিবীর সেই কন্যা কাছে এসে অন্ধকারে নদীদের কথা

ক'য়ে গেছে;- আমরা বুঝেছি যারা পথ ঘাট মাঠের ভিতরে

আরো-এক আলো আছে: দেহে তার বিকাল বেলার ধূসরতা;

চোখের দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হ'য়ে আছে স্থির:

পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লাণ ধূপের শরীর;

আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝতে চাই আর? জান না কি আহা,

সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে

ধূসর মৃত্যুর মুখ; - একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিল- সোনা ছিল যাহা

নিরুত্তর শান্তি পায়; যেন কোন মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে।

কি বুঝিতে চাই আর;- রৌদ্র নিভে গেলে পাখ-পাখালির ডাক

শুনিনি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক!

'মৃত্যুর আগে'র পূর্বপট'-এ জ্যোতির্ময় দত্ত শুরুতেই বলেছেন 'জীবনানন্দের মূল কাব্যাংশের থেকে এ-কবিতা আলাদা। এর দর্শন জটিল নয়, পরস্পর বিরোধী নয় এর চিত্রকল্প, সিঁড়িভাঙ্গা নয় এর গড়ন। কবি এখানে ক্লান্ত কি নিঃসঙ্গ নন।' তো, জ্যোতির্ময় দত্ত তাঁর বক্তব্যের পক্ষে শেষ পর্যন্ত কোনো জোরালো ব্যাখ্যা দাঁড় করেন নি। 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটিতে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থ থেকে আলাদা করে দেখলেও জীবনানন্দের কবিতার বৈশিষ্ট্য থেকে আলাদা করে দেখার অবকাশ নেই। বরং এখানে তাঁর কাব্য-মানসই প্রকাশিত হয়েছে, যা সমগ্রতাকে অনেকাংশে প্রতিনিধিত্ব করে। কারণ, জীবনানন্দের জীবন-দর্শন, ইতিহাস-চেতনা, মৃত্যুচিন্তা,আলো-আঁধারি পরিবেশ, বিরোধপূর্ণ চিত্রকল্প ইত্যাদি পরিস্ফুট এই কবিতায়। তা আরো স্পষ্ট করে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায়, যেমন প্রথম স্তবকে 'নারী ছড়াতেছে ফুল কুয়াশার' বা 'অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল জোনাকিতে ভরে গেছে' পংক্তিতে স্পষ্টতই বিরোধাভাস ফুটে ওঠে। ফুল এবং কুয়াশা বা অন্ধকার এবং জোনাকি জীবনানন্দের কবিতার বিরোধ বা দ্বান্দ্বিক চিত্রকল্পেরই প্রতীক। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, জীবনানন্দের কবিতার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো দ্বান্দ্বিক অগ্রসরমানতা।এ কবিতাটিতেও এ দ্বান্দ্বিকতার আভাস পাওয়া যায়। 'কবি এখানে ক্লান্ত কি নিঃসঙ্গ নন' এমন উপসংহারে উপনীত হওয়া কষ্টসাধ্য। যদিও এখানে 'আমরা ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তবু তা কবিতাটিকে নৈর্ব্যক্তিকতায় উপনীত করার জন্যই, যেমনটি মহৎ কবিতা দাবী করে। 'যে

মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ' 'অন্ধকারে সে আবার কোথায় হারালো ' 'নির্জন মাঠের ভিড়' ইত্যাদি নিঃসঙ্গতার আবহই সৃষ্টি করে, যদিও তাঁকে 'নির্জনতম কবি' হিসেবে আখ্যায়িত করা অপব্যাখ্যার সামিল। একদিকে সন্ধ্যা যেমন অস্পষ্টতাকে ইঙ্গিত দেয়, অন্যদিকে আকাঙ্খা ভবিষ্যত উচ্ছ্বাসময়তারই ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু আবদুল মান্নান সৈয়দ জীব জগৎ ও উদ্ভিদ বা ইন্দ্রিয়-সান্দ্র পরিবেশের কথা উল্লেখ করেছেন- মূল অন্তর্নিহিত অর্থের আলোকপাত তেমন না করে। আসলে তিনি **Keatsএর Ode to Nitingale**-এর সাথে সাদৃশ্য খুঁজতে গিয়ে ইন্দ্রিয় নির্ভরতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। আর **Keats-এর sensuousness**–এর সাথে জীবনানন্দের ইন্দ্রিয় নির্ভরতার প্রতি তুলনা করেছেন। কিন্তু, Keats এবং জীবনানন্দের sensuousness অভিন্ন নয়। তাঁর আলোচনায় এ বিষয়টি আরো স্পষ্টতার দাবী রাখে। তো, এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, জীবনানন্দের 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটিতে নিসর্গ-পরিবেশের বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু, জীবনানন্দের নিসর্গের বৈশিষ্ট্য কি এ বিষয়ে কোনো আলোকপাত হয় নি বললেই চলে। এ প্রসঙ্গে বলে নেয়া ভালো যে, কবিতাটিতে নিসর্গ বর্ণনা আছে, যে নিসর্গ নিথর, স্তব্ধ নয়, বরং জীবন্ত শক্তির প্রতীক। প্রকৃতির মাঝে যে জীবন্ত সত্তা ও শক্তি নিহিত এরিস্টটল একে বলেছেন Panthe-ism। ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতিও এমন ছিল, জীবনানন্দের প্রকৃতিও জীবন্ত-প্রতীকী ব্যঞ্জনা ভরা। তো, সেই প্রকৃতির বর্ণনাতেও দেখা যায় যে, জীবনানন্দ দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছেন। 'মৃত্যুর আগে' তে দেখা যায়: 'দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ'- এখানে হলুদ ক্রমাগত ক্ষয়ে যাওয়ার প্রতীক, কিম্বা 'দেহে তার বিকাল বেলার ধূসরতা', ইত্যাদি। ফলে, নিসর্গ বর্ণনাতেও কাব্য-ভাষার পরস্পর বিরোধী উল্লেখ লক্ষণীয়।

সুমিতা চক্রবর্তী 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ও 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মৃত্যুর আগে'র ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন স্তবকানুযায়ী। পাঠান্তরে ব্যাখ্যায় তিনি

জীবনানন্দের গভীরতর উপলব্ধির স্তরকে উন্মোচিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। সুমিতা চক্রবর্তী জীবনানন্দের পরিগ্রহণ অভ্যাসের নিজস্ব ধারণার কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, সবসময় সাদৃশ্য পাঠনুকুল্যেই হবে তা নয়, বরং পাঠ না করেও সাদৃশ্যমূলক চিন্তা প্রকাশ পেতে পারে। আলোচনার শেষে তিনি উল্লেখ করেছেন নিসর্গ-নিবিড় জীবনের 'কুহক' এবং মৃত্যুর আসন্নতায় জীবনানন্দের প্রগাঢ়তার কথা। কিন্তু, একটি বিষয় যে, জীবনানন্দের কবিতায় নিসর্গ যতই আপনভাবে ফুটে উঠুক না কেন, তিনি নিসর্গ বন্দনা নয়, জীবনের আরো আরো গভীর দিকগুলো ছুঁতে চেয়েছিলেন, যা তাঁর পাঠককে আজো ভাবিয়ে তুলে ততোধিক প্রণোদণায়।

'জীবনের দর্শন, মৃত্যুর আগে ও আস্তিক কবি জীবনানন্দ' শিরোনামে যতীন সরকার দীর্ঘ পটভূমি টেনে কবিতার বিশ্লেষণ করেছেন। তো, এই কবিতার ব্যাখ্যার চাইতে যতীন বাবু কাব্য-দর্শনকে ব্যাখ্যা করেছেন অধিক। 'মৃত্যু' একটি দার্শনিক প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ, একটি স্বতন্ত্র দর্শন। মৃত্যুচিন্তা বিস্মৃত হয়েছে ধর্মচিন্তার সাপেক্ষে অর্থাৎ মৃত্যু ধর্মচিন্তারও উপাদান। যতীন সরকার এমন বলেছেন 'মৃত্যুর আগে'র আলোচনার পটভূমিকায়। মৃত্যুর প্রতিভাস লেখকের দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন। এই অনিবার্য পরিণতি জীবনেরই আরেক বিস্তার, কিম্বা জীবনেরই নির্যাস। এই মৃত্যু একটি দর্শন যা মানুষকে প্রতিনিয়ত ভাবিয়ে তুলছে এবং অনন্তকাল অবধি ভাবিয়ে তুলবে। যতীন সরকার বলেছেন যে, 'আধুনিক জীবন চেতনা জীবনানন্দকে নাস্তিক বানিয়েছে, না গভীরতর ও ব্যাপকতর অর্থ আস্তিক্যে অভিষিক্ত করেছে।' রবীন্দ্রনাথ 'মৃত্যুর আগে' কবিতাকে বিশেষায়িত করেছিলেন 'চিত্ররূপময়' হিসেবে। যতীন বাবু বলেছেন, কবিতাটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। কিন্তু কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি যে যথার্থ বিচার নয়, তা মনে করে। এমন কি 'বাংলা কাব্য পরিচয়'-এ তিনি মূল ৪৮ লাইনের কবিতাটিকে গ্রহণ করেন নি। ফলে যতীন বাবুর এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ, 'মৃত্যুর আগে'র যে দর্শন ও

ব্যাপ্তি তা রবীন্দ্রনাথের উক্তির চেয়েও আরো ব্যাপকতর। কেবল 'চিত্ররূপময়' বা 'তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে' বলে রবীন্দ্রনাথের উক্তি কবিতাটিকে সীমাবদ্ধ করে। জীবনানন্দের প্রতি তা অবিচারের সামিল। তবে যতীন সরকার যথার্থ বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের মৃত্যুচেতনা জীবন চেতনারই প্রকাশ মাত্র। উভয়ের ক্ষেত্রেই মৃত্যু চেতনার আধারে জীবন ও জগতই তাদের মূল উপজীব্য বিষয়বস্তু।ধর্মচৈতন্যের বাইরে আস্তিক্য ও নাস্তিক্যের যে ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন তিনি তা পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তিনি বলেছেন যে, 'ঈশ্বর বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের উপর আস্তিকতা-নাস্তিকতা নির্ভরশীল নয়। নিজের প্রতি, জীবনের প্রতি মানুষের প্রতি সত্যের প্রতি, নীতিবোধের প্রতি, ইতিহাসের প্রতি, বিজ্ঞানের প্রতি বা এরকম যেকোনো শুভ সত্তার প্রতি আস্থাই আস্তিকতা। এসব কোনো কিছুরই প্রতি আস্থা না থাকাই নাস্তিকতা। সে অর্থে, জীবনানন্দ অবশ্যই আস্তিক। অর্থাৎ যতীন বাবু গতানুগতিক তত্ত্ব ও ধর্মদর্শনে না গিয়ে যৌক্তিকভাবে জীবনানন্দের জীবনের আস্তিক-দর্শনকে প্রতিভাত করেছেন। ফলে কবির এ উক্তিরই যথার্থতা পাওয়া যায় যে, 'আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, আমি মানুষের নীতিবোধে বিশ্বাস করি।' এবং এ কথাও পাঠক বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে, সীমাবদ্ধ প্রথাগত ঈশ্বর চিন্তয় জীবনানন্দের চিন্তা-চেতনা সীমাবদ্ধ থাকে নি। আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা এই যে, স্থুল দৃষ্টিভঙ্গিতে 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় হিন্দু বা বোদ্ধ জন্মান্তরবাদের ছায়া লক্ষ্য করা গেলেও, প্রকৃত পক্ষে, তা নয়; কারণ, এখানে ধর্মবিশ্বাসজাত জন্মান্তরবাদের সম্পর্ক নেই। 'প্রান্তরের কুয়াশায় ওড়ে গেছে কাক' জীবনেরই প্রবহমানতা।জীবন দর্শন প্রতিতভাত হয়েছে এ কবিতায়, আরো অনেক কবিতার ক্ষেত্রেও যা হয়েছে।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম যথার্থ বলেছেন 'মৃত্যুর আগে'র আলোচনায় যে, কোনো কবি তার ব্যবচ্ছেদ আর প্রধান কাব্য বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচনা করা ভিন্নতর। জীবনানন্দও ছিলেন ব্যবচ্ছেদ বিরোধী। কিন্তু, মনজুরুল ইসলাম

ব্যবচ্ছেদ করেছেন স্তবকানুযায়ী। তিনি মূলত মৃত্যুদর্শন নিয়ে বলেছেন, যারা 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটিকে শূন্যধর্মী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তাদেরকে মেনে নেন নি। তাঁর মতে, এটি শূন্যতা-ও না, পূর্ণতা-ও না। বরং তিনি এখানে একটি সান্তনা খুঁজার প্রয়াস পেয়েছেন।মৃত্যুবিলাস হিসেবে যেভাবে তিনি জীবনানন্দকে ও কীটসকে বলতে চেয়েছেন তা স্থুল অর্থ বহন করে।

মৃত্যুচিন্তা একটি দর্শনের প্রতিভূ। জীবনের দার্শনিক প্রজ্ঞার একটি স্তর-বিন্যস্ত ভাব-দর্শন মৃত্যুচিন্তা।একে বিলাস বলা হলে তা আর দার্শনিক উপস্থিতিতে বিরাজমান থাকে না আরো স্থুলার্থ হয়ে পড়ে। তবে তিনি দার্শনিকতার কথাও বলেছেন অন্যভাবে। 'মৃত্যুর আগে' কবিতার দর্শনকে তিনি হালকা করে দেখার প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু কবিতাটির দর্শন কখনোই হালকা নয়, পাঠকের কাছে এভাবেই কবিতাটি বর্তমান।

তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায় 'মৃত্যুর আগে জীবনানন্দ দাশ' রচনায় স্তবক বিন্যাসের সাথে যোগসূত্রের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়েছেন এবং তিনি বলেছেন যে, কবিতার উৎকর্ষতা বুঝতে হলে জীবনান্দ মালমশলা কোথায় থেকে সংগ্রহ করেছেন তা বুঝতে হবে। কিন্তু, কাব্য-উপলব্ধির জন্য প্রায়শ এসব তথ্যাদি উপকারী হলেও, তা অনাবশ্যক নয়। আর এমন বক্তব্যকে আমরা জীবনানন্দের মতো একজন মহৎ কবির কবিতাকে উপলব্ধির জন্য জরুরি মনে করি না। তিনি তুলনামুলক চিত্র উপস্থাপন করেছেন সম্পর্কের রেখা টেনে। ড্রিঙ্কওয়াটারের কবিতার সাথে 'মৃত্যুর আগে'র সাযুজ্যের কথা বলেছেন সুমিতা চক্রবর্তীও।

"মৃত্যুর আগে' জীবনের" রচনায় আবু তাহের মজুমদার কবিতাটিকে 'নগরায়িত পল্লীময়তা' অভিধায় চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। 'খড়ের মাঠে পউষ সন্ধ্যা', 'মাঠের পারে নরম নদীর নারী', 'কবেকার পাড়াগাঁর মেয়ে', ইত্যাদি পংক্তির উল্লেখ করে বলেছেন যে, এই সুবিশাল ক্যানভাস 'পল্লী-প্রকৃতির'। ভাল কথা, কিন্তু জীবনানন্দের প্রকৃতি নিথর বোবা প্রকৃতি নয়। প্রকৃতির

বহুবর্ণিলতা, চিত্রময়তা জীবন্ত আভাস প্রতীকী অর্থে ব্যাপকতর। কবিতাটির দীর্ঘ আলোচনা করেছেন মজুমদার তুলনামূলক সাহিত্যের উদ্ধৃতি দিয়ে। কবিতার ছন্দের ব্যাপারেও তিনি উল্লেখ করেছেন। তো, দেখা যায়, 'মৃত্যুর আগে' কবিতার যে মৌল প্রণোদনা ও দ্যোতনা, তার সারবস্তু অনেকটা ঝিমিয়ে পড়েছে প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক আলোচনায়। কখনো কখনো বেশ বিচ্ছিন্ন। মেধার বিশ্লেষণের পরও সবসময় অনুভবের মাত্রাটি টের পাওয়া যায় না। কাব্যোপলব্ধি তাই স্বতন্ত্র ব্যাপার, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পরও তা অনেক সময় স্পর্শ-রহিত থেকে যায়।

ফয়জুল লতিফ চৌধুরী 'আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর'? শিরোনামে কবিতাটির প্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি উল্লেখ করেছেন। কবিতাটিতে যে জীবনানন্দের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা-ও জানা যায়। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে অন্তর্ভুক্ত হলেও চৌধুরী বলেছেন ভাবাদর্শের দিক থেকে সাযুজ্য বলেই হয়তো এই গ্রন্থে তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যদিও তা নয় নম্বর খাতায় পাওয়া যায়, যা গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলো সময়ের বিচারে। তিনি 'মৃত্যুরআগে' কবিতাটিকে উত্তরাধুনিক চেতনায় সমৃদ্ধ হলে তাকে কেবল বিশেষায়িত না করে- এর ভিতরের উপাদানগুলোকে টেনে বের করে নিয়ে আসা প্রয়োজন, যা জীবনানন্দের পাঠকদের জন্য একটি নতুন পাঠ, নতুন অভিজ্ঞতা হতে পারে।

জীবনানন্দের অনেক কবিতার মতোই 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটিতে জীবন মৃত্যুর উভযোজ্যতা বিদ্যমান। যথার্থ বলেছেন- এইসব নিভৃত কুহক: 'মৃত্যুর আগে' নিবন্ধে খোন্দকার আশরাফ হোসেন। তিনি শেষে বলেছেন যে, প্রান্তরের কুয়াশার মধ্যে যে কাক উড়ে যায়, সে-ও জীবনের দিকেই যাত্রা করে; কেননা, প্রকৃতি তো শেষ পর্যন্ত তিমির বিনাশী। আসলে, জীবনানন্দের মৃত্যুচিন্তা নিছক মৃত্যুভাবনা নয়, তারও অধিক কিছু, জীবনের স্ফুরণ ও আভাস। 'মৃত্যুর আগে' কবিতাতেও তাই ব্যাপ্ত হয়েছে।

'মৃত্যুর আগে': ব্যক্তিক অনুভবের বৃত্তে' সরদার আব্দুস সাত্তারের দীর্ঘ আলোচনায় কবিতার মূল দর্শন বিষয়ে কমই আলোকপাত করা হয়েছে। কেবল স্তবক অনুযায়ী কবিতার ব্যাখ্যা হয় না, যেমন হয় না শব্দানুযায়ী। পংক্তি বা স্তবক বিন্যাসে অবশ্যই যোগসূত্র রয়েছে, তবে এর দর্শন বা কবিত্ব কিন্তু সমগ্র বিন্যাসকে নিয়েই।

তুষার দাশ 'মৃত্যুর আগে': ব্যক্তি-সমষ্টির জীবন নাট্য ও আমার জীবনানন্দ' আলোচনায় ব্যক্তিগত কতিপয় বিষয়ের অবতারণা করেছেন পটভূমিকায়। জীবনানন্দ পাঠে সমস্যা, হাজার বছরের ঐতিহ্যের সামনে জীবনানন্দ, জীবনানন্দের বিভিন্ন পাঠ, 'মৃত্যুর আগে'র বিভিন্ন আলোচনা পাঠ ইত্যাদি তার ব্যক্তিগত সমস্যাকে সমাধান করছে হয়তো, তাই বুঝি, তার আলোচনা পাঠ সম্ভব হল পাঠকের; না হয়, তার অপারগতায় এ পাঠ সম্ভব হতো না আমাদের, তার ভাষায় এমনি বুঝা যায়। কবিতার বিচ্ছিন্নতা-অবিচ্ছিন্নতা, হাজার বছরের প্রেক্ষাপট, বৈশ্বিক বিবেচনা ইত্যাদি প্রসঙ্গ ভেবেছেন তুষার। উপরন্তু, জীবনানন্দ সমালোচকের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন যেমন: আবদুল মান্নান সৈয়দ, দেবী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর 'মৃত্যুর আগে' আলোচনা পাঠ এবং সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্যের। এসব তার ব্যক্তিগত কথা যা 'মৃত্যুর আগে' আলোচনার জন্য জরুরি ছিলনা। জীবনানন্দ কতোবার যতিচিহ্ন-কমা, সেমিকোলন, ড্যাশ ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন, তা দিয়ে কবিতার অন্তর্নিহিত সত্তাকে উপলব্ধি করা যায় না।

তুষার বলেছেন যে, জীবনানন্দকে 'শুদ্ধতম' আখ্যা দেয়ার মধ্যে যুক্তির চেয়ে আবেগ অনেক বেশি ক্রিয়াশীল। কারণ, তাঁর মতে, জীবনানন্দের নানা কবিতায় নানা ত্রুটির বিষয়টি একেবারে অনুপস্থিত নয়। বেশ সাহসী উচ্চারণ তুষারের। তবে 'শুদ্ধতম' আখ্যায়িত করার মধ্য দিয়ে জীবনানন্দের প্রতিভা ও শক্তিকে, তার কবিত্ব-প্রতিভাকেই ইতিবাচকভাবে দেখা হয়েছে; যথার্থভাবে।'মৃত্যুর আগে' কবিতার উপমা শব্দ ব্যবহার প্রসঙ্গে তুষার বলেছেন,

তা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা কবিতার নতুন সংযোজন অনেক শব্দ-পরম্পরা 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় আমরা পাই। যেমন- নির্জন খড়ের মাঠ, পুরোনো পেঁচার ঘ্রাণ, জীবনের এইসব নিভৃত কুহক, রাঙা কামনার শিয়রে ইত্যাদি। তবে আলোচকের নিজস্ব অভিমত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অধিক উপস্থাপনা জরুরি। কয়েকটি ব্যক্তিগত ফুটনোট ও সংযোজন করেছেন আলোচনা শেষে। যথার্থতা রয়েছে বলে মনে করি। এখানে একটা বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক যে, কবিতার ব্যাখ্যার জন্য বিচ্ছিন্ন শব্দ, পংক্তি, শব্দ-পরম্পরা ইত্যাদি জরুরি নয়, কিংবা যতিচিহ্নের ব্যবহার, মাত্রার ব্যবহার ইত্যাদি। সমালোচনার জন্য আবশ্যক বিষয় হচ্ছে, পাঠকের সামনে কবিতার মূল বিষয়, চেতনা বা দ্যোতনাকে তুলে ধরা, নতুন আবিষ্কারে, পাঠকের কাছে যা, গুরুত্বপূর্ণ; অথাৎ কবিতার বৈশিষ্ট্য সমূহের স্বাদ গ্রহণে পাঠক যেন সমর্থ হয় নতুন অভিজ্ঞতায়।

ময়ূখ চৌধুরী 'জীবনানন্দের মৃত্যুর আগে' কবিতার আলোচনায় বলেছেন যে, সৌর চেতনার ধারক বাহক হয়েও রবীন্দ্রনাথের মতো আলোকিত পর্বে পদার্পণ করতে পারেন নি জীবনানন্দ। বা, আলোর প্রসঙ্গ এলেও শেষ পর্যন্ত অন্ধকারের প্রাবল্য তাকে পরাজিত করে। কিন্তু, আমরা এ-ও জানি যে, নৈরাশ্যদীর্ণ হতাশাময় অবস্থায় আলোকিত কবিতার সৃষ্টি সম্ভব নয়। বাহ্যিক জীবনের ঘটনাপঞ্জি আর অন্তর্লোকের গভীর প্রতিভার বিষয়টি এক নয়। তাই জীবনানন্দকে হতাশাময় নৈরাশ্যদীর্ণ কবি হিসেবে চিহ্নিত করার বিষয়টি অপব্যাখ্যা মাত্র।তবে, 'মৃত্যুর আগে' কবিতার যে-প্রাপ্য-বিশ্লেষণ তা অনেকের মতো তার আলোচনাতেও ধরা পড়ে নি।'ভাষা ও সঙ্গীত ধর্ম: 'মৃত্যুর আগে' আলোচনায় চঞ্চল আশরাফ আপাতভাবে ইন্দ্রিয় সক্রিয়তার কবিতা হিসেবে একে চিহ্নিত করেছেন। আবার সামষ্টিক অনুভবের কবিতাও বলতে চেয়েছেন। ইন্দ্রিয়ের স্তরবিন্যাসের মধ্য দিয়ে যে বিস্তার তা-ও তাঁর ব্যাখ্যা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় নি।

জীবনানন্দ দাশের 'মৃত্যুর আগে' আলো-ছায়াময় কুয়াশার কুহক' আলোচনায় মাসুদুল হক কবিতা কাহিনী 'মৃত্যুচিন্তা' উল্লেখ করে বলেছেন যে, কবিতাটিতে জন্মান্তরবাদ লক্ষণীয়। তো, প্রথমেই বলে নেয়া যায়, জীবনানন্দ-চেতনা মূলত নিরিশ্বরবাদী। মানে, নিরিশ্বরবাদী চেতনা সাপেক্ষে জন্মান্তরবাদের বিষয়টি নিশ্চয়ই গৌণ হয়ে যায়। তবে আমরা মাসুদুল হকের যৌক্তিক বিশ্লেষণ কি তা দেখে নিতে পারি। তিনি কবিতার শেষ দুটি পংক্তি তার যুক্তির সাপেক্ষে তুলে ধরেছেন।

কি বুঝিতে চাই আর? রৌদ্র নিভে গেলে পাখ-পাখালির ডাক
শুনিনি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়েছে গেছে কাক!

আমরা যদি এভাবে দেখি যে, 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় যে নির্যাস তা শেষ দু'টি পংক্তিতে বিস্তারলাভ করে। জীবনানন্দ এখানে জীবনের যে দর্শন-প্রজ্ঞা, জীবনের অর্থ-নিরর্থময়তা তা উপস্থাপন করেছেন। রৌদ্র নিভে যাওয়ার পর পাখ-পাখালির ডাক মূলত ইন্দ্রিয় সচেতনতার বিষয়, যেখানে নিহিত রয়েছে আবিষ্কার চেতনা। প্রান্তরের কুয়াশা মানে জীবনেরে প্রান্তিক ঘোরাচ্ছন্নময়তা। 'কাক' এর উপস্থাপন অবশ্যই প্রতীকী, তবে তা জন্মান্তরবাদের নয়, বরং জীবনেরই সদর্থময়তার, বিশালতার- যে জীবন অশেষ গভীর। জীবনানন্দের আস্তিকতা নাস্তিকতার বিষয়টি যতীন সরকার চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করছেন তাঁর আলোচনায়। যতীন বাবু যথার্থ বলেছেন যে, কবিতাটিকে জন্মান্তরবাদ চিহ্নিত করা স্থুলতামাত্র।জীবনানন্দের কবিতায় যে দ্বৈত-উপস্থাপনা তা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন মৃত্যু ও অসুখের পাশাপাশি জীবনের সঙ্গীতও সেখানে বর্ণিত হয়েছে।

জীবনানন্দ দাশের কবিতার যেকোনো আলোচনা জীবনানন্দ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গক্রমে, এও উল্লেখ করা প্রণিধানযোগ্য যে, আজকাল জীবনানন্দের কবিতা বিষয়ে যেসব যাচ্ছে তাই অসার সমালোচনা লেখা হচ্ছে, তা পাঠককে কমবেশি বিভ্রান্তও করছে। পাঠক নিঃসন্দেহে এসব

বিভ্রান্তি থেকে পরিত্রাণ চায়। জীবনানন্দের কবিতার বা তাঁর কথা সাহিত্যের প্রকৃত শুদ্ধ নির্মোহ আলোচনা জরুরি আজ এ কারণে যে, তাঁকে, তাঁর কবিতাকে নতুন করে দেখার অভিজ্ঞতা- বাংলা কবিতার ঐতিহ্য ও আবহকে আগামীর হাতে তুলে দেবার কাজ এ প্রজন্মের। আর তা যদি সারবস্তুহীন হয়, তাহলে তা হবে সকলের জন্য দুর্ভাগ্যজনক। আমরা পাঠকেরা তো এমন লেখার প্রত্যাশী, যা হবে আবিস্কারধর্মী; প্রকৃতপক্ষে, জীবনানন্দকে, তার কবিতাকে সূক্ষ্মভাবে দেখার ও সঠিক উপস্থাপনার প্রয়াস; নিছক লেখা মাত্র নয়।

জীবনানন্দ যখন কবি হিসেবে এত প্রভাবশালী বলে ধরা দেননি তখনো তার কাব্যধারার একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল তরুণ এবং নবীন লিখিয়েদের উপরে স্বীয় প্রভাব, যা আজও বর্তমান। জীবনানন্দের প্রভাব বাংলা সাহিত্যের পরবর্তীকালের অনেক বিখ্যাত কবি লেখকের উপর পড়েছিল। যাই হোক, ক্যাম্পে কবিতাটি জীবনানান্দিক বিপন্নতা নিয়ে পাঠকের সামনে প্রথম আসে পরিচয় পত্রিকায় ১৯৩২ সালে। পত্রিকাটির সম্পাদনায় ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। সুধীন দত্ত জীবনানন্দের লেখার আঙ্গিক তথা উপমার বাহুল্য এবং বিন্যাসের আঁটোসাঁটো বোধের অভাবের কারণে তার লেখার গুণগ্রাহী ছিলেন না। ক্ষেত্রবিশেষে তাকে কবি বলেও গণ্য করতেন না।তথাপি কবি বিষ্ণু দে'র চাপে বাধ্য হয়ে কবিতাটি পরিচয়ে প্রকাশিত হয় কেননা বিষ্ণু দে কবিতাটি জীবনবাবুর কাছ থেকে নিজে চেয়ে এনেছিলেন।প্রকাশের পরপরই কবিতাটি সমকালীন সমালোচক ও কবিসমাজের কাছে, জীবনানন্দের আরও কিছু মেটাফোরের নতুনত্বে সমুজ্জ্বল কবিতার মতই অস্পষ্ট এবং দুর্বোধ্য বলে পরিগণিত হয়েছে। কবিতাটি নিয়ে রূঢ় সমালোচনার মুখে পড়েন কবি। ধারণা করে নেয়া যায়, এর বেশির ভাগই কবিতার পাঠে কবিতাটি অস্পষ্ট এবং দুর্বোধ্য ঠেকার কারণেই। কবিতাটি নিবিড় পাঠে দেখা যাবে, কবিতাটি শুরু

হয়েছে যদিও বনে মৃগয়া গমনের পরে ক্যাম্প ফেলবার কথা থেকে, তথাপি ক্যাম্পে যাওয়া এবং শিকার এই কবিতার মূল বিষয় নয়।

ভীষণ অন্তর্মুখী এবং নিজের গন্ডির ভেতরে চিরকাল বসবাস করা জীবনবাবু অদ্যাবধি গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে কখনো শিকারে যাননি।এছাড়া শিকারির শিকার প্রসঙ্গে আরেকটি কবিতায় তাঁর অসমর্থন প্রকাশ পেয়েছে হরিণ কবিতাটিতে। এই কবিতাটিতে একটি অসমীয়া শব্দ ঘাই ব্যবহৃত হয়েছে টোপ অর্থে। শব্দটি যদি আমাদের ইঙ্গিত দেয় যে তিনি আসাম গিয়েছেন বা অসমীয়া ভাষী কারো সাথে মিশে থাকবেন, তবে বলতে হয় তিনি কখনোই আসাম যাননি। জীবনানন্দের ভাই অশোকানন্দের বিবৃতি হতে জানা যায়, তিনি মুনিরুদ্দি নামে একজনের সাথে কথা বলতেন প্রায়ই, যে ছিল কিনা একজন শিকারি।তার কাছে জীবনবাবু শিকার সম্বন্ধীয় অনেক কিছুই শুনতেন। ধরে নেয়া যেতে পারে এই লোকটির কাছ থেকেই তিনি অসমীয়া এ শব্দটি শুনেছেন।

যাই হোক ক্যাম্পে কবিতার প্রতিবেশ এবং চরিত্র চিত্রণে কবি যেন সুনিপুণ নাট্যকারের ভূমিকা নিয়েছেন। কবিতাটির মূল সুর আদৌ যে ক্যাম্প বা হরিণ শিকার নয় সেই বিষয়টি আমরা বুঝতে পারি কবিতার মধ্যভাগে। কবিতার সুরে ক্যাম্পে অবস্থানরত কথক (ধরে নেই ভ্রমণ উদ্দেশ্যে আগত, যেহেতু উল্লেখ নেই আগমনের কারণ) শুনতে পাচ্ছেন এক ঘাই হরিণীর ডাক

আকাশের চাঁদের আলোয়
এক ঘাইহরিণীর ডাকে শুনি –
কাহারে সে ডাকে!
কোথাও হরিণ আজ হতেছে শিকার;
বনের ভিতরে আজ শিকারীরা আসিয়াছে,
আমিও তাদের ঘ্রাণ পাই যেন

মন্তব্য

এই ঘাই হরিণী ডাকছে। কে কাকে ডাকছে ? প্রকৃতপক্ষে এই ঘাই হরিণীটি কি? এটা সবার জানা, ঘাই হরিণী বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে জ্যান্ত হরিণ, যাকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রখ্যাত জীবনানন্দ গবেষক ক্লিনটন বি সিলি A Poet Apart বইয়ে উল্লেখ করেন, এই ঘাই হরিণীর ব্যবহার জীবনানন্দের জীবনের এক অসফল অধ্যায়ের ইঙ্গিত দেয়, যেখানে প্রেমিকা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে অবজ্ঞা ভরে।এই বিষয়ে কোন পরিষ্কার ধারণা না পাওয়া গেলেও আমরা ধরে নিতে পারি শিকারের অর্ন্তদ্বন্দ্বমূলক একটা প্রতিবেশ তৈরির জন্য তিনি শিকারি, শিকার ও প্রলোভনের এক জটিল ফাঁদ পেতেছেন।

ঘাই হরিণীর মৃদু শব্দময় বিষন্ন আর্তনাদ ইঙ্গিত দেয় হরিণের অথবা চিতার আগমনের। একই সাথে যেহেতু ঘাই হরিণী শিকারের টোপ, সে আরো ইঙ্গিত দেয় শিকারির দল আছে হয়তোবা কাছে পিঠে বনের এই বিপন্ন আধারে।

কবি পরের অংশে বর্ণনা দেন চঞ্চল হরিণের দল কিভাবে প্রতারণার ফাঁদে পা দিচ্ছে-

আজ এই বিস্ময়ের রাতে

তাহাদের প্রেমের সময় আসিয়াছে;

তাহাদের হৃদয়ের বোন

বনের আড়াল থেকে তাহাদের ডাকিতেছে

জোছনায় –

পিপাসার সান্ত্বনায়—অঘ্রাণে—আস্বাদে!

কোথাও বাঘের পাড়া বনে আজ নাই আর যেন!

তাহাদের হৃদয়ের বোন অর্থাৎ ঘাই হরিণীর দল ডেকে যাচ্ছে শুধু ফালগুণের এই সোনালি রাতে ঘাই হরিণের দলকে। বাঘের দল এখন অনুপস্থিত। লক্ষণীয় শিকারের দুই প্রকরণ এখানে উপস্থিত, যার একদল অপরদলকে আহ্বান করছে বিনাশের কাছাকাছি। অপরদিকে শিকারি হিসেবে বাঘ

অনুপস্থিত। বাঘের অনুপস্থিতি আপাত নিশ্চয়তা দেয় হরিণের পাল কে, এখানে মৃত্যু বহুদূরে। কিন্তু শিকারি যদি ওত পেতে থাকে বাঘের অনুপস্থিতি কোন বড় বিষয় নয়। এখানে বাঘেরা অনুপস্থিত সম্ভবত স্বজাতির হাতে স্বজাতির ধ্বংসের এক মর্মান্তিক দৃশ্যের অবতারণার জন্য।

একে একে হরিণেরা আসিতেছে গভীর বনের পথ ছেড়ে,
সকল জলের শব্দ পিছে ফেলে অন্য এক আশ্বাসের খোঁজে
দাঁতের—নখের কথা ভুলে গিয়ে তাদের বোনের কাছে অই
সুন্দরী গাছের নীচে—জোছনায়!

বনপথ ছেড়ে ঘাইমৃগীর সাথে মৈথুনে লিপ্ত হতে আসা মৃগের দল জলের শব্দ পিছে ফেলে আসে সুন্দরী গাছের নীচে। কবিতাটি স্পষ্ট আমাদের নিয়ে যায় তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বিস্তৃত সুন্দরবন অঞ্চলে, যেখানে অসংখ্য খালে বিলে নদীতে ছেয়ে আছে বিপুলা বনাঞ্চল যার ক্রোড়ে খেলা করে অদ্ভুত এক শ্বাসমূলীয় উদ্ভিদ-সুন্দরী । কথক পদশব্দ পেতে থাকেন, চারিদিকে অসহ্য আওয়াজ, সে আওয়াজ মৃত্যুর! অন্ধকারে তবু কিছু আশা ছিল, কিছু কল্পনা ছিল, সকাল হতেই, ভোরের আলো ফুটতেই দেখা যায় ঘাইহরিণীর পাশে মৃত মৃগের সারি।

চাঁদের আলোয় ঘাইহরিণী আবার ডাকে
এইখানে পড়ে থেকে একা একা
আমার হৃদয়ে এক অবসাদ জমে ওঠে
বন্দুকের শব্দ শুনে শুনে
হরিণীর ডাক শুনে শুনে।
কাল মৃগী আসিবে ফিরিয়া;
সকালে—আলোয় তারে দেখা যাবে –
পাশে তার মৃত সব প্রেমিকেরা পড়ে আছে।

কথকের ভূমিকা পাঠকের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে দেখা দেয় এইবারে। পাতে আসা হরিণের মাংস তিনি আরাম করে খান, স্বাদ নেন ঝলসানো মাংসের। অথচ এর আগে মনে হয়েছিল তিনি ক্যাম্পে এসেছিলেন বিহারে। যেখানে তিনি শিকারির শিকারের নীরব দর্শক। প্রথমাংশে কবি তাকে উপস্থাপন করেছেন সহৃদয় এক ব্যক্তি হিসেবে যিনি হরিণের পালের প্রতারিত হবার দু:খে ব্যথিত। এই অংশ পাঠ করে নিশ্চিত হওয়া যায় না তিনি শিকারিদের সাথে ছিলেন কিনা, কিংবা নিজেই শিকারে মত্ত হয়েছেন কিনা।

আমার খাবার ডিশে হরিণের মাংসের ঘ্রাণ আমি পাব,

মাংস খাওয়া হল তবু শেষ?

কেন শেষ হবে?

কেন এই মৃগদের কথা ভেবে ব্যথা পেতে হবে

তাদের মতন নই আমিও কি?

কথক চরিত্রটি ধরে নেয়া যায় সময়ের একটা প্রতিভূ, যাকে নৈতিক অনৈতিক সব রকম কাজের শুধু দর্শক হতে হয়, দেখে যেতে হয় পরাজিত মানবতার বিপন্নতা, ক্রম অবক্ষয়। কবিতার বাঁক এখানেই বদলে যায় আশ্চর্য রূপে যখন কথক প্রশ্ন করেন তাদের মতন নই আমিও কি? কথক নিজেকেই প্রশ্ন করছে যে প্রশ্নের অসীম উত্তরের সবটুকুই তার জানা, কিন্তু মাঝে মাঝে অজানা হয়ে ধরা দেয়। চিতার চোখের ভয়, পৃথিবীর সব হিংসা ভোলা সাহসী মৃগশাবক ধরা দিতে চায়নি কি ঘাইহরিণীর মায়াজালে?

আমার হৃদয়—এক পুরুষহরিণ –

পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে

চিতার চোখের ভয়—চমকের কথা সব পিছে ফেলে রেখে

তোমারে কি চায় নাই ধরা দিতে?

এই পঙক্তিগুলোতেই ফুটে ওঠে না পাওয়ার বোধ, হারানো ক্ষতের যন্ত্রণা। যখন বুকের আরশিতে জমাট হয়ে থাকা রক্তধারার মত উৎসারিত প্রেম মিশে

যায় ধুলোয়, মৃত মৃগদের মতন। পরমুহূর্তেই কবির অন্তিম কৌতূহল আমাদের চিরন্তন মানবিক বোধটাকেই তুলে ধরে। নিজের বিনাশ মাঝে মাঝে তুচ্ছ মনে হয় যখন হৃদয়ের বোনের বেঁচে থাকাটা অনেক বড় অর্থ বহন করে।

আমার বুকের প্রেম ঐ মৃত মৃগদের মতো

যখন ধূলায় রক্তে মিশে গেছে

এই হরিণীর মতো তুমি বেঁচেছিল নাকি

জীবনের বিস্ময়ের রাতে

কোনো এক বসন্তের রাতে?

জীবনের বিস্ময় নিয়ে বেঁচে থাকা কোন প্রলোভন জাগানিয়া ঘাইহরিণীর মত এক সুররমণীর ভাবনা ভাবতে ভাবতে সময়ের অতলান্তে ডুব দেয় সমস্ত বনানী, নিঃস্পৃহ কথক, মৃত মৃগের দল, এমনকি দোনলা রাইফেলে যারা কিনে নেয় জীবন কেড়ে নেবার বিমূর্ততার ভীষণ অধিকার। কবিতা শেষ হয় আমাদের অন্তরের রক্তক্ষরণের শাশ্বত চিত্র তুলে ধরে। ক্যাম্পের বিছানায় রাত তার অন্য এক কথা বলে-

যাহাদের দোনলার মুখে আজ হরিণেরা মরে যায়

হরিণের মাংস হাড় স্বাদ তৃপ্তি নিয়ে এল যাহাদের ডিশে

তাহারাও তোমার মতন–

ক্যাম্পের বিছানায় শুয়ে থেকে শুকাতেছে তাদের ও হৃদয়

কথা ভেবে— কথা ভেবে— ভেবে।

জীবনবাবু একটি বিশেষ প্রেক্ষিতে কবিতাটি বিষয়ে কিছু মতামত রেখেছিলেন। সেখান থেকে কিছুটা উদ্ধৃত না করে পারছি না প্রসঙ্গক্রমেই-

'যদি কোন একমাত্র স্থির নিষ্কম্প সুর এই কবিতাটিতে থেকে থাকে তবে তা জীবনের-মানুষের-কীট-ফড়িঙের সবার জীবনেরই নি:সঙ্গতার সুর। সৃষ্টির হাতে আমরা ঢের নি:সহায়- ক্যাম্পে কবিতাটির ইঙ্গিত এই; এইমাত্র'।

মন্তব্য

যথার্থ অর্থেই কবিতার মূল সুর তাই। কবিতাটি আমাদের জানান দেয় আমাদের জীবনের যাবতীয় অজাচার, প্রেমের অস্ফুট প্রকাশ, বেদনার নানামাত্রিক দ্বন্দ্ব সব কিছুর শেষ কথা সার্বজনীনতা। যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের, কীটের, বন বেড়ালের সে জীবনের ছায়া মানবের মাঝেও বিদ্যমান। এ জীবনে হাসি কান্না আনন্দ বেদনার অন্তিমে আছে বিপন্ন বিস্ময়, অর্ন্তগত ক্ষয়ের সূত্র।

এই ব্যথা এই প্রেম সব দিকে রয়ে গেছে—

কোথাও ফড়িঙে—কীটে, মানুষের বুকের ভিতরে,

আমাদের সবের জীবনে।

বসন্তের জোছনায় অই মৃত মৃগদের মতো

আমরা সবাই।

কবিতাটি বিষয়গত ও আঙ্গিকগত উভয় দিকেই ১৯৩২ এর বাংলাদেশের সমাজ ও সময়ের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর ছিল। এরই ফলশ্রুতিতে কবিতাটি প্রকাশের পর থেকেই নানাবিধ সমালোচনার মুখোমুখি হয়। ত্রিশের দশকে নতুন কবি ও কবি যশোপ্রার্থীদের যম হিসেবে পরিচিত সজনীকান্ত দাশ ১৯৩১ এর সেপ্টেম্বর থেকে ২য় দফায় বের হওয়া শনিবারের চিঠিতে কবিতাটির সমালোচনা করে বিস্তর লেখেন। বস্তুত ঘাই হরিণী শব্দটার ব্যবহারে তার কাছে কবিতাটিকে ভীষণ অশ্লীল মনে হয় এবং তিনি ঘাই হরিণী শব্দটিকে যৌন প্রলোভন হিসেবে নেন। এর পরবর্তীতে হৃদয়ের বোন শব্দটি ব্যবহার নিয়েও তিনি কবিকে কটাক্ষ করেন।

“বনের যাবতীয় ঘাই-হরিণকে 'তাহাদের হৃদয়ের বোন' ঘাই-হরিণী অঘ্রাণ ও আস্বাদে'র দ্বারা তাহার পিপাসার সান্ত্বনা'র জন্য ডাকিতেছে। পিসতুতো, মাসতুতো ভাইবোনদের আমরা চিনি। হৃদতুতো বোনের সাক্ষাৎ এই প্রথম পাইলাম।...

মৃগীর মুখের রূপে হয়ত চিতারও বুকে জেগেছে বিস্ময়!

লালসা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-প্রেম-স্বপ্ন স্ফুট হয়ে উঠিতেছে সব দিকে

আজ এই বসন্তের রাতে

এইখানে আমার নকটার্ন-।

এতক্ষণ পরে বুঝিলাম কবিতার নাম ক্যাম্পে হইল কেন! যাহাই হউক নকটার্ন শব্দের পরে ড্যাশ মারিয়া কবি তাহার নৈশ রহস্যের সরস ইতিহাসটুকু চাপিয়া গিয়া আমাদিগকে নিরাশ করিয়াছেন। ..."

বাস্তবিক অর্থে কবিতার সমালোচনা করতে এসে সজনীকান্ত সকল ভব্যতা ও সাহিত্যিক শ্লীলতাকে অতিক্রম করে ইতর শ্রেণীর আক্ষরিক পাঠ দ্বারা কবিতাটির সমালোচনা করেন।ক্যাম্পে কবিতাটি তার মতে, পরিচয়ের অশ্লীলতা চর্চার চূড়ান্ত নমুনা।প্রকৃতপক্ষে সজনীকান্তের মত দ্বিতীয়শ্রেণীর নেতিবাচক সমালোচকের দ্বারা বাংলা কাব্য ধারার বাঁকবদলকারী এমন একটি কবিতার এমন রূঢ় সমালোচনা হবে এটা স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যায়। এ কবিতায় এমনকি সুন্দরী গাছের কথাকে উল্লেখ করে কবিকে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, কবির তন্ময়তায় না হয় গাছও সুন্দরী হইল! (তিনি সুন্দরবনের প্রধান বৃক্ষ সুন্দরী গাছের কথা জানতেন না)। এছাড়াও নিজের পত্রিকায় জীবনানন্দের নাম বিকৃত করে ছাপতেন, লিখতেন জীবানন্দ। জীবনানন্দকে কবি গণ্ডার বলে ডাকতেন। এছাড়াও তাকে বর্ণবাদমূলক বক্তব্য রাখতে দেখা গেছে প্রায়ই। তৎকালীন পূর্ববঙ্গের লেখক কবিদের লেখাকে তিনি তাচ্ছিল্য করতেন পূর্ববঙ্গীয় সাহিত্য বলে।তিনি ব্যঙ্গ করে লেখেন,

"এই সাহিত্যের স্পেন্সার হইতেছেন ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাস, ব্রাউন-কালীপ্রসন্ন ঘোষ, বিদ্যাসাগর এবং হুইটম্যান- শ্রী জীবানন্দ দাশগুপ্ত (লক্ষণীয় কবির নাম বিকৃতি); ইহার ম্যাথু আর্নল্ড ও ওয়াল্টার পেটার যথাক্রমে শ্রীমান বুদ্ধদেব বসু ও শ্রীমান অজিতকুমার দত্ত।"

যে রবিঠাকুর বুদ্ধদের বসুর কাছে লিখিত পত্রে জীবনানন্দের কবিতাকে চিত্ররূপময় বলে উল্লেখ করেছেন সেই কবিগুরুর কাছেও অগ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল ক্যাম্পে। যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সুধীন দত্তের কাছে বলেন, জীবনানন্দ দাশের কবিতায় কোন স্টাইল নেই, আছে পাঁচমিশালীভাব।প্রকৃতপক্ষে বাংলা কাব্যজগতে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন আর কোন কবি লেখকই তাদের আঙ্গিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেক রবীন্দ্রনাথের থেকে এত বেশি পৃথক ছিলেন না। সেই ক্ষেত্রে চিরকালীন রোম্যান্টিসিজম ও আধ্যাত্মবাদের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনানন্দ দাশের মানবের চিরন্তন বিপন্নতা এবং না পাওয়ার বোধে ন্যুজ স্যুরিয়ালিস্টিক কবিতাটি ভাল না লাগাটাই ছিল স্বাভাবিক।

বিরূপ সমালোচনায় অতিষ্ঠ হয়ে জীবনানন্দ প্রথম বারের মত তার কবিতার সমালোচনা বিষয়ে কলম ধরলেন। যদিও এই প্রতিক্রিয়াটি জীবনানন্দের স্বভাব সুলভ আচরণের কারণেই প্রকাশ পায়নি তার জীবদ্দশায়। পরবর্তীতে জীবনানন্দ অনুগ্রাহী কবি ভূমেন্দ্র গুহর কাছে লেখাটি ছিল। তিনি সেটি শতভিষা পত্রিকার ভাদ্র ১৩৮১ সংখ্যায় প্রকাশ করেন।

আমার ক্যাম্পে কবিতাটি সম্বন্ধে দু একটা কথা বলা দরকার বলে মনে করি। কবিতাটি যখন শেষ হয় তখন মনে হয়েছিল সহজ শব্দে-শাদা ভাষায় লিখেছি বটে, কিন্তু তবুও হয়তো অনেকে বুঝবে না। বাস্তবিকই 'ক্যাম্পে' কবিতাটির মানে অনেকের কাছে এতই দুর্বোধ্য রয়ে গেছে যে এ কবিতাটিকে তাঁরা নির্বিবাদে অশ্লীল বলে মনে করেছেন।

কিন্তু তবুও 'ক্যাম্পে' অশ্লীল নয়। যদি কোন একমাত্র স্থির নিষ্কম্প সুর এ কবিতাটিতে থেকে থাকে তবে তা জীবনের-মানুষের-কীট-ফড়িঙের সবার জীবনেরই নি:সহায়তার সুর। সৃষ্টির হাতে আমরা ঢের নি:সহায়- ক্যাম্পে কবিতাটির ইঙ্গিত এই; এইমাত্র। কবিতাটির এই সুর শিকারি, শিকার, হিংসা এবং প্রলোভনে ভুলিয়ে যে হিংসা সফল-পৃথিবীর এই সব ব্যবহারে বিরক্ত

তত নয়- বিষন্ন যতখানি; বিষন্ন নিরাশ্রয়। 'ক্যাম্পে' কবিতায় কবির মনে হ'য়েছে তবু যে স্থূল হরিণ শিকারিই শুধু প্রলোভনে ভুলিয়ে হিংসার আড়ম্বর জাঁকাচ্ছে না, সৃষ্টিই যেন তেমন এক শিকারি, আমাদের সকলের জীবন নিয়েই যেন তার সকল শিকার চলছে; প্রেম-প্রাণ-স্বপ্নের একটা ওলট পালট ধ্বংসের নিরবচ্ছিন্ন আয়োজন যেন সবদিকে: king Lear-এর 'As this to wanton toys are we to the gods, they kill us for their sport' এই আয়োজন।

বাংলা সাহিত্যে-অন্তত: কাব্যে এ সুর 'ক্যাম্পে' কবিতাটির এই পবিত্র কঠিন নিরাশ্রয়তার সুর: 'জ্যোৎস্নায় ওই মৃত মৃগদের মত আমরা সবাই'- এই সুর আগে এসেছে কিনা জানিনা। অন্তত: এ সুরের সঙ্গে চলতি বাঙালি পাঠক ও লেখক যে খুব কম পরিচিত তা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে। যে জিনিস অভ্যস্ত বুদ্ধি বিচার কল্পনাকে আঘাত করে-যা পরিচিত নয় তার অপরাধ ঢের। কিন্তু তবুও অশ্লীলতার দোষে 'ক্যাম্পে' কবিতাটি সবচেয়ে কম অপরাধী। ইংরেজি, জার্মান বা ফ্রেঞ্চ এ কবিতাটি অনুবাদ ক'রে যদি বিদেশী literary circle-এ পাঠানো হ'ত তাহলে এ কবিতাটির কি রকম সমালোচনা হ'ত ধারনা করতে পারা যায়; 'ক্যাম্পে' কবিতাটির যে সুরের কথা আমি ইতিপূর্বে বলেছি তাই নিয়ে বিশ্লেষণ চলত।

দু একটি prurient মন ছাড়া এ কবিতাটির ভিতর থেকেই নিজেদের প্রয়োজনীয় খোরাক খুঁজে বার করবার অবাধ শক্তি যাদের রয়েছে; এই তাদের একমাত্র শক্তি, এই prurience-র কাছে ক্যাম্পে অশ্লীল- আকাশের নক্ষত্রও শ্লীল নয়। শেলীর ''souls' 'sisters' পাশ্চাত্য কবি ও সমালোচক ও পাঠকদের গভীর আদরের expression কিন্তু হৃদয়ের বোন (এই expressionটির জন্য আমি শেলীর কাছে ঋণী)- এই শব্দ দুটি prurient অন্ত:করণকে শুধু বুঝতে দেয় যে সে কত prurient-তার ভিতরে অন্য কোন চেতনা জাগায় না। Muteykeh (একটি ঘোটকী) সম্বন্ধে Browning

বলেছেন, 'She was the child of his heart by day, the wife of his breast by night,' না জানি Browning সম্বন্ধে prurience কি বলত।

কিন্তু বাংলাদেশে সজনে গাছ ছাড়া যে আরো ঢের গাছ আছে-সুন্দরী গাছ বাংলার বিশাল সুন্দর-বন ছেয়ে রয়েছে যে সজনের কাছে তা অবিদিত থাকতে পারে- prurience এর কাছে প্রকৃত সমালোচকের অন্তরাত্মা যেমন চিরকালই অজ্ঞাত, অনাবিষ্কৃত।

বাংলাদেশের সব কবিই এই ১৯৩২ সালে কলেজীয় কবিতা যুদ্ধের naivete-র ভিতর রয়ে যায় নি। কিন্তু হায়, যদি তেমন হ'য়ে থাকতে পারা যেত। সহজ সরল বোধ নিয়ে সুগম পথে চিন্তালেশশূন্যতার অপরূপ উল্লাসে জীবন কত মজারই না হ'ত তাহ'লে।

বুদ্ধদেব বসু এই বিষয়টির (সজনীকান্তের ক্রমাগত সমালোচনা) অনিবার্য ফল হিসেবে জীবনানন্দের কলকাতা সিটি কলেজ থেকে চাকরি যাবার কথা লেখেন। এই বিষয় নিয়ে কলকাতার দেশ পত্রিকায় (১৯৬৮ সালে) তিনি একটি নাটিকা লেখেন যেখানে একজন লেখক এবং একজন অধ্যাপক আলোচনা করছেন জীবনানন্দের চাকরি যাবার কারণ নিয়ে, যার উত্তর লুকিয়ে আছে ঘাইহরিণীতে।তিনি আরো এক জায়গায় লেখেন, এ কথাটি এখন আর অপ্রকাশ্য নেই যে, পরিচয়ে প্রকাশের পরে ক্যাম্পে কবিতাটির সম্বন্ধে অশ্লীলতার নির্বোধ ও দুর্বোধ্য অভিযোগ এমনভাবে রাষ্ট্র হয়েছিল যে কলকাতার কোন এক কলেজের শুচিবায়ুগ্রস্ত অধ্যক্ষ তাঁকে অধ্যাপনা থেকে অপসারিত করে দেন।বুদ্ধদেব বসু যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন তা সম্পূর্ণ সঠিক নয়। কেননা কলকাতা সিটি কলেজ থেকে তিনি অপসারিত হন ১৯২৮ সালে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিস্থিতিতে, হিন্দু কলেজে সরস্বতী পূজা পালন নিয়ে সৃষ্ট ছাত্র আন্দোলন ও তার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক ছাটাইকে কেন্দ্র করে। উপরোক্ত ধারনার উৎস হিসেবে অচিন্ত্যকুমার বসুর সাথে সাক্ষাৎকারে

বুদ্ধদেব বসু বলেন, এটা এমন একটা ব্যাপার যা সাহিত্যমহলের সবাই জানেন যে কবিতায় কথিত অশ্লীলতার কারণে জীবনানন্দ চাকরি হারিয়েছিলেন।প্রকৃতপক্ষে ১৯২৮ সালে ঘটে যাওয়া চাকরি ছাটাই এর সাথে ক্যাম্পে কবিতার কোন যোগসূত্র নেই কেননা তা প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। বুদ্ধদেব বসুর এই ধারণা প্রসঙ্গে বলেছেন সিটি কলেজে জীবনবাবুর সহকর্মী ইংরেজি বিভাগের সরোজেন্দ্রনাথ রায়। সরস্বতী পূজার ঘটনা থেকে তিনি ছাটাই সম্পর্কিত বিতর্কটিকে আরো টেনে নিয়ে গিয়ে বলেন:

'মৈত্র মহাশয় অতি নীতিপরায়ন ও রুচিশীল বলে খ্যাত। তাঁর নীতিপরায়নতা সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে যার কিছু কিছু তিনি নিজেও জানতেন ও কৌতুক অনুভব করতেন। জীবনানন্দ বাবুর চাকুরী যাওয়া ও তাঁর নীতিপরায়নতাকে যুক্ত করে একটি কাহিনী রচিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। শুধু বুদ্ধদেব বসু একলা নন, আরো কেউ কেউ করেছেন।'

চাকরি ছাটাই এর ঘটনাটি 'ক্যাম্পে' কবিতার সাথে সংশ্লিষ্ট না হলেও এই কবিতাটি নিয়ে তৎকালে অব্যাহত সমালোচনায় বিরক্ত হয়েই হোক, কিংবা তৎকালীন লেখক সমাজের প্রতি অভিমানবশতই হোক, কিংবা নিজের সাহিত্য কীর্তির সামর্থ্য বিষয়ে সন্দিহান হয়েই হোক, ১৯৩৫ সালে বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং সমরসেন সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকাটি বের হবার আগে লেখা আর পত্রিকায় ছাপতে দেননি। এ সময়ে কল্লোল, প্রগতি বন্ধ হয়ে যায়। তবে আপন মনে নিভৃতে লিখে গেছেন এই নির্জনতার চাষী বিষাদ লিরিকের জন্মদাতা কবি জীবনানন্দ দাশ। সম্ভবত জীবনানন্দ এই সময়ের মধ্যেই নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে আজকে জীবনানন্দ দাশ শুদ্ধতম কবি বলে খ্যাত।

৬.২ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১- আধুনিক বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে কল্লোল যুগের কবি কে?

মন্তব্য

আধুনিক বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে কল্লোল যুগের কবি জীবনানন্দ দাশ।

২- আধুনিক বাংলা কাব্যের একমাত্র প্রবন্ধ গ্রন্থ কোনটি?

আধুনিক বাংলা কাব্যের একমাত্র প্রবন্ধ গ্রন্থ কবিতার কথা। ১৯৫৬ সাল।

৩- জীবনানন্দ দাশের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' কাব্যগ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয়?

জীবনানন্দ দাশের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয়।

৪- 'বনলতা সেন' কবিতাটির বিষয়বস্তু জীবনানন্দ দাশ কোথা থেকে নিয়েছেন?

'বনলতা সেন' কবিতাটির বিষয়বস্তু জীবনানন্দ দাশ এডগার এলান পো'র 'টু হেলেন' কবিতা থেকে নিয়েছেন।

৬.৩ অনুশীলনী প্রশ্ন

১- জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা ও তার প্রকাশ কাল এবং সংস্করণ এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর।

২- জীবনানন্দ দাশের কবিতার ছন্দ বিশিষ্ট সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৬.৪ গ্রন্থপঞ্জী

জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন,

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- দেবেশ কুমার আচার্য্য।

একক-৭ কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতা ও সুরিয়্যালিজম, আধুনিকতা ও রোমান্টিসিজম

বিন্যাস ক্রম

৭.১ ভূমিকা

৭.২ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

৭.৩ অনুশীলনী প্রশ্ন

৭.৪ গ্রন্থপঞ্জী

৭.১ ভূমিকা

পরাবাস্তবতা হচ্ছে এমন এক ধরনের বাস্তবতা যার সঙ্গে চাক্ষুষ বাস্তবতার কোন মিল নেই। ইংরেজীতে সুররিয়েলিজম (surrealism) বলা হয়। বস্তুত চেতনার মূল ভিত্তি হলো অযুক্তি ও অবচেতন। ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক ধারণা মিলানো যায় এখানে। মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের ভাবনা- মানুষ অবচেতন মনে অনেক কিছুই করে বা ভাবে। তিনি বলেন- এ ভাবনা চেতন মনের চেয়ে অবচেতন মনেরই বেশি। পরাবাস্তবতা হচ্ছে মানুষের চেতনটা যখন শিথিল হয় তখন মানব মনে অবচেতন প্রভাব ফেলে। এটি হচ্ছে- কবির প্রতীক ও চিত্রকল্পসমূহের মধ্যে যোগসূত্র। মূলত সুইজারল্যান্ড থেকে উঠে আসা 'ডাডাইজম' এর পরবর্তী আন্দোলন হচ্ছে 'সুররিয়েলিজম' বা 'পরাবাস্তবতা'। এখন আবার যা জাদুবাস্তবতা বলছেন অনেকে।

মার্ক আর্নেস্ট এর সংজ্ঞা আমরা তুলে ধরতে পারি। সুররিয়েলিজমকে তিনি বলেছেন- সুর রিয়ালিস্টের লক্ষ্য হচ্ছে- অবচেতনার বাস্তব চিত্র আঁকা নয় কিংবা অবচেতনার বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে কল্পনার আলাদা এলাকাও সৃষ্টি করাও নয়। এর লক্ষ্য হলো

চেতন ও অবচেতন মনের সঙ্গে বাইরের জগতের সব দৈহিক ও মনের বেড়া তুলে দেয়া।(... to create a super-reality in which real and unreal meditation and action, meet and mingle and dominate the whole life.)

ইতালিতে জন্মগ্রহণ করা ফ্রেঞ্চ আপোলিনিয়ার (১৮৮০-১৯১৮) 'সুররিয়েলিজম' শব্দটি উল্লেখ করেন। তাঁর লেখা কবিতায় আদি-সুররিয়েলিজম কাব্যের নিদর্শন রয়েছে। 'টাইরেসিয়াম-এর স্তন' নাটকে প্রথম সুররিয়েলিজম প্রয়োগ করেন তিনি। পরে তা ইংরেজী ও জার্মান সাহিত্যেও এ ধারা সম্প্রসারণ হয়। 'চাঁদের আলো' কবিতায় তিনি পরাবাস্তবতাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন এভাবে-

'ক্রোধীর ঠোঁটে শ্রবণসুখকর চাঁদ

আর রাতের লোভার্ত নগর ও উদ্যান

মৌমাছির মতো নক্ষত্রদের ভ্রম হয়

এই আলোকময় মধুতে আঙুরবাগান আহত

আকাশ থেকে ঝরছে মধুর মধু

চাঁদের রশ্মি যেন মধুর ঝিকিমিকি

...হাওয়ায় গোলাপে মিশছে মধুর চন্দ্রিমা।'

ফবিজম বা ইমপ্রেশনস্টি যারা তাঁরা সবসময় আলোছায়া নিয়ে খেলা খেলতেন। আলোছায়া নিয়ে খেলতে খেলতে তাঁরা এমন বলয়ের মধ্যে প্রবেশ করতেন যে বলয়ের সঠিক অর্থ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়তো। ইমপ্রেশনিস্টরা সবসময় রংকে প্রধান্য দিতেন। অর্থাৎ ছায়াবাজির খেলা খেলতে ইমপ্রেশনিস্টদের মতো আর কারো জুড়ি নেই।প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিভিন্ন জাতির দেশান্তরী একদল তরুণ জুরিখে 'ডাডাবাদ' আন্দোলন শুরু করেন। 'ডাডা' হলো ফরাসি শব্দ। এর অর্থ হলো 'কাঠের খেলনা

ঘোড়া'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প ও সাহিত্যের প্রচলিত সব রীতি, বিষয় ও ভাবনাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কষাঘাতে জর্জরিত করছেন ডাডাবাদীরা। বুর্জোয়া সমাজ ও সংস্কৃতির নির্লজ্জ নগ্নতার বিরুদ্ধে ডাডাবাদীরা যা কিছু সনাতন ও নিয়মানুগ সে সবকে তছনছ করে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির আত্মপ্রকাশ ও অবচেতন মনের যথার্থ উন্মোচনে বিশ্বাসী হন। শুধু তাই নয়, ডাডাবাদ ছিল ধ্বংসাত্মক; সবকিছুর বিরুদ্ধে। সুররিয়ালিজম, রিয়ালিজম ও ইমপ্রেশনিজম তথা সমস্ত পুরনো ধ্যান-ধারণা-রীতির বিরুদ্ধ। শুরুতে ডাডাবাদ ছিল এরকম-Dada was against everything (including Dada) and had been composed in unequal proportions of an understandable disgust with world conditions, boredom and the desire of individuals for self advertisement. তবে তাঁরা দাঁড়াতে চেয়েছে ফ্রয়েডীয় অবচেতন মনের তত্ত্বের ভিত্তিতে। ফ্রয়েড কথিত মানুষের মনের (Super-Ego) বিচার বুদ্ধি দিয়ে জীবনের সমস্যার সমাধান করে। আবার ফ্রয়েড বর্ণিত মানব মন (ID) হলো অবচেতন মানস, যা স্বত:স্ফূর্ত হলেও নানা অসঙ্গতিতে পূর্ণ। একে রূপায়িত করতে হলে কবিকে যুক্তি ও শৃংখলাযুক্ত একটা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়। যেহেতু মনের তিন চর্তুথাংশই অবচেতন, সুতরাং সুর রিয়ালিস্টরা চেতন এক চতুর্থাংশের বদলে অবচেতন তিন চতুর্থাংশ থেকে কবিতার উপাদান সন্ধানী হন। অর্থাৎ চেতন মনের খোলস ছেড়ে অবচেতন জগতের এলোমেলো ছবি ও কল্পনা করতে হয়। এ প্রক্রিয়াকে টমাস ডিলানের ভাষায় বলা যায় : One method the surrealists used in their poetry was to juxtapose words and images that had no rational relationship; and out of this they hoped to achieve a kind of subconscious or dream, poetry that would be timer to the real imaginative world of the mind, mostly submerged, than is the poetry of the conscious mind, which relies upon the rational and logical relationship of ideas, objects and images.

১৯২২ সালে ডাডাবাদী আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটলে আন্দ্রে ব্রেঁত ও আরাগঁ-এর নেতৃত্বে কয়েকজন ফরাসি লেখক ডাডাবাদ থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেন সুররিয়ালিজম বা পরাবাস্তববাদ। ডাডাবাদকে প্যারিসে আনেন ত্রিস্তান জারা। জারাকে বাদ দেবার পর বিশের দশকে ফরাসী সুররিয়ালিজমের সুনির্দিষ্ট রূপ দাঁড়ায় এরকম- Pure psychic automatism by means of which it is proposed to express, either verbally, in writing, or in any other ways, the real process of thought - in the absence of all control exercised by reason and outside all aesthetic or moral considerations.[1]

মূলত ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান থেকেই সুর রিয়ালিজম এর জন্ম। সুররিয়ালিজম শুধু চিত্রকলাতে নয়, শিল্পকলায় শিল্পীদের সামনে অবচেতন জগতের সমস্ত দ্বার খুলে দেয়। পরবাস্তববাদীদের মতে মানুষের চৈতন্য যখন শিথিল হয়, তখন মগ্ন চৈতন্য থেকে মানব মনের শিশু সুলভ মানসিকতা ও পশুসুলভ নগ্নতা মনের রাজ্যে প্রাধান্য পায়। যুক্তি থাকলেও আবেগ-ই পরাবস্তববাদী কবির প্রতীক ও চিত্রকল্পসমূহের যোগসূত্র। অনুষঙ্গ ও ইঙ্গিতের সাহায্যে তৈরী হয় সুররিয়ালিস্ট কবির আবহ। সালভাদর দালি, চিত্রশিল্পী পল ক্লে, পল এলুয়ার, ব্রেঁত, আরাগঁ এরা প্রত্যেকই সুররিয়ালিস্ট ছিলেন। ম্যাক্স আর্নেস্টের মতে, “সুর রিয়ালিস্টের লক্ষ্য অবচেতনার বাস্তব চিত্র আঁকা নয় কিংবা অবচেতনার বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে কল্পনার একটি পৃথক জগৎ সৃষ্টিও নয়। তাঁর লক্ষ্য হলো চেতন ও অবচেতন, অন্তর ও বহির্জগতের মধ্যে সমস্ত দৈহিক ও মানসিক বেড়া ভেঙে দেয়া:”

'...and to create a super-reality in which real and unreal meditation and action, meet and mingle and dominate the whole life. (Marks Arnest - Op. Cit. PP-237-38)

১৯১৭ খ্রি: কবি গীয়ম আপলোনীয়র 'Surrrealist’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন বাস্তবের সীমা অতিক্রম করার প্রয়াস বোঝাতে। “যুক্তির অনুশাসনের বাইরে মানুষের

মনে যে এক মগ্নচৈতন্যের অতিবাস্তব জগৎ আছে; সেখানে ডুব দিয়ে তার অতলস্পর্শী রহস্যকে উন্মোচন করাই সুররিয়ালিজমের কাজ।" সাহিত্যিক অভিধানে সুররিয়ালিজম এর যে সংজ্ঞা মেলে তা এ রকম :A movement in the 20th century literature and art which attempts to express and exhibit the workings of the sub-concious mind especially as manifested in dreams and uncontrolled by reason or any conscious prices, characterized by the incongruous and startling arrangement and presentation of subject matter. (Standard Literary Dictionary)

উপরোক্ত সংজ্ঞাটি ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলে, ডাডাবাদের ভিতরেই যে সুররিয়ালিজমের বীজ লুকিয়ে ছিল তা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সুররিয়ালিস্ট কবিরা জেগে জেগে দিবাস্বপ্ন দেখেন। অবচেতন মনে বিশেষ করে স্বপ্নে তাঁরা এমন এক জগতে চলে যান, যখন বাস্তব জীবনের যুক্তি পরম্পরা শিথিল হয়ে পড়ে। যখন তাঁরা ঘুমোন তখন প্রতীক এবং অদ্ভূত কল্পনার রাজ্যে চলে যান। চলে যান অতি বাস্তবে। মগ্নচৈতন্যের গভীরে। এ মগ্নচৈতন্য স্বভাবতই ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। হাবার্ট রীডের ভাষায়:

`The artist, whether poet or mystic or painter, does not seek a symbol for what is clear to the understanding and capable of discursive exposition: he realize that life, especially the mental life, exists on two planes, one definite and visible in outline and detail, the other-perhaps the greater part of life - submerged, vague, indeterminate. A human being drifts through time like iceberg, only partly floating above the level of the consciousness. It is the aim of the Surrealist, whether as painter or as poet, to try and realize some of the dimensions and characteristics of his submerged being,

and to do this he resorts to various kinds of symbolism. (Herbert Read, The Meanings of Art, P-233)

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বৌদ্ধগান ও দোহা, দীনেশচন্দ্র সেনের মৈমনসিংহ গীতিকা, বৈষäব পদাবলী, পুঁথি-পাঁচালী-সংস্কৃত পণ্ডিতদের দণ্ডী-কুন্তক রীতিনীতি থেকে পার হয়ে মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ভাষা ঋদ্ধ হবার পর হঠাৎ করেই যেন ইউরোপ থেকে আসা নতুন চিন্তা বাংলাভাষাকে পেয়ে বসে। রবীন্দ্রত্তোরকালে আচমকাই যেন ঘুরে গেল ভাবনার চাকা। বিশেষ করে কবিতায়। একদল কবি ইউরোপীয় মুগ্ধতায় ভুলতে বসলেন নিজেদের শিকড়-বাকর অন্যদল আঁকড়ে ধরে পড়ে রইলেন দণ্ডী-কুন্তক প্রাচীনতাকে। আর জীবনানন্দ দু'টোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রাচীন পুঁথি পালা, পাঁচালির বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটালেন ইউরোপ থেকে মাল-মশলা সংগ্রহ করে একেবারে খাঁটি বাংলার রূপ-রস-গন্ধ মিশিয়ে। নগর বিমুখ কবি যেন হারানো বাংলার প্রত্নসম্পদকেই চিত্রকল্পের বর্ণনায় ফিরিয়ে আনতে চাইলেন কবিতায়। স্বত:স্ফূর্ত আধুনিক থেকে উত্তর আধুনিকতায়। ভারতচন্দ্রের পরে বাংলা কাব্যে মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথই একমাত্র আধুনিক কবি। মধুসূদন দত্ত ও রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কাব্য নিয়ে যিনি রীতিমতো গবেষণা করেছেন তিনি জীবনানন্দ দাশ। তিনি শুধু আধুনিক নন, আজকের যে উত্তরআধুনিক কবিতার কথা আমরা বলছি তার বীজ বাংলা কবিতায় তিনিই প্রথম পুঁতে গেছেন। এমনকি আধুনিক এবং উত্তর কবিদের মধ্যে তিনিই অন্যতম। বিশ্ব কবিতায়ও তাঁর কবিতা এক উজ্জ্বল আসন দখল করে আছে। গটফন্সীড বেন-এর মতে, বিশ্ব কবিতার যদি তালিকা করা যায় তবে বড় বড় কবিদের কাছ থেকে সব শুদ্ধ পাঁচটি শ্রেষ্ঠ কবিতার আশা করা যায়। জীবনানন্দ সেখানে একাধারে উৎকীর্ণ করে গেছেন পঞ্চাশটি কবিতা; এমনকি তার চেয়েও বেশি। যা শেলী, কীটস তো দূরে থাক, রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে গেছে। যাইহোক, রবীন্দ্রনাথ এর যুগ থেকে বের হয়ে নতুন এক পথে পা বাড়াবার তাগিদ জীবনানন্দের ছিল এবং তা 'ঝরা পালক'-এর পর থেকে। 'ঝরা পালক'-এ যেমন দেখি রবীন্দ্র, নজরুল, সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল মজুমদারের ছাপ তেমনি তাঁর পরবর্তী কালের কাব্যগ্রন্থে

একান্ত নিজস্বতা, স্বকীয়তা ছাড়া আর কিছু দেখি না। তবে সেটা রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্য, ভাবাবেগকে অস্বীকার করে নয়, রীতিমতো গ্রহণ করেই। রবীন্দ্রনাথ থেকে বের হয়ে সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে কাব্যকে শেষ পর্যন্ত এক নতুন পথ দেখাতে তিনি পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে যদি আধুনিক কবি বলি তবে জীবনানন্দ হলেন আধুনিকদের অন্যতম এবং উত্তর আধুনিক কবিদের প্রথম উত্তরসূরি।আধুনিক বাংলা কবিতায় কবি বিষ্ণু দে তাঁর 'ঊর্বশী ও আর্টেমিস' কাব্যগ্রন্থে প্রথম সার্থক সুররিয়েলিজম বা পরাবাস্তবতার প্রয়োগ করেন। তবে পরাবাস্তবতার উপাদান সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন কবি জীবনানন্দ দাশ। তাঁর 'ঝরাপালক', 'বনলতা সেন', 'ধূসর পান্ডু লিপি' কাব্যগ্রন্থে পরাবাস্তবতার ব্যবহার অনেক বেশি। তাঁকে 'পরাবাস্তবতার কবি' বলা হয়ে থাকে। পরাবাস্তবতার সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়ে বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছেন এ বিষয়ে। কয়েকটি উদাহরণ দিই।

'জানতাম তোমার চোখে একদা জারুলের বন

ফেলেছে সম্পন্ন ছায়া, রাত্রির নদীর মতো শাড়ি

শরীরের চরে অন্ধকারে জাগিয়েছে অপরূপ'- (কোন এক পরিচিতাকে, শামসুর রাহমান)

'অনেক আকাশ' কবিতায় সৈয়দ আলী আহসান ধরা দিয়েছেন এভাবে-

'... সোনার ঘাসের পাতা ঘুমের মতো

অজস্র পাতার ফাঁকে হৃদয়ের নদী হয় চাঁদ নেমে ঘাসে'- (সংক্ষেপিত)

মান্নান সৈয়দ বলতেন- সুর রিয়েলিজমই হলো প্রকৃত বাস্তবতা। তিনিও কবিতায় সার্থক পরাবাস্তবতার প্রয়োগ করেছেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ '(১৯৬৭)। এখানে সুররিয়েলিজমের সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তিনি জীবনান্দ দাশ নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা লিখেছেন এবং গবেষণা করেছেন। আর এ কারণে জীবনানন্দ প্রভাব বিস্তার করেছে কবির মনে। কয়েকটি কবিতায়

পরাবাস্তবতার উদাহরণ-

১) ‘দেখেছি ঘাসের মেঝে ছিন্ন

লাল মুন্ডু নিয়ে খেলে বিনা অপব্যয়ে

সূর্য টেনে নিয়ে যাচ্ছে কালো রেলগাড়ি।’ (কবিতা, রাত্রপাত)

২) ‘জ্যোৎসনা হয় জল্লাদের ডিমের মতো জলহীন মুন্ডু

জোড়া-জোড়া চোখ

সাতটি আঙুলের ও একমুষ্টি হাত

রক্তকবরীর অন্ধকার

এবং একগুচ্ছ ভুল শিয়ালের সদ্যোমৃত যুবতীকে ঘিরে জ্বলজ্বলে চিৎকার’- (জ্যোৎসনা কবিতায়)

৩) ‘একেকটি দিন একেকটি সবুজভুক সিংহ’ কবিতায়-

‘পরিবর্তনের ছাদ বিড়ালের মতো

অন্যমনস্ক হওয়ার সুযোগে পা টিপে-টিপে এগোল

বরফের মানুষ নাজেহাল ছোটো-ছোটো নুড়ির আওয়াজ

যখন দর্জি কাপড় হয়ে গেল মাংসভুক চেষ্টায়’।

পরাবাস্তবতার কবি জীবনানন্দ দাশের কয়েকটি কবিতার কিছু চরণ তুলে ধরি। তিনি পাঞ্জাবির পকেটে চাঁদের উঁকি দেয়া দেখতে পান-

‘দেখি তাঁর চুলে রাত্রি থেমে আছে

চোখে সবুজ প্রিজমের ভেতর থেকে লাফিয়ে পড়ে ফড়িং

... বেরিয়ে আসছে সান্ধ্যবেলার সবগুলো তারা

দেখি তার পাঞ্জাবির ঢোল পকেটে উঁকি দিচ্ছে চাঁদ।'

'বনলতা সেন' কবিতাগ্রন্থের 'তুমি' কবিতায় জীবনানন্দ লিখেছেন-

'নক্ষত্রের চলাফেরা ইশারায় চারদিকে উজ্জ্বল আকাশ;

বাতাসে নীলাভ হয়ে আসে যেন প্রান্তরের ঘাস;

কাঁচপোকা ঘুমিয়েছে- গঙ্গাফড়িং সে-অ ঘুমে;

আম নিম হিজলের ব্যাপ্তিতে পড়ে আছ তুমি।

মাটির অনেক নিচে চলে গেছ? কিংবা দূর আকাশের পারে

তুমি আজ? কোন কথা ভাবছ আঁধারে?'

তাঁর অনেক কবিতায় পরাবাস্তবতার গন্ধ পাওয়া যায়। কবি যেন সাধারনের থেকে দূরে বহুদূরে সরে যেতে চান মাঝে মাঝে।

আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্য ছিলো প্রতীকধর্মিতা। আধুনিকতা থেকেই উত্তরআধুনিকতার জন্ম। আধুনিক কবিতার ভাষা, শব্দ, বিন্যাস প্রকরণ এমন এক জায়গায় অগ্রসর হচ্ছিল যে তা সাধারণ পাঠকের কাছে ক্রমেই দুর্বোধ্য মনে হচ্ছিল। জীবনানন্দ আধুনিকতাকে উপেক্ষা করে নয় বরং গ্রহণ করে ক্রমেই উন্নীত হচ্ছিলেন উত্তরআধুনিকতার দিকে। তিনি বাংলা কাব্যকে আধুনিক কবি পাউন্ড, এলিয়ট, ইয়েটসীয় পশ্চিমা আদলের বায়বীয় কাঠামোর শৃংখলমুক্ত করে বোদলেয়ারীয় নীতি ও বিবমিষা বিমুক্ত করে প্রতীকী রূপ বর্ণনায় ইতিহাস চেতনাকে ধারণ করে নিয়ে গেছেন বাংলার সূদর মাঠ, ঘাট, জনপদ, মানুষের হৃদয়ের গহীন গোপন কুঠুরিতে। আর এজন্যই তাঁর কবিতা কখনো মেকী হয়ে ওঠেনি ¬ পাশাপাশি আধুনিকতা থেকে ক্রমেই অগ্রসর হয়েছে উত্তরআধুনিকতায় - সুররিয়ালিজমে। প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক উত্তরআধুনিকতা কি? বা উত্তর আধুনিকতা অর্থে কি বোঝায়? উত্তরআধুনিকতার নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দাঁড় করানো কঠিন, এবং নেইও। তবে সাহিত্য বিচারে উত্তরআধুনিকতাকে যদি

একটি প্রসূতিধারা হিসেবে গ্রহণ করি যার এক প্রান্তে থাকবে একটিমাত্র চারিত্রলক্ষণ আর যতোই সে অগ্রসর হবে সামনের দিকে বা অন্যপ্রান্তমুখী ততই বাড়তে থাকবে লক্ষণ সংখ্যা ও নিবিড়তা। আধুনিক জীবনে মানুষ এক জটিল ধাঁধাঁয় বিপর্যস্ত। শাণিত শাপের মতো অন্ধকার মানুষের জীবনকে দিন দিন গ্রাস করছে। ফলে পৃথিবীর লোকসানী বাজারে মানুষ দিন দিন হয়ে উঠছে হাঙর। তার ভিতরের মানবীয় সত্তা তথা বিস্ময় বোধ আর থাকছে না। বিশ্বযুদ্ধের পর মানুষ শুধু অর্থনৈতিকভাবে রোগাক্রান্ত হয়নি তার ভিতরের সাবলীল প্রবাহিত ঝর্ণার মতো হৃদয় বসন্ত হলুদ পাতার মতো হয়েছে বিবর্ণ। নি:সঙ্গ নির্জন বনে সে এক প্রেমহীন মানব, সুষমাহীন মানুষ। জীবনের প্রবহমান অস্তিত্বের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখা যায় মানুষের জীবনের গভীরে সুন্দর চেতনা, ঐক্যবদ্ধ জীবনচেতন নেই আর। তার বদলে হিংস্রতা, লোভ ভয়ঙকর দানব থেকেও সে হয়ে উঠছে আরো বেশি ছন্দ,স্পন্দহীন হাঙর শরীর। প্রস্তর যুগ থেকে আধুনিক যুগ সেই সাথে বিশ্বযুদ্ধ এবং রেনেসাঁসের ফলে নিয়তই পরিবর্তিত হয়ে গেছে মানুষ। গ্রাম থেকে শহরে কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে মানুষ। আধুনিকতার ফলে শহর সভ্যতার দাঁত যতো উজ্জ্বল হয়েছে, ঝকমকে হয়েছে মানুষের জীবন ততোই হারিয়ে গেছে দিকনির্দেশনাহীন পথে। স্বভাব সৌন্দর্য থেকে চ্যুত মানুষ হারিয়ে ফেলেছে তাদের পূর্বপুরুষদের পরিতৃপ্ত বিবেক। জীবনের লিপ্ত অভিধান থেকে তারা সরে এসে এখন প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বিপরীত, সক্রিয় প্রতিনিধি। জীবনানন্দ সেই সব মানুষের, সময়ের সমগ্রতা ফিউচারইজম দৃষ্টিভঙ্গিতে নিপুণ রেখার টানে তুলে এনে নিবিড় নরমভাবে প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর কবিতায়। অনেকটা প্রতীকী ঢঙে। নিষ্ঠুর জীবনের সমগ্রতা, সময়কে যে এভাবে কবিতায় তুলে আনা যায় বা আধুনিক ও উত্তরআধুনিক বাংলা কবিতায় উত্তরণ ঘটানো সম্ভব তা ছিল প্রশ্নাতীত। অথচ তিনি সেই কাজটিই করেছেন ব্রাতীয় ভঙ্গিতে। তাঁর ‘বিড়াল’ কবিতায় আমরা যেমন জীবন-মরণের গল্প বিড়ালের ঘুরে ফেরার মধ্যে দিয়ে প্রতীকী বর্ণনায় দেখতে পাই ঠিক তেমনি ‘পথের কিনারে’ কবিতায় মানব জীবনের শেষ আকুতি তথা ইচ্ছা ভেসে ওঠে অত্যন্ত প্রখরভাবে। যেমন:

পথের কিনারে দেখলাম একটা বিড়াল পড়ে আছে,

আস্তে-আস্তে ছটফট ক'রে মরে যাচ্ছে;

কেন এই মৃত্যু?¬ বরং অল্প বয়সের এই প্রাণীটির?

একে ঘিরে কোনো জনতা নেই

খানিকটা কলরব নেই এর মৃত্যুকে আস্তে-আস্তে

ভালোবেসে তারিয়ে দেবার জন্য

বিড়ালটা তার শরীরের সমস্ত শাদা কালো রঙ দিয়ে

মুহূর্তের জন্য আমার মনের ভেতর চিন্তা হ'য়ে এলো

তার নির্জন অদ্ভূত শরীরের সমস্ত শাদা কালো রঙ নিয়ে

আমার কবিতার ভেতর এলো;

বললে, এর চেয়ে অসাধারণ দাবি কোনোদিন করবো না আমি আর।

সুররিয়ালিস্ট কবিরা যেমন রঙ, আলো ও ছায়া নিয়ে ছায়াবাজির খেলা খেলে থাকেন

জীবনানন্দও ঠিক তেমনি এ কবিতায় শাদা, কালো রঙকে তুলে এনেছেন কবিতায়।

একবার বেড়াল, একবার মানুষ তথা নিজে আবার বেড়াল। বাস্তব থেকে পরাবস্তব,

পরাবাস্তব থেকে বাস্তবে ফিরে এসে বিড়াল হয়ে প্রতিবাদ করে গেছেন পৃথিবীকে।

অথবা তাঁর অনুপম ত্রিবেদী কবিতার দিকে তাকালে আমার দেখতে পাই ইতিহাসের

মধ্য দিয়ে তিনি সময়ের কথা বলে গেছেন কত অবলীলায়। যেমন:

এখন শীতের রাতে অনুপম ত্রিবেদীর মুখ জেগে ওঠে।

যদিও সেই নেই আজ পৃথিবীর বড়ো গোল পেটের ভিতরে

সশরীরে; টেবিলের অন্ধকারে তবু এই শীতের স্তব্ধতা

এক পৃথিবীর মৃত জীবিতের ভিড়ে সেই স্মরণীয় মানুষের কথা

হৃদয়ে জাগায়ে যায়; টেবিলে বইয়ের স্তূপ দেখে মনে হয়

যদিও প্লেটোর থেকে রবি ফন্সয়েড নিজ নিজ চিন্তার বিষয়

পরিশেষ ক'রে দিয়ে শিশিরের বালাপোশে অপরূপ শীতে

এখন ঘুমায়ে আছে - তাহাদের ঘুম ভেঙে দিতে

নিজের কুলুপ এঁটে পৃথিবীতে - ওই পারে মৃত্যুর তালা

ত্রিবেদী কি খোলে নাই? তান্ত্রিক উপাসনা মিস্টিক ইহুদী কাবালা

ঈশার শবোথান - বোধিদ্রুমের জন্ম মরণের থেকে শুরু ক'রে

হেগেল ও মার্কস: তার ডান আর বাম কান ধ'রে

দুই দিকে টেনে নিয়ে যেতেছিলো; এমন সময়

দু' পকেটে হাত রেখে ভ্রূকুটিল চোখে নিরাময়

জ্ঞানের চেয়েও তার ভালো লেগে গেল মাটি মানুষের প্রেম

অথবা,

এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে,¬ জানি না সে এইখানে শুয়ে আছে কিনা।

অনেক হয়েছে শোয়া;¬ তারপর একদিন চ'লে গেছে কোন্ রূঢ় মেঘে।

অন্ধকার শেষ হ'লে যেই স্তর জেগে ওঠে আলোর আবেগে:

সরোজিনী চ'লে গেল অতদূর? সিঁড়ি ছাড়া ¬ পাখিদের মতো পাখা বিনা?

হয়তো বা মৃত্তিকার জ্যামিতিক ঢেউ আজ? জ্যামিতির

ভূত বলে : আমি তো জানি না।

জাফরান আলোকের বিশুষ্কতা সন্ধ্যার আকাশে আছে লেগে:

লুপ্ত বেড়ালের মতো; শূন্য চাতুরীর মূঢ় হাসি নিয়ে জেগে।

হাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল:

অথবা সে হাইড্র্যান্ট হয়তো বা গিয়েছিলো ফেঁসে।

এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে।

একটি মোটর কার গাড়লের মতো গেল কেশে

বাঙালীর আত্মিক অবক্ষয়কে তুলে ধরেছেন অপ্রচলিত শব্দের সঙ্গে কাব্যিক শব্দকে মিশিয়ে - তিনি ভঙ্গুর সমাজের গভীর থেকে নতুন মূল্যবোধ রচনার উপাদান খুঁজেছেন 'রাত্রি' কবিতায়। তাঁর অন্ধকার ভুবনের দ্বারা। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সাতটি তারার

তিমির কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা উত্তর আধুনিকতা তথা সুররিয়ালিজম এর চিহ্ন-লক্ষণ-বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। যেমন- 'হাঁস' কবিতা :

নয়টি হাঁস রোজ চোখ মেলে ভোরে
দেখা যায় জলপাই পল্লবের মতো স্নিগ্ধ জলে;
তিনবার তিনগুণে নয় হয় পৃথিবীর পথে;
এরা তবু নয়জন মায়াবীর মতো জাদুবলে।
সে নদীর জল খুব গভীর¬গভীর;
সেইখানে শাদা মেঘ¬লঘু মেঘ এসে
তিনমানে আরো নিচে ডুবে গিয়ে তবু
যেতে পারে নাকো কোনো সময়ের শেষে

নয়টি অমল হাঁস শিশু প্রাণের প্রতীক, যারা নারীর কোলে আশ্রিত। খই রঙা এ নয়টি অমল হাঁস যখন জীবন নদীর মধ্যে মায়াবীর মতো জাদুবলে পৃথিবীর পথে এসে ধরা দেয় তখন তারা পৃথিবীকেই চিনে নিতে চায়। সুকান্ত যেমন পৃথিবীকে শিশুর বাসযোগ্য করে যেতে চেয়েছেন তেমনি জীবনানন্দও একান্ত একাগ্রতায় বাসযোগ্য করে যেতে চেয়েছেন শিশুর পৃথিবীকে। যে পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সে পৃথিবীকে শিশুর জন্যে বাসযোগ্য করে যাওয়া যে আমাদেরও দায়িত্ব তা তিনি সহজ-সরল শব্দের রেখায় তুলে ধরেছেন। আরাগ যেমন অ ই ঈ উ বর্ণ আকৃতিতে কবিতা রচনা করেছেন তেমনি জীবনানন্দও সংখ্যাতত্ত্ব দিকটি বেছে নিয়েছেন। ফ্রয়েডের দ্বিতীয় সংখ্যা হলো পবিত্র - তা হলো নয়। তিন বার তিন গুণে যেমন নয়; তাই শিশুর প্রতীকী শুভ সংখ্যা। বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থের 'বিড়াল' কবিতায়ও তিনি এমনি জীবনকে নিয়ে ইমপ্রেশনিস্টদের মতো আলোছায়ার খেলা খেলেছেন। যেমন :

সারাদিন একটা বিড়ালের সঙ্গে ঘুরে ফিরে কেবলি আমার দেখা হয় :
গাছের ছায়ায়, রোদের ভিতরে, বাদামী পাতার ভিড়ে;
কোথাও কয়েক টুকরো মাছের কাঁটার সফলতার পর

তারপর শাদা মাটি কঙ্কালের ভিতর
নিজের হৃদয় নিয়ে মৌমাছির মতো নিমগ্ন হয়ে আছে দেখি;
কিন্তু তবুও তারপর কৃষäচূড়ার গায়ে নখ আঁচড়াচ্ছে,
একবার তাকে দেখা যায়,
একবার হারিয়ে যায় কোথায়।
হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান রঙের সূর্যের নরম শরীরে
শাদা থাবা বুলিয়ে বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে;
তারপর অন্ধকারকে ছোটো ছোটো বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে আনল সে
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিল।

এই বিড়াল কে? কবি নিজে নয় কি? বিড়ালকে এখানে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র। সারাদিন গাছের ছায়ায় রোদের মধ্যে যে বিড়াল খেলা করে সে কবির অন্তরাত্মা। গাছের ছায়ায় রোদের ভিতর যে বিড়াল মাছের কাঁটা খোঁজে সে কবি নিজে। কবি পৃথিবীর পথে এসে পৃথিবীর হারানো সব বিষয়-আশয় নিত্য খুঁজে ফিরেন। রৌদ্রগন্ধ গাছের নীচে বিড়ালের যে জীবনযুদ্ধ তা মানুষের চিরন্তন জীবনসংগ্রাম। আবার পৃথিবীর পথে এসে মানুষ যে সভ্যতা খুঁজে ফিরে সেই সভ্যতা সে নিজেই বিড়ালের মতো গাছের গায়ে নখ আঁচড়ে ভাঙে¬ধ্বংস করে। পাশাপাশি ‘নাবিক’ কবিতায় তিনি মানুষের ভুলের বুননে পৃথিবীর ইতিহাস যে ধ্বংস হয়ে গেছে, মানুষ দখলদারিত্বের ক্রোধে যে শুধু ভুল করেই চলেছে তারই বর্ণনা উঠে এসেছে অকপটভাবে।

জীবনানন্দের এ যে বিস্ময়কর কাব্যভাষা "ভাষার গঠনতন্ত্র ¬ ইন্দ্রজাল যা কাব্যভাষার সর্বাত্মক সার্থকতার একটি সূত্র। বোদলোয়ার এমন এক গদ্যাশ্রিত কাব্যভাষার কথা বলেছিলেন যাতে সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলা যাবে "...the lyrical stirring of the soul, the wave motions of dreaming, the shocks of conciousnes."জীবনানন্দের কাব্যভাষায় বোদলেয়ারীয় ভাষাসূত্রের এই তিনটি সূত্রই

আশ্চর্যজনকভাবে সফল হয়েছিল। তাঁর কবিতায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বহুরৈখিকতার মধ্য দিয়ে lyrical stirring of the soul অভ্রান্তভাবে শুনতে পাই। বহু বিতর্কিত মগ্ন¬মন্থর গতির অন্তরালে ক্রিয়াশীল wave motions of dreaming-কেই আমরা সহজে অনুধাবন করতে পারি। যে আধুনিকতার কথা আমরা বলি, আধুনিকতার বোধের উৎসমূলে যে নগর সভ্যতার shocks of conciousnes, জীবনানন্দের শেষের দিকের কাব্যে বিশেষ করে সাতটি তারার তিমির-এ ছত্রে ছত্রে বিন্যস্ত হয়েছে।জীবনানন্দ সারাজীবন সত্যকে অনুসন্ধান করেছেন ইতিহাস চেতনার মধ্যে, ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি জলরাশির মধ্য দিয়ে। সমাজ চেতনা এমনকি মগ্নচৈতন্যের গভীরতা দিয়ে। জীবনানন্দ বুঝতে পেরেছিলেন রোম্যান্টিসিজমের যুগ শেষ হচ্ছে ¬ আসছে রিয়ালিজম। রিয়ালিজম-এর মধ্য দিয়েই অনুসন্ধান করতে হবে চারপাশ, মানুষ, সভ্যতা, জীবন, জগৎ এমনকি পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়-আশয়। তাই তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকে দূরে সরে এসেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথের যুগ শেষ। এখন যা কিছু করতে হবে তা রিয়ালিজমের ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে প্রতীক্ষা বোধের উপলব্ধি দ্বারা সুররিয়ালিজম তথা অতিবাস্তবচেতনায়। তাঁর ‘হরিণেরা’, ‘অবশেষে’ কবিতা এর উজ্জ্বল উদাহরণ। যেমন :

স্বপ্নের ভিতরে বুঝি ¬ ফাল্গুনের জ্যোৎস্নার ভিতরে
দেখিলাম পলাশের বনে খেলা করে
হরিণেরা; রূপালি চাঁদের হাত শিশিরে পাতায়;
বাতাস ঝড়িতেছে ডানা ¬ মুক্তা ঝরে যায়
পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে ¬ বনে বনে ¬ হরিণের চোখে;
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর মুক্তোর আলোকে।
হিরের প্রদীপ জ্বেলে শেফালিকা বোস যেন হাসে
হিজল ডালের পিছে অগণন বনের আকাশে,¬
বিলুপ্ত ধূসর কোন পৃথিবীর শেফালিকা, আহা,
ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় হরিণেরা জানে শুধু তাহা।

বাতাস ঝড়িতেছে ডানা, হীরা ঝরে হরিণের চোখে¬
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর হীরার আলোকে।

এ কবিতায় গাছেরা একবার হরিণী হয় আবার বাঘিনী। হরিণেরা কবিতায় প্রতীকী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বাস্তব পৃথিবীর নয়। সুররিয়ালিজম অনুযায়ী এ হলো Fantasy । কিংবা 'যেইসব শেয়ালেরা' কবিতা । যেমন:

যেইসব শেয়ালেরা - জন্ম জন্ম শিকারের তরে
দিনের বিশ্রুত আলো নিভে গেলে পাহাড়ের বনের ভিতরে
নীরবে প্রবেশ করে, বার হয়, - চেয়ে দেখে বরফের রাশি
জ্যোৎস্নায় প'ড়ে আছে; উঠিতে পারিত যদি সহসা প্রকাশি
সেইসব হৃদযন্ত্র মানবের মতো আত্মায়:
তাহ'লে তাদের মনে যেই এক বিদীর্ণ বিস্ময়
জন্ম নিতো;- সহসা তোমাকে দেখে জীবনের পারে
আমারো নিরভিসন্ধি কেঁপে ওঠে স্নায়ুর আঁধারে।

এ কবিতার অবোধ্য হেঁয়ালি আবৃত করে আছে। রাত্রি পাহাড়, বন, জ্যোৎস্না এসব আমাদের মনকে এক কুয়াশার শরীরের মধ্যে নিয়ে যায় - নিয়ে যায় স্বপ্নালোকে। শেয়ালেরা এখানে হতমান পঙ্গু মানুষের প্রতীক। যাঁরা শিকারের খোঁজে নিশ্ছিদ্র তারার পথে মৃত জ্যোৎস্নার বীভৎসতায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইসব শেয়ালেরা যদি কোনদিন মানুষের জীবন পেত - মানুষের আত্নায় ফুটে উঠতে পারতো তাহলে তারাও মানুষের মতো প্রেমের আনন্দ উপভোগ করতে পারতো - সৌন্দর্য দেখতে পেতো - উপলব্ধি করতে পারতো। আমাদের পৃথিবীতে যেমন মানুষ আছে; মানুষের সাথে আরো অনেক জীবজন্তু আছে। মানুষের সাথে মানব অস্তিত্বের অবিরাম গতি ও ধাবমানতার পাশে রয়েছে এমন কিছু জীবজন্তু যাদের অস্তিত্বকে আমরা প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করতে বাধ্য হচ্ছি এবং করছি। আত্ম অতিক্রমণের জন্যে এইসব জীবজন্তুর একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। কারণ জীবজন্তু দেখতে দেখতে মানুষের সুপ্ত সত্তার জাগরণ ঘটে।

নানাধরনের জীবজন্তু ও ইতর শ্রেণীর প্রাণী দেখতে দেখতে যেমন মানুষের মধ্যে সুপ্ত সত্তায় বহুবিধ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তেমনি মানুষ কখনো আতঙ্কে কখনো প্রশ্নসঙ্কুল বোধে কখনোবা অজানা ভবিষ্যতের নানা সম্ভাবনাকে স্পষ্ট করতে নিজস্ব স্বরূপ উদ্ঘাটনে ব্রতী হয়। জীবনানন্দ দাশও ঠিক তেমনি জীবজন্তুদের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন আমি সত্তার বিভিন্ন মুদ্রা, বিভিন্ন সংকট, বিভিন্ন কারুকার্য। জীবজন্তুদের সাহায্য নিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে স্বপ্ন ও পরিভাষায় তিনি বাস্তব থেকে পরাবাস্তবে ও পরাবাস্তব থেকে বাস্তবে ফিরে এসেছেন। জীবজন্তুরা তাদের স্ব স্ব দেহ দিয়ে পৃথিবীর যে ঘ্রাণের পসরা সাজিয়ে রেখেছে এবং সেই ঘ্রাণ অনুভব করে জীবনানন্দ তা তুলে এনেছেন কবিতায়। যেমন 'আজকের এক মুহূর্ত'।

বাংলার পাড়াগাঁয়ে শীতের জ্যোৎস্না আমি কতবার দেখলাম
কত বালিকাকে নিয়ে বাঘ - জঙ্গলের অন্ধকারে;
কত বার হটেনটট - জুল দম্পতির প্রেমের কথাবার্তার ভিতর
আফ্রিকার সিংহকে লাফিয়ে পড়তে দেখলাম

যে ঘোড়ায় চ'ড়ে আমরা অতীত ঋষিদের সঙ্গে আকাশে নক্ষত্রে উড়ে যাব
সেইসব শাদা শাদা ঘোড়ার ভিড়
যেন কোন্ জ্যোৎস্নার নদীকে ঘিরে
নিস্তব্ধ হ'য়ে অপেক্ষা করছে কোথাও;
আমার হৃদয়ের ভিতর
সেই সুপক্ক রাত্রির গন্ধ পাই আমি।

হামিদের এ ঘোড়া পরিণত হয়ে মহিনের ঘোড়ায়। সে ঘোড়া নিয়ে এসেছে যুগ যুগান্ত পূর্বের প্রস্তর-যুগের স্মৃতি। স্বপ্নে যেন বাস্তব-ই কিম্ভূত হ'য়ে দেখা দেয়; কবিতাটি তদ্রুপ। পৃথিবীর কিমাকার ডায়নামোর উপর নিওলিথ ঘোড়া যেন কবির যৌবন কামনার প্রতীক। যে যৌবন কামনা ঘোড়ার মতো, আফ্রিকার সিংহের মতো তেজোদ্দীপ্ত ছিলো, আজ তা প্রস্তরীভূত ফসিলে মতো নিষ্প্রাণ হলেও এখনও ঘাসের লোভে চরে

পৃথিবীর পথে। কামনা নেই কিন্তু স্মৃতি এখনো অম্লান ¬ এখনো আকাঙক্ষা জাগায়। আবার 'জয়জয়ন্তী সূর্য' কবিতায় তিনি পল এলুয়ার ও লুই আরাগঁ-এর মতো সত্যের পূজারী হয়েছেন। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর উচ্চারণ সতত। সংগ্রাম দানবের বিরুদ্ধে যাবার ন্যায়শক্তি যেমন তেমিন আশায় প্রস্ফুট জীবনের আহ্বান। সাম্যবাদী কবিদের মতো তিনিও এ কবিতায় বিদ্রোহের বীজ পুঁতে দিয়ে আহ্বান করেছেন নতুন দিনের, নতুন সূর্যের। যেমন :

মহীয়ান কিছু এই শতাব্দীতে আছে, - আরো এসে যেতে পারে:

মহান সাগর গ্রাম নগর নিরুপম নদী ;-
যদিও কাহারো প্রাণে আজ রাতে স্বাভাবিক মানুষের মতো ঘুম নেই,
তবু এই দ্বীপ, দেশ, ভয়, অভিসন্ধানের অন্ধকারে ঘুরে
সসাগরা পৃথিবীর আজ এই মরণের কালিমাকে ক্ষমা করা যাবে;
অনুভব করা যাবে স্মরণের পথ ধ'রে চ'লে:
কাজ ক'রে ভুল হ'লে, রক্ত হ'লে মানুষের অপরাধ মামথের নয়
কত শত রূপান্তর ভেঙে জয়জয়ন্তীর সূর্য পেতে হলে।

কিংবা

জানো নাকো আজো কাঞ্চী বিদিশার মুখশ্রী মাছির মতো ঝরে;
সৌন্দর্য রাখিছে হাত অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে;
গভীর নীলাভতম ইচ্ছা চেষ্টা মানুষের - ইন্দ্রধনু ধরিবার ক্লান্ত আয়োজন
হেমন্তের কুয়াশায় ফুরাতেছে অল্পপ্রাণ দিনের মতন।

ধানের রসের গল্প পৃথিবীর - পৃথিবীর নরম অঘ্রাণ
পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী সেই - আর তার প্রেমিকের ম্লান
নি:সঙ্গ মুখের রূপ, বিশুষ্ক তৃণের মতো প্রাণ,
জানিবে না, কোনোদিন জানিবে না; কলরব ক'রে উড়ে যায়
শত স্নিগ্ধ সূর্য ওরা শাশ্বত সূর্যের তীব্রতায়।

এক কবিতায় কবি মানুষের যন্ত্রণাবিদ্ধ দু:খের কথা বলেছেন। আধুনিক জনযুদ্ধের উদ্দাম উচ্চাকাঙখার বিশ্লেষণ রয়েছে এ কবিতায়। 'সিন্ধুসারস' সম্ভ্রান্ত পুরনো কালের মানুষ। নীলাভতম, মাছির মত ঝরে হেমন্তের কুয়াশায় - এসব শব্দ - রং বা আবহই অধিবাস্তবাবাদী ধারণার সাথে সাযুজ্য। সিন্ধু সারস কবিতাটিতে পল গগ্যাঁর আঁকা ছবির কথা মনে পড়ে যায়। যে ছবিতে নীলাভ সমুদ্রতটে শুয়ে আছে জ্যামিতি আকৃতি পৃথিবীর আদিম নারী। সমুদ্র সেই আদিম প্রাণের প্রতীক।অন্যদিকে মানুষই যে যুগযুগান্তরের নিয়ন্তা তা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন 'নাবিক' কবিতায়। নজরুলের 'কাণ্ডারী' কবিতার মতো স্বপ্ন ও জাগরণের মগ্নচৈতন্যের লীলা জেগেছে এ কবিতায়। যেমন-

আশ্চর্য সোনার দিকে চেয়ে থাকে ; নিরন্তর দ্রুত উন্মীলনে
জীবাণুরা উড়ে যায় - চেয়ে দ্যাখে - কোনো এক বিস্ময়ের দেশে।
হে নাবিক, হে নাবিক, কোথায় তোমার যাত্রা সূর্যকে লক্ষ্য ক'রে শুধু?
বেবিলন, নিনেভে, মিশর, চীন, উরের আরশি থেকে ফেঁসে

প্রয়োজন র'য়ে গেছে - যত দিন স্ফটিক পাখনা মেলে বোলতার ভিড়
উড়ে যায় রাঙা রৌদ্রে; এরোপ্লেনের চেয়ে প্রমিতিতে নিটোল সারস
নীলিমাকে খুলে ফেলে যত দিন; ভুলের বুনুনি থেকে আপনাকে মানবহৃদয়:
উজ্জ্বল সময়-ঘড়ি¬নাবিক¬অনন্ত নীর অগ্রসর হয়।

শেষে একথা বলা যায় যে, জীবনানন্দের কবিতা বহু বর্ণাঢ্য প্রকৃতি ও পৃথিবীর রং, ঘ্রাণ, শব্দ ও স্পর্শের। তাঁর কবিতা কীটসের ইন্দ্রিয়ময়তায় পরিপূর্ণ। চিত্রকর পল গগ্যাঁর ছবির মতো। জীবনানন্দ দাশের কবিতার ছত্রে ছত্রে সাজানো নীল ও কমলা রঙ। যা সালভাদর দালির ছবির মধ্যেই একমাত্র বর্তমান।মূলত জীবনানন্দ দাশের কবিতায় সুররিয়ালিস্টিক শিল্পরীতির চূড়ান্ত প্রকাশ থাকলেও সেই শিল্পরীতির মূলে আছে কবির গভীর ও প্রখর বিস্ময়বোধ। এ বিস্ময়বোধের জন্যে কবি বার বার শান্তি খুঁজতে প্রবেশ করেছেন বোধের মগ্ন চৈতন্যের গভীরে, বাস্তব থেকে অতিবাস্তব বাস্তবে। 'অদ্ভুত আঁধার এক নামে চারিধারে' এ রকম একটা সময়ে আমরা অবস্থান

করছি। আমাদের চিন্তারাজ্য নানা টানাপোড়নে বিধ্বস্ত। ধাবমান সময়ের পিঠে চড়ে তবু কবিতাপ্রেমে আবিষ্ট বহুজন এ পথের মুসাফির। কবিতা কী, কবিতা কেমন হবে, কবিতার ভবিষ্যৎ-ইবা কী— এমন কতগুলো কী'র উত্তর খোঁজার ফাঁকে জীবনানন্দ দাশ স্মরণীয় হয়ে উঠেন।'কবিতার কথা' নামক প্রবন্ধে এ নিয়ে তিনি নানা উত্তর করেছেন। ‘বরং লেখনাকো একটি কবিতা’— এই চ্যালেঞ্জ প্রদানকারী বলছেন, 'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি; কবি— কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নবনব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে। সাহায্য করছে; কিন্তু সকলকে সাহায্য করতে পারে না; যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা রয়েছে তারাই সাহায্য প্রাপ্ত হয়; নানা রকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করবার অবসর পায়।'তিনি একই প্রবন্ধে আবারও এ কথা বলছেন, 'হতে পারে কবিতা জীবনের নানা রকম সমস্যার উদ্ঘাটন; কিন্তু উদ্ঘাটন দার্শনিকের মতো নয; যা উদ্ঘাটিত হল তা যে কোন জঠরের থেকেই হোক আসবে সৌন্দর্যের রূপে, আমার কল্পনাকে তৃপ্তি দেবে; যদি তা না দেয় তাহলে উদ্ঘাটিত সিদ্ধান্ত হয়তো পুরোনো চিন্তার নতুন আবৃত্তি, কিংবা হয়তো নতুন কোনো চিন্তাও (যা হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে), কিন্তু তবু তা কবিতা হল না, হল কেবলমাত্র মনোবীজরাশি। কিন্তু সেই উদ্ঘাটন-পুরোনোর ভিতরে সেই নতুন কিংবা সেই সজীব-নতুন যদি আমার কল্পনাকে তৃপ্ত করতে পারে, আমার সৌন্দর্যবোধকে আনন্দ দিতে পারে, তাহলে তার কবিতাগত মূল্য পাওয়া গেল; আরো নানা রকম মূল্য-যে সবের কথা আগে আমি বলেছি— তার থাকতে পারে, আমার জীবনের ভিতর তা আরো খানিকটা জ্ঞানবীজের মতো ছড়াতে পারে, আমার অনুভূতির পরিধি বাড়িয়ে দিতে পারে, আমার দৃষ্টি স্থূলতাকে উঁচু মঠের মতো যেন একটা মৌন সূক্ষ্মশীর্ষ আমোদের আস্বাদ দিতে পারে; এবং কল্পনার আভায় আলোকিত হয়ে এ সমস্ত জিনিস যত বিশাল ও গভীরভাবে সে নিয়ে আসবে কবিতার প্রাচীন প্রদীপ-ততই নক্ষত্রের নতুনতম কক্ষ-পরিবর্তনের স্বীকৃতি ও আবেগের মতো

জ্বলতে থাকবে।' —এ বিশ্বাসের মাত্রা জীবনানন্দকে আলাদা স্থান করে দিয়েছে কবিতার ইতিহাসে। এ কারণে আমাদের সময়েও আজ তাঁর মূল্য অনেক গভীরে প্রোথিত।

জীবনানন্দ দাশ অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়। তার মূল্যায়ন করতে গিয়ে সৈয়দ আলী আহসান বলছেন, 'বর্তমানে পৃথিবী হচ্ছে বিজ্ঞানের এবং পর্যাপ্ত সামগ্রীর। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি অসম্ভবের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়েছে যার মধ্যে আমরা ব্যতিব্যস্ত এবং দিক-ভ্রান্ত। সময়ের গতিবিধিও এখন হিসেব করা যাচ্ছে না— একটি অসম্ভব দ্রুততায় আমাদের বর্তমান সময় অতীতের অস্পষ্টতায় হারিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের পক্ষে কোনো বিশেষ সূত্রের মধ্যেই স্থিতিশীল হওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না। এ সময় যাঁরা কবিতা লিখছেন তাঁদের কবিতায় কোনো সুবিন্যস্ত বর্ণনা প্রস্তাবনা নেই, একটি অস্থির বিসংবাদের রেখাঙ্কন আছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বর্তমানকালের এই অস্থিরতার তত্ত্বকে তাঁর কবিতায় ব্যাখ্যা করেছেন। বিষ্ণু দের কবিতায় রূপকল্প, চরণবিন্যাস এবং কারুকর্মের মধ্যে যুগের অস্থিরতা প্রতিচিত্রিত হয়েছে। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ একটি বেদনাময় আত্মকেন্দ্রিকতায় আপন অস্তিত্বের চৈতন্যকে অনুভব করতে চেয়েছেন। তিনি পৃথিবীকে একটি একক অস্তিত্ব হিসেবে অনুভব করতে চেয়েছেন, যেখানে মানুষ, প্রকৃতি এবং প্রাণী একাকার হয়েছে। মানুষ শুধুমাত্র আপন সামাজিক, সাংসারিক এবং রাজনৈতিক সমস্যার মধ্যে উপস্থিত নয়, সে সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি এবং প্রাণীজগতের সঙ্গেও একটি বিশেষ আবহে একত্রিত রূপে উপস্থিত। আমরা আকাশ, মাটি, বৃষ্টি, নদী, পাথর, লতা, গাছের শাখা, স্থলচর প্রাণী এবং কলকণ্ঠের অনেক পাখি নিয়ে পৃথিবীতে বাস করি। এদের সঙ্গে অবশ্য আমাদের সংসার যাপন নয়, কিন্তু আমাদের অস্তিত্ব যাপনের মধ্যে এরা সর্ব মুহূর্ত উপস্থিত। তাই জীবনানন্দ দাশ মানুষকে প্রকৃতির বর্ণবৈচিত্র্যের মধ্যে এবং প্রাণীজগতের অবিস্থিতির মধ্যে নির্ণয় করতে চেয়েছেন। নির্ণয় করার উপায় হচ্ছে মানুষ হিসেবে আমাদের সকল অনুভূতিগুলোকে উৎকণ্ঠিত করা। এই অনুভূতিগুলো হচ্ছে দৃষ্টির অনুভূতি, ঘ্রাণের অনুভূতি, স্পর্শের অনুভূতি, স্বাদের অনুভূতি এবং শ্রবণের অনুভূতি। মানুষের সজীবতার প্রমাণ এই অনুভূতিগুলোর মধ্যে পাওয়া যায়। একমাত্র

ম্রিয়মাণ মুমূর্ষু ব্যক্তির কোনো অনুভূতি নেই। কবি হিসেবে জীবনানন্দ দাশ তাঁর কর্তব্য ভেবেছিলেন এই অনুভূতিগুলোকে সকল বর্ণনার মধ্যে প্রমাণিত করা।' এই বিবেচনা সহকারে জীবনানন্দ দাশকে অধ্যয়ন করে দেখি, — তিনি বাংলা কবিতার একেবারে স্বতন্ত্র বিভা। ঔজ্জ্বল্য ও লাবণ্যে অনন্য; শব্দগঠন, প্রয়োগ এবং বাক্যগঠনে স্বতন্ত্র অনন্য কবিতার শরীর তৈরীতে। তার 'মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে' দেখে কবি নিজেও প্রস্তর যুগ থেকে আধুনিক যুগের দিকে যাত্রা করেছিলেন। অথচ এ চিত্রকল্পের ভেতরই শাশ্বত হয়ে উঠেছিল 'নিওলিথ-স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে' যাওয়া অশেষ যুগের বাস্তবতা। 'ঘোড়া' কবিতার চিত্রকল্পগুলো কালচেতনায় উদ্ভাসিত বলে কবি সমকালের হয়েও মহাকালের বাণীবাহক হয়ে উঠেছিলেন। আর 'আকাশলীনা' কবিতায় স্বার্থপর প্রেমিকের আকর্ষণ থেকে কোনো এক 'সুরঞ্জনা'কে ফেরানোর তাগিদে যে সময়ের ছবি আঁকলেন, তা-ও 'নক্ষত্রের রূপালী আগুন ভরা রাতে'র।

'আকাশলীনা' কবিতায় যে কবিকে পাই, সে কবি ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বাধীন রুচির প্রতি প্রতিবন্ধক— যা আধুনিকসম্পন্ন মানুষের দীক্ষিত মন গ্রহণ করতে চায় না। কিন্তু ভিন্নার্থে চিন্তা করলে বিষয়টি ভিন্ন রকমের তাৎপর্যও বহন করে। 'সুরঞ্জনা' যদি সাধারণ কোনো এক সরলার ভূমিকায় কল্পনা করা যায়— যার সারল্যভরা মনে কোনো প্রবঞ্চনা ধরা পড়ে না, সে সরলার যে-কোনো ভুল পথে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত করার ব্রত নিজে গ্রহণ করেছেন। 'গোধূলী সন্ধির নৃত্য' আপাত জীবিকাজটিল জীবনের অভিজ্ঞান। এ কবিতারও চতুর্থ পঙিক্ততে 'হেমন্তের বিকেলের সূর্য গোল— রাঙ্গা' হয়ে ওঠার পর পরই একটি স্পেসসহ পঞ্চম পঙিক্ততে 'চুপ-চুপে ডুবে যায়— জ্যোৎস্নায়' ভিন্ন রকম স্বাদ এনে দেয়।কল্পনাবিলাসিতার জন্য কল্পনাবিলাসীদের বারণ করতে পারেন না। তবু যারা 'টের পায় কামানের স্থবির গর্জনে/বিনষ্ট হতেছে সাংহাই' তারা নিশ্চয় মেনে নেবেন, জীবনানন্দ দাশকে কোনোভাবেই রাজনীতিবিমুখ কবি বলা যায় না। জীবনানন্দ দাশ নির্জনতাপ্রিয় কবি সত্য; কিন্তু বিশ্বচরাচরের বিভিন্ন ঘটনা ও দুর্ঘটনা তাকে ভাবিত করেনি— এ কথা সত্য নয়। অন্তর্মুখীন হওয়ার কারণে উচ্চকণ্ঠে

চেঁচামেচিতে তার অনীহা ছিল ‘রূপার ডিমের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ দেখা’র মতো। দূর থেকে দেখেছেন যা কিছু পৃথিবীতে অকল্যাণ ডেকে আনে। যুদ্ধের ভয়াবহতা দূর থেকে অনুভব করেছেন, প্রতিকারের কোনো ব্যর্থতম চেষ্টা করেননি; কিন্তু রাজনীতিবিদ, সমাজবিদদের প্রেরণা যুগিয়েছেন তীব্র প্রতিবাদের। সময়ের অগ্রগামী ছিলেন বলে তাৎক্ষণিক তার কাব্যভাষা সমকালের যুগমানস উপলব্ধি করতে পারেনি। এ ‘গোধূলী সন্ধির নৃত্য’ একটি খণ্ড কবিতা হয়েও হয়ে উঠেছে সমকালের যুগসন্ধিক্ষণের যোগসূত্র।আবেগের তারল্যে ভেসে গেলে এ কবিতটিও ‘বনলতা সেন’-এর মতো পাঠকপ্রিয় হতে পারত। কিন্তু ‘বনলতা সেন’ কবিতাটি যে অর্থে ইতিহাস-আশ্রিত ভৌগোলিক সীমা ও অসীমের সঞ্চয়, সে অর্থে ‘গোধূলী সন্ধির নৃত্য’কে অভিব্যঞ্জিত করা যায় না। দু’টি কবিতার প্রেক্ষাপট ভিন্ন, অনুভব ভিন্ন। ভিন্ন দু’টি কবিতার অবয়ব ও কালচেতনাও।চিত্রকল্প নির্মাণে ‘বনলতা সেন’ স্বতন্ত্র। উল্লিখিত কবিতা দু’টিতে এমন চিত্রকল্প ঝলসে উঠতে দেখা যায় না। ‘পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন’-এর মতো উপমা-আশ্রিত এমন অমোঘ চিত্রকল্প উল্লিখিত কবিতা দু’টিতে কোথায়? কোথায় এমন ভারমুক্ত আশ্রয়? ‘পাখির নীড়ের’ সঙ্গে তুলনীয় আশ্রয় কেবল নাতিশীতোষ্ণ বাংলায়ই সম্ভব। আমেরিকা কিংবা ইংল্যান্ডে কল্পনারও অতীত। তাই ‘বনলতা সেন’ কবিতার সঙ্গে যতই অ্যাডগার অ্যালান পো’র কিংবা ইয়েটসের কবিতার মিল দেখানো হোক, ‘বনলতা সেন’ স্বতন্ত্র শিল্পই।

জীবনানন্দ স্বভাবের সপক্ষে একটি জটিল সারল্যের কবিতা ‘বোধ’। সহজ-সরল বাক্যবন্ধের সম্মিলনে রচিত এ কবিতা। আপাত সরল বাক্যাবলীর মাধ্যমেই জটিল চিন্তা ঘনীভূত হয়ে উঠেছে; ধীরে ধীরে। ক্রমেই জটিলতম চিন্তার দুর্গম অঞ্চলে পরিণতি পেয়েছে। ব্যক্তি-বিশেষের স্ববিরোধ শিল্পের অঞ্চলে এক অনির্বচনীয় ঢেউয়ের নাম ‘বোধ’। ‘আলো-অন্ধকারে যাই-মাথার ভিতরে/স্বপ্ন নয়-কোন এক বোধ কাজ করে’, কিন্তু সে বোধ কী? সে প্রশ্নের উত্তর মেলে না।

অথচ দুর্বোধ্য সে অনুভূতিপুঞ্জকেই যেন গভীর মমতায় প্রকাশ্য করে তুলতে

চেয়েছিলেন। না পেরেই কি একা হয়ে গেলেন? 'সকল লোকের মাঝে বসে/আমার নিজের মুদ্রাদোষে/আমি একা হতেছি আলাদা?/আমার চোখে শুধু ধাঁধা? আমার পথেই শুধু বাধা?' উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এ বৈশিষ্ট্যই জীবনানন্দ দাশকে রোমান্টিক এবং সমকালীন আধুনিক কবিদের থেকেও ভিন্ন ও বিশিষ্ট এবং বিশ্লিষ্ট করেছে। এটিই তার মহোত্তম আধুনিক কবিসত্তার শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ। মানুষের প্রতি ভালোবাসা, ঘৃণা, অবহেলা— সবই একজন মানুষের মনে কী করে একীভূত হয়ে এক অব্যক্ত বেদনারাশির জন্ম দেয়, তা-ই যেন এ কবিতার মূল বিষয়ে পরিণত।

এটি আধুনিকতাবাদের নৈরাশ্য ও নিঃসঙ্গচেতনা কিংবা বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং অলৌকিকতায় আস্থাহীনতার বৈশিষ্ট্যকে নিশ্চিতির রূপ দেয়। আপন চিত্তের চাঞ্চল্যের কার্যকারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ কবি। বিস্ময় প্রকাশের ভাষা তার, 'সে কেন জলের মত ঘুরে ঘুরে একা একা কথা কয়!' তারপরই বিস্ময়াভিভূত আপন হৃদয়ের কাছেই প্রশ্ন জমা রাখেন, 'অবসাদ নাই তার? নাই তার শান্তির সময়?' অসুখী মানুষ, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতকে সহ্য করেও শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকার আঁকুতিই প্রকাশ করে। সাঁর্ত্রে কথিত অস্তিত্ববাদী চেতনার এ আরেক বিরল দৃষ্টান্ত। 'গোধূলী সন্ধির নৃত্য'র সঙ্গে 'বোধ' কবিতার অন্তর্গত মিলের চেয়ে অমিলই যেন বেশি। যে অর্থে 'গোধূলী সন্ধির নৃত্য' রাজনীতি সচেতন কবিতা, সে অর্থে 'বোধ' নয়। প্রথমটিতে ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির যোগাযোগকে পূর্ণ করে তোলা হয়েছে, দ্বিতীয়টিতে ব্যক্তির একাকিত্ব, হাহাকারকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন মানবমনে।

'অবসরের গান' কবিতার শুরুতেই ইন্দ্রিয়ঘন উপমা-আশ্রিত চিত্রকল্পে বিস্ময় জাগে। 'শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে/অলস গেঁয়োর মত এই খানে কার্তিকের ক্ষেতে;/মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার,—চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ' পুরো তিন পংক্তি জুড়েই একটি চিত্রকল্প উজ্জ্বল হয়ে আছে। স্বাদের অবাস্তব রূপের সঙ্গে বাস্তব জগতের সম্মিলন। অলীক উপলব্ধির সংশ্লেষ ঘটানোর অভিনব কৌশলও। যার নাম হয়তো প্রকারান্তরে পরাবাস্তবও হতে পারে। কিন্তু এখানে পরাবাস্তবতা খুঁজে

পেতে গেলে বাস্তবতারও সংশ্লেষ ঘটাতে হয়। কার্তিকের মাঠে মাঠে ফসলের উৎসব। কৃষকের মনে আনন্দের হিল্লোল। এতসব আনন্দের ভেতর অলস সময় কাটানোর মতো অফুরন্ত সময় পাড়াগাঁর মানুষের থাকে না। নতুনকে আহ্বান করা ও বরণ করার ভেতরই উচ্ছ্বাসপূর্ণ হয় না। পরবর্তীকালের জন্য সঞ্চয়ও মানুষের চিন্তাবর্গের অনেকটা অঞ্চলজুড়ে জায়গা করে রাখে। তাই 'পুরোনো পেঁচারা সব কোটরের থেকে' যখন বের হয়ে আসে অন্ধকারে তখন 'ইঁদুরেরা চলে গেছে'। খাদ্যচক্রের প্রসঙ্গনির্ভর এ চিত্রকল্পের প্রাণীজগতের অনিবার্য সত্য চিত্রায়িত। আবার এ দৃশ্য ইয়েটসকে মনে করিয়ে দেয়। ইয়েটসেও কেবল ইঁদুর আর পেঁচার আনাগোনা। কিন্তু ইয়েটসের কবিতায় যে অর্থে প্যাস্টোরাল কবিতার গন্ধ খুঁজে পান সমালোচকরা, সে অর্থে জীবনানন্দ দাশের কবিতায় কোনো গ্রাম্যতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। অথচ দু'জনই গ্রামের দৃশ্য এঁকেছেন।এ কথা সত্য যে, শিল্প পুরোপুরি সমাজ-বিমুখ নয় কিন্তু তার নিজস্ব একটি গতিধারা আছে— নিজের যুক্তিতে সে অগ্রসর হয় এবং শ্রুতিতে যে ধ্বনি সে ধারণ করে তা তার নিভৃত লোকের কণ্ঠস্বর, পৃথিবীর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ কলরোল নয়। এভাবেই জীবনানন্দ দাশ এক পৃথিবী নির্মাণ করেছেন যা একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব-জনসাধারণের নয়। জার্মান কবি রিল্কে এক তরুণ কবিকে উপদেশ দিয়েছিলেন— 'তুমি তোমার মধ্যে আত্মগোপন কর এবং যে-উৎস থেকে তোমার জীবন জেগেছে তার গভীরতা জানবার চেষ্টা কর। শিল্পী তার নিজের জন্য এক ভূখণ্ড নির্মাণ করবেন এবং আপনার মধ্যে এবং প্রকৃতির মধ্যে সকল বিস্ময়ের সন্ধান করবেন। তুমি তোমার নির্জনতাকে ভালবাসবে এবং নির্জনতার কারণে যে বেদনা সে-বেদনার নির্মম দাহনকে সহ্য করবে।' এমন পথের পথিক জীবনানন্দ রূপের রাজ্যে অবসরপ্রিয় মানুষের চোখ দেখেন 'আকাশের মেঠোপথে থেমে ভেসে চলে চাঁদ'। কারণ 'সকল পড়ন্ত রোদ চারিদিকে ছুটি পেয়ে জমিতেছে এইখানে এসে'। শীতের শেষে বসন্ত, বসন্ত শেষ না হতেই গ্রীষ্মের আলস্য মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। অনেকটা 'গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে' ধরনের বার্তাও শোনা যায়।

'মৃত্যুর আগে' কবিতায় চিত্রকল্পের বিপুল সমাহারে বিস্ময় জাগে। 'আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষ সন্ধ্যায়' বলে সময়নির্ভর চিত্রকল্পের আশ্রয়ে কবিতার শুরু। যেখানে চাঁদ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কেবল, সেখানে জোনাকিরা অন্ধকার দূর করে দেয়। এমন শীতে 'মুগ্ধরাতে ডানার সঞ্চার' শুনেও পুরনো পেঁচার ঘ্রাণের সন্ধান করে সুলুকসন্ধানী মন। অপরূপ শীতের রাতে অশথের ডালে ডালে বক ডেকে ওঠে। 'বুনো হাঁস শিকারীর গুলির আঘাত' এড়িয়ে দূরে চলে গেলে 'সন্ধ্যার কাকের মত আকাঙ্ক্ষা' নিয়ে নিত্যদৃশ্যে অভ্যস্ত হয় সংসারী মানুষ। সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হলুদ হয়ে এলে 'মিনারের মত মেঘ সোনালী চিলেরে তার জানালায় ডাকে' চিত্রকল্পে জীবনানন্দ দাশের স্বতঃসিদ্ধ অভিপ্রায় হলেও এর ভেতরই মৃত্যুর করুণ দৃশ্যও উঁকি দেয়। তাই 'সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মত এসে জাগে/ধূসর মৃত্যুর মুখ' তখন মৃত্যুর আগে আরও একবার বেঁচে থাকার আকুতি জানানোর আকাঙ্ক্ষাও জাগে।

'আটবছর আগের একদিন' একটি রহস্যময় কবিতা। রহস্যটা—বোধের দিক থেকে, না কি প্রকাশের দিক থেকে? যাপিত জীবনের প্রতি ব্যক্তির বিবমিষা জন্মে, তাই কোনো কার্যকারণ সম্পর্কে পারম্পর্য রক্ষা না করেই স্বেচ্ছামৃত্যুকে শ্রেয় জ্ঞান করে কবিতার নায়ক। বিচ্ছিন্নতাবোধ, নৈরাশ্যই তাকে জীবনের সমস্ত প্রাচুর্য উপেক্ষা করে আত্মহননের দিকে প্ররোচিত করে— যে রকম ঘুম একজন মানুষের কাম্য হতে পারে না, সে ঘুমই তার জোটে। তার মনে হয়, জেগে থাকাই যেন গাঢ় বেদনা ভরা। সে বেদনার ভার তাকে আর সহ্য করতে হবে না। শেষোক্তি শোনায় 'চাঁদ ডুবে চলে গেলে-অদ্ভুত আঁধারে/যেন তার জানালার ধারে/উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে।' শেষ পংক্তির উপমা-আশ্রিত চিত্রকল্পে ফুটে ওঠে একটি বিশেষ বিষণ্ন সময়ের ভয়াবহ চিত্র। যাপিত জীবনের ক্লেদজ অভিজ্ঞতার ভিড়ে হাঁপিয়ে ওঠা মানুষের কাছে লাশ কাটা ঘরের স্পন্দনহীন হিম ঘুমই শ্রেয় মনে হয়। আবার 'রাত্রি' কবিতায় 'হাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল' বলে যে বিশেষ মুহূর্ত ও মানসিক অবস্থার বিবরণ পেশ করা হয়েছে, তার শেষ টেনেছেন 'নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়/লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।/তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক/বস্তুত

কাপড় পরে লজ্জাবত' দিয়ে। নগরের ক্লেদজ ও মমতাহীন যাপিত জীবনের নির্মম বহুরৈখিকতায় ঋদ্ধ এ চিত্র।

জীবনানন্দ দাশে রূপকধর্মী চিত্রকল্প তেমন স্পষ্ট নয়। প্রতীকধর্মীও নয়। সর্বত্রই উপমাশ্রয়ী চিত্রকল্পের প্রাচুর্য। 'হায় চিল' থেকে শুরু করে 'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুচ্ছ। 'হায় চিল' কবিতার 'তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে' পংক্তিও মানবমনের জটিল ঘূর্ণাবর্তের তীরে দাঁড়িয়ে উচ্চারিত সত্যের নাম। 'ক্যাম্পে' নামক সে জটিল চিন্তাশ্রয়ী কবিতা, সেখানেও উপমাশ্রয়ী চিত্রকল্প। 'মৃত পশুদের মত আমাদের মাংস লয়ে আমরাও পড়ে থাকি' পংক্তিও উপমাকে আশ্রয় করে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা চিত্রকল্প। 'শ্যামলী' কবিতায় সমকালের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে চিরকালীন দিগ্বলয় স্পষ্ট। জীবনানন্দ দাশের কাব্যবিশ্বে উপমা, উৎপ্রেক্ষার প্রাচুর্য যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে চিত্রকল্পের অমোঘ স্বাক্ষরও। এ কথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, 'নক্ষত্রের রূপালী আগুন ভরা রাত'— এ পরিপূর্ণ জীবনানন্দ দাশের কাব্যবিশ্ব।

ইংরেজ কবি শেলী ছিলেন চিত্রকল্প সৃষ্টিতে অনন্য। জীবনানন্দের চিত্রকল্প গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদির সমন্বয়ে নির্মিত। চিত্রকল্পের সঙ্গে থাকে প্রতীক। জীবনানন্দ প্রাকৃতিক-প্রতীক ব্যবহার করে তার কবিতার শরীর নির্মাণ করেছেন। আকাশের তারা আর নদীর জলের ওপর ভাসমান ফুল তার কবিতায় অপূর্ব সাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে। অন্ধকার প্রতিবেশে শ্রবণ ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণকারী মন প্রবলভাবে সৌন্দর্যের স্বাদ আস্বাদনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আলোকিত জীবনে আমরা অন্ধকারের, রোমান্সের স্বাদ পাই কি? তাই কবি মৃত্যুকে বেছে নেন জীবনকে গভীরভাবে ভালোবাসার জন্য। তীব্রভাবে উপলব্ধি করার জন্য। এমনকি জীবনকে আবিষ্কার করার জন্য। মৃত্যুর আক্রমণ থেকে জীবন আমাদের নিরাপদ আশ্রয় দিয়ে থাকে। শিশুকে স্পর্শ করে কবি তার শৈশবে ফিরে যেতে চান। কারণ, সহজবোধ্য, শৈশব থেকে মৃত্যু বেশ দূরে অবস্থান করে।মানুষ সব সময় বস্তুকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করতে চায়। ইতিহাসের ঘটনাপরম্পরাকে সে তার স্মরণের মধ্যে চিত্র-রূপে উপস্থিত রাখে, ভালোবাসার অনুভূতিকেও সে দৃষ্টিগ্রাহ্য

করতে চায়। তাই কবিতায় প্রধানতঃ আমরা লক্ষ্য করি যে, কবি একটি ছবি এঁকে ঘটনাকে এবং অনুভূতিকে পাঠকের দৃষ্টির সামনে উপস্থিত করছেন। বাংলা কবিতায় এই দৃষ্টির অনুভূতিটা স্বয়ম্প্রভ এবং কবিতার মধ্যে একটি অনুভূতিকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কবির সব চেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে সমস্ত অবস্থাকে দৃষ্টিপাতের মধ্যে নিয়ে আসা। দৃষ্টিগ্রাহ্য চিত্রকল্প সহজেই উপমার সাহায্যে গড়ে উঠে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যধারায় এই দৃষ্টিগ্রাহ্য চিত্রকল্পের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। কিন্তু স্পর্শের অনুভূতি, গন্ধের অনুভূতি, শ্রবণের অনুভূতি এবং স্বাদের অনুভূতি, শব্দে তুলে ধরা অত্যন্ত কঠিন, এবং রবীন্দ্রনাথের সময়ে ব্যাপকভাবে তার পরীক্ষাও হয়নি। জীবনানন্দ দাশের কাব্যে আমরা বাংলা কবিতার সর্ব প্রথম এই অনুভূতিগুলোকে শব্দে তুলে ধরার আকুলতা লক্ষ্য করলাম। প্রকৃতপক্ষে জীবনানন্দ দাশ জীবন-বিমুখ কবি নন, বরঞ্চ জীবনকে জানেন বলেই প্রকৃতির আদিমতা এবং সজলতার মধ্যে তিনি তাঁর অস্তিত্বের সন্ধান করেছেন।

জীবনানন্দ দাশ সত্যিকার অর্থে একজন আধুনিক-কাব্যস্রষ্টা ছিলেন। এবং তিনি সফল প্রয়োগ করেছিলেন ‘আধুনিকতাবাদ’-কে তাঁর কবিতায়। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে- এ সকল কবিতা যে ভাবাদর্শ থেকে উৎসারিত, তা তাঁর মৌলিক চেতনালব্ধ নয়। পূর্বেই আমরা দেখেছি ‘আধুনিকতাবাদ’ এর উত্থান ঘটেছিল বিশ শতকের শুরুতে পাশ্চাত্যের কবিতায়। এবং যেহেতু ‘আধুনিকতাবাদ’ পাশ্চাত্য থেকে আগত, তাই তাঁদের পক্ষে এই নতুন ধারাকে গ্রহণ করা দুঃসাধ্য ছিল না। আধুনিক সাহিত্য বা কবিতা পূর্বের ন্যায় সহজ-সরল ছিল না, তুলনামূলক তা জটিলতর ছিল। সাহিত্য বিষয়ে উচ্চশিক্ষা এবং ইংরেজি সাহিত্যের সাম্প্রতিক বিষয়াবলি না জানলে আধুনিকতা বোঝা কষ্টকর ছিল। ফলে সনাতনপন্থীরা আধুনিক কবিতাকে গ্রহণ করতে পারেন নি সঠিকভাবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক্ষেত্রে সচেতনতার সাথে গ্রহণ করেছিলেন আধুনিক কাব্যধারা। এবং তিনি নিজেও এর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জীবনানন্দ দাশের প্রথম স্বীকৃতিদাতা। তাঁর একটি চিঠিতে পাই-

"তোমার কবিত্বশক্তি আছে তাতে সন্দেহমাত্র নেই।–কিন্তু ভাষা প্রকৃতি নিয়ে এত জবরদস্তি কর কেন বুঝতে পারিনে। কাব্যের মুদ্রাদোষটা ওস্তাদীকে পরিহাসিত করে। বড়ো জাতের রচনার মধ্যে একটা শান্তি আছে যেখানে তার ব্যাঘাত দেখি সেখানে স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। জোর দেখানো যে জোরের প্রমাণ তা নয় বরঞ্চ উল্টো।" সত্যিকার অর্থে বাংলা সাহিত্যে যেসব কালে যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে, তার সবটুকুই এসেছে ঐ পাশ্চাত্য থেকে। মধ্যযুগের পরে প্রথম মধুসূদনের কবিতা আধুনিকতার পথে যাত্রা করে। কিন্তু সে আধুনিকতা, যা বিশ্বপথে উন্নীত করেছে বাংলা কবিতাকে, তার জন্মদাতা বাঙালি নয়। হোমার, ভার্জিল, মিল্টনের কবিতার রূপরেখা এবং কলাকৌশলে প্রভাবিত হয়ে মাইকেল সৃষ্টি করলেন বাংলা কবিতা। এছাড়া তাঁর মহাকাব্য, পত্রকাব্য, চতুর্দশপদী কিংবা অমিত্রাক্ষর ছন্দ, এসবকিছুই পাশ্চাত্য প্রভাবের ফসল। রবীন্দ্রনাথ পূর্ববর্তী বাংলা কবিতায় আধুনিকতার ধারাকে যারা প্রসারিত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং কামিনী রায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে বিহারীলালের প্রকৃতি-প্রেম-বিষাদভাবনা প্রভৃতির উপর প্রভাব রেখেছে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরীজ, শেলী, কীটস্। এছাড়া স্কচ ও আইরিশের কবিতা এবং টেনিসন-ব্রাউনিং, পেত্রার্কের কবিতা প্রভাব রেখেছে অন্যান্য কবিদের কবিতায়। বাংলায় রোমান্টিক যুগের একচেটিয়া সূত্রপাত ঘটালেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শুধুমাত্র রোমান্টিকতা নয়; মানবতাবাদ, প্রথাগতভাবে নারী মুক্তি, বিজ্ঞানবোধ, পরিপার্শ্বের আধ্যাত্মবোধ প্রভৃতি সবকিছুই রবীন্দ্রনাথের একক সৃষ্টি এ বাংলায়। কিন্তু তাঁর পূর্বেই এসবকিছু সৃষ্টি হয়েছে উনবিংশ শতকের আমেরিকা, ইউরোপ, ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানের সাহিত্যে। তাঁর কাব্যগ্রন্থে ধরা পড়ে ভিক্টোরীয় শিল্পের নবজাগরণ, ফরাসি রোমান্টিকতার বিলাস-বাসনা, ইংরেজ কবিদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি। ফলে এ কথা অস্বীকার করা মূঢ়তা ছাড়া আর কিছু হবে না যে- প্রাচ্যের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বিশ্বকবি হয়ে উঠলেন, তার পিছনে প্রতীচ্যের প্রভাব কম নয়। একইভাবে রবীন্দ্র সমসাময়িক বা পরবর্তী বাংলা সাহিত্য প্রধানদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস,

মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্‌দীন, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত উল্লেখযোগ্য। তাঁদের প্রতীচ্যের পূর্ণতা পূর্বের মতই অপূর্ণ থেকে গেছে, যখন তাঁরা সৃষ্টি করলেন রবীন্দ্রধারার আলোকে, আবার কেউ কেউ ফ্রান্স-ইউরোপের হাইনরিশ হাইনে, হুইটম্যান, শেলী, বায়রন এর কবিতার আলেখ্যে। একবিংশ শতাব্দীর শূন্য দশকের বাংলা কবিতা আধুনিকতা ও উত্তর আধুনিকতাকে উৎরে পৌঁছেছে অন্যধারায়। যেখানে কবিতার নির্মাণ কৌশল কিংবা যুক্তিবোধ লোপ পাচ্ছে অনেকাংশে। প্রতিটি কবিই তাঁর সময়ের প্রতি দায়বদ্ধ। কেননা তাঁকে তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের কবিতা সম্পর্কে অবগত থেকে, তারপর সৃষ্টি করতে হয় নতুন কবিতা। এই দায়ভার বর্তমানের কবিদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে না। বিশেষ করে বর্তমানে প্রযুক্তির সীমাহীন ও মাত্রাতিরিক্ত অগ্রগতির ফলে সাহিত্য হয়ে উঠেছে যাচ্ছেতাই। এক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর ‘সাহিত্য খেলা’ প্রবন্ধটি স্মরণযোগ্য। যেখানে তিনি দেখিয়েছেন- সাহিত্য নিয়ে খেলা করার অধিকার ব্যক্তিমানসের সকলের রয়েছে। কিন্তু একাধিক খেলার মধ্যে প্রভেদ তখন গড়ে ওঠে, যখন খেলাচ্ছলে কোনো সাহিত্য-খেলোয়াড় শিক্ষা দিতে পারেন। তাই ‘সাহিত্য ছেলের হাতের খেলনাও নয়, গুরুর হাতের বেতও নয়।’ ফলে সাহিত্য নিয়ে খেলতে হলে থাকা চাই এ বিষয়ে বিস্তর জ্ঞান-গম্যি। তার সাথে মননশীলতা আর সৃষ্টিশীলতা যুক্ত হলেই তৈরি সম্ভব উৎকৃষ্টমানের সাহিত্য।

জীবনানন্দ দাশের কবিতা মূলত প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকের জন্য। তাঁর অধিকাংশ কবিতা এতই জটিলতাপূর্ণ, যে- সামগ্রিক অর্থে তা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হয় না। অবশ্য এ বোধগম্যহীনতা, অর্থাৎ যা আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়, হয়ত তার কারণেই তাঁর কবিতা সর্বাধিক জনপ্রিয়। স্বভাবতই মানুষ অজানাকে জানার নিরন্তর প্রচেষ্টা করে। আর জীবনানন্দের কবিতা হল অজানার এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। বাস্তব আর অবাস্তবের লীলাখেলায় মত্ত জীবনানন্দের কবিতার অর্থ আমাদের কাছে আলো আঁধারির খেলা করে। লালন ফকির যেমন বলেছিলেন- ‘ধরতে গেলে না যায় ধরা, জ্বলছে রে বিজরী’, তেমনি স্বাপ্নিক পরিমণ্ডলে ঘেরা জীবনানন্দ ও তাঁর কবিতা।

জীবনানন্দ দাশ, শুদ্ধতম-মহোত্তম কবি, যাঁর কবিতা সৃষ্টি করেছে একক পরিধিস্থ বৃত্ত। যেখানে সকলে প্রবেশ করতে পারে না। আবার যে কেউ-ই সৃষ্টি করতে পারে না জীবনানন্দকে অনন্য কাব্যশৈলী। তিনি নিজেই বলেছিলেন-

“সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।”

সম্ভবত এজন্য, জীবনানন্দ দাশ; সকলের কবি নন, কারো কারো কবি।কিন্তু তিনি সার্বিক ভাবে বাংলা সাহিত্যে নিয়ে এসেছিলেন পরাবাস্তবতা বা সুরিয়ালিজম এবং একই সাথে আধুনিকতা ও রোমান্টিসিজম। এই কারনেই রবীন্দ্র-যুগের অনন্য কবি রূপে তিনি চিহ্নিত হয়ে থাকবেন।

৭.২ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১- সুরিয়্যালিজম কি?

এ-মতবাদের মূলকথা অবচেতনমনের ক্রিয়াকলাপকে উদ্ভট ও আশ্চর্যকর সব রূপকল্প দ্বারা প্রকাশ করা।

২- জীবনান্দ দাশের কোন কবিতায় সুরিয়্যালিজমের প্রভাব দেখা যায়?

জীবনান্দ দাশের ‘বিড়াল’, ‘হাওয়ার রাত’, ‘শিকার’ প্রভৃতি কবিতায় সুরিয়ালিজমের প্রভাব দেখা যায়।

৭.৩ অনুশীলনী প্রশ্ন

১- জীবনানন্দ দাশের বেড়াল কবিতায় সুরিয়ালিজম ও কবির আত্ম কথন কি ভাবে ফুটে উঠেছে?

৭.৪ গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- সুকুমার সেন।